দেশকাল ও আপেক্ষিকতা

সাধন দাশগুপ্ত

দেশকাল ও আপেক্ষিকতা

সাধন দাশগুপ্ত

একমাত্র পরিবেশক

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দেশকাল ও আপেক্ষিকতা
(Deshkal O Apekshikata)
Spacetime and Relativity
A Journey

লেখক—সাধন দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ—রথযাত্রা ৩০শে জুন ১৯৮৯

প্রচ্ছদশিল্পী—চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য—পঁচিশ টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রগ্ন প্রকাশন
৮ সি ট্যামার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ নং হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

দেশকাল ও আপেক্ষিকতা

বিজ্ঞানের সত্যপ্রচারে সদাব্রতী
বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার
মশালচীদের উদ্দেশ্যে

নিবেদন

১৯৮০ সালের কথা। 'এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ' বইটি পড়ে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার (BITM) ডিরেক্টর শ্রী সমর বাগচি মিউজিয়ামের অডিটোরিয়ামে একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান কথন করতে বলেন—বিষয় তাঁরই তৈরি করা : কী করে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারে এলেন। গণিতছাড়া এই আলোচনাটি শ্রোতাদের কাছে কেমন মনে হয়েছিল জানিনা—তবু স্পেসটাইম বা দেশকাল নিয়ে এজাতীয় কথকতা আমার কাছে মনে হয়েছিল মজার, আনন্দের।...এরপর BITM এর সহযোগিতায় শ্রী সমর বাগচির উদ্যোগে স্কুল কলেজের বিজ্ঞান ভিক্ষু জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি একমাস ব্যাপী সেমিনারে বিংশশতাব্দীর ফিজিক্স নিয়ে কথকতা করতে হয়। এখানেও শ্রী বাগচির একটি শর্ত ---গণিত বাদ দিয়ে বক্তব্য রাখতে হবে। একদল উৎসুক আগ্রহী অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের প্রশ্নমালার জবাবে রিলেটিভিটি ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা করি। —আলোচনার শেষ তুলির টানটি দেন শ্রদ্ধেয় অমল রায় চৌধুরি মহাশয়। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি—জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তবু এক জায়গায় থামতে হয়। থামতে হয় ঝুলি ভরতে, ভর্তি জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখতে।...সেই ছাত্রদল আর তাদের বন্ধুরা তারপর অনেকবার তাদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছে।...গণিত বাদ দিয়ে ফিজিক্সের তত্ত্ব তাদের বলা হয়েছে। BITM এর শর্ত, শ্রী বাগচির নিয়ম এখানেও সচরাচর লঙ্ঘন করা হয় নি।...BITM আর সেই ছাত্রবন্ধুরা আপেক্ষিকতাবাদকে মুখরতায় বাঁধতে চেয়েছেন। আমাকে তাঁরা উপলক্ষ্য করলেন শুধু।..

বিংশশতাব্দীর ফিজিক্স নিয়ে সম্পূর্ণ লেখার প্রচেষ্টার কথা এঁরা জানিয়েছিলেন। টুকটাক অংশবিশেষ এদিক সেদিকে লেখা হলেও, সম্পূর্ণ ভাবনার উঁকিঝুঁকিকে এতদিন এড়িয়ে আসা গিয়েছিল। সহসা '৮৩, সালের শেষ মাসে, 'এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ' বইটি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাতে আমার সেই ছাত্রবন্ধুদের কয়েকজন আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম-বাদের নান্দীমুখ রচনার দাবী করে। এই বইটি আর এরই পরিপূরক এটমের সংসার (১ম ও ২য় পর্ব) সেই দাবী মানার ইতিহাস।...একটি অক্ষম প্রচেষ্টা। তবু কোথাও কখনো শুরু করার ক্ষণ থাকে। সেই ক্ষণটি তাঁরা আমাকে বেছে নিতে বললেন। এই বই দুটি এঁদের, আর BITM'এর। আমি অনুলেখক মাত্র।...এই কারণে, প্রথমপর্বের শেষে 'কী পাইনির হিসেব নিকেশ' তাঁরা চাইলেন; যেটি বইটির শেষে দিতে চেয়েছিলাম।—এঁদের বক্তব্য—আইনস্টাইনের তত্ত্বে প্রাগুক্তি আছে;—তাঁর তত্ত্ব গঠনের শেষে থাক সেই প্রাগুক্তি।...আর থাকুক সামান্য গণিত, যা

নিউটনের আওতার বাইরে নয়। এটুকু নিয়ে লেখা হলো বিন্যাস। কারণ আইনস্টাইনের বিজ্ঞান ভাবনায় আছে তথ্য-চিন্তা-বিন্যাস-তত্ত্বের ধারা। চিন্তার পথে ভাষাগণিতের বিন্যাসে তিনি যা আঁকতেন, সেখানেই ধরা পড়তো তত্ত্বের রূপরেখা। বিন্যাসের সামান্য স্পর্শ ছাড়া রিলেটিভিটি গড়ে ওঠেনা। শ্রী বাগচির শর্তটি ভাঙা হয়নি, তবে শর্তে আঘাত হানা হয়েছে।...আমি অপারগ।...

এজাতীয় বই প্রকাশের কালে নানা অসুবিধা ধরা দেয়। বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশ ছাড়াও থাকে মুদ্রণ প্রমাদ ছাপাখানার ভুতের উপদ্রব। এই ভৌতিক ব্যাপার কী করে যে ঘটে চলে! বইটি মুদ্রণত্রুটি মুক্ত নয়। তবু গামা-মিউ-নিউ চিহ্নের গোলমালটি না ঘটলেই ভাল ছিল। সংকেতের সংকট ধরা দিয়েছে বেড়াচেনার প্রচেষ্টায় যেমন— তেমনি অন্যত্র! সংকটের মোকাবেলায় আমাদের হার হয়েছে—এই দুঃখ ও লজ্জা আমাদের।

তবু এই খুঁতো বইটি যদি পাঠকদের সমবেদনা পায়—তবে আমরা ধন্য হব।

সাধন দাশগুপ্ত

১লা আষাঢ়, ১৩৯১ সন

কলকাতা

মুদ্রণশুদ্ধি

পৃষ্ঠাসংখ্যা	আছে	হবে
৩৭	$t'=y(t+\frac{vx}{c_2})$	$t'=\gamma(t+\frac{vx}{c^2})$
৫২	ছবি (মিনকোওস্কির ছক)	ছাপার কোঅর্ডিনেটটি উলটো হয়েছে
৬৫	$\alpha_{\nu\mu}dx^{\nu}, dx^{\mu}, g_{\nu\gamma}$	$d_{\mu\nu}dx_{\mu}\ dx_{\mu}, g\mu\nu$
৬৬	··জানায়	Tজানায়
৭৪	$\gamma t'+\frac{xv}{c^2}$	$\gamma(t'+\frac{vx}{c^2})$
১১৪	মিগনাস $x1$	সিগনাস x_1
১২০	$m=mor$; r জানাবে	$m=mo\gamma$, γ জানাবে
১৬৭	বস্তুর বস্তুটি স্পেস নয় ;	বস্তু। বস্তুটি স্পেস নয়।

এছাড়াও অন্যান্য মুদ্রণ প্রমাদ আছে যার জন্য আমরা দুঃখিত।

এই লেখকের বই

বিজ্ঞানের কথকতা :

আলো আরও আলো ; রোমাঞ্চকর রসায়ন ; ভাষাগণিত

আপেক্ষিকতাবাদ :

এলবার্ট আইনস্টাইন ঃ সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ ; দেশকাল ও আপেক্ষিকতা

পরমাণুবিজ্ঞান ও কণাপদার্থবিদ্যা ঃ

এটমের সংসার (১ম পর্ব) ; এটমের সংসার (২য় পর্ব)

সনাতনবিজ্ঞানের ধারা ঃ

ফিনিক্সের নবজন্ম ; হাতিয়ার থেকে যন্ত্র ; থালীসের গাধা ; যন্ত্র নিয়ে

অন্যান্য লেখা :

মির্জা গালিব ; অন্যকুঠার (ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়)

সম্পাদিত বই :

সমুদ্রভাবনা ঃ লেখক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

(১) চার দৌড়বীর

যাযাবর মানুষ গতিকে চিনেছিল। সেই গতি জীবজন্তুর দ্রুতধাবমানতায়, লতা-গাছের বৃদ্ধিতে, সূর্য-চন্দ্রের পরিভ্রমণে। আকাশের নক্ষত্র চিনতে চেয়ে মানুষ যেন গতিকে আরো কাছে পায়। মহাকাশ গতিতে ভরা ; তার নক্ষত্র-নীহারিকা-ছায়াপথ—তারা সতত পরিবর্তনশীল। শুধু উত্তরদিকে একটি নক্ষত্রকে মনে হয় স্থির—সে ধ্রুব নক্ষত্র—পোলার স্টার! এই ধ্রুব নক্ষত্রটিরও যে পরিবর্তন আছে—সেটি সময়-অভিজ্ঞতা মানুষকে জানায়। মানুষ জানে দৃশ্যবস্তুর পরিবর্তন ঘটে—মনে হয় তাদের গতি আছে। এই গতিময় জগতে গ্রহ নক্ষত্র তারার অবস্থানটি ঠিকমত ধারণা করতে গেলে একটি স্থির বস্তুর কল্পনা করতে হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের ধ্যান ধারণায় তাই একটি স্থির বস্তুর ইঙ্গিত উঁকিঝুঁকি মারে—তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না!

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে হয়েছিল, বাইরে থেকে কোনো শক্তির প্রয়োগ না ঘটলে সব বস্তুই স্থির থাকবে অথবা চলবে সমগতিতে, ভেলসিটিতে। আর এই সমগতির কল্পনা ধরেই গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরম স্পেসের দ্বারে হাজির হয়। তাঁরা জানান, বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন সময়ে একই স্পেসের অংশে ঘটতে পারে,—স্পেস নির্বিকার, নির্বিকল্প, উদাসীন—ঘটনা তার বুকে কোন ছাপ ফেলতে পারে না। স্পেস নিরুত্তাপ নিস্পৃহ স্থাণুর মত। সে পরম বা এবসল্যুট। এই পরম স্পেসে গ্রহ নক্ষত্ররা সমগতি নিয়ে ঘুরে চলেছে—চলেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীই হলো পরম স্পেসের কেন্দ্রবিন্দু—তাকে উদ্দেশ্য করেই প্রকৃতি গতিময়ী, নৃত্যপরা!

দিনের শুরু সূর্যোদয়ে—যে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে আর সমস্ত দক্ষিণদিক সারাদিন পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যাবেলায় সেই সূর্য পশ্চিমে অস্ত-সাগরে ডুবে যায়। এই সূর্য গতি নিয়ে চলেছে—চলেছে পৃথিবীর বুকে আলো-তাপ ঢেলে দিতে। মহাকাশের সব বস্তুই আছে পৃথিবীর জন্য ; এই তারাভরা আকাশ, ছলাকলা পটু চাঁদ—এদের সৃষ্টি, এদের গতি, পৃথিবীর জন্য ; তারই জন্য এত গতি, এত আলো, এত তাপ ; তারাই আনে মহাকাশের দৃশ্য-পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন। পরম স্পেসে পরম স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলে মহাজাগতিক বস্তু। আর পৃথিবীর বুকে আছে সবাইকে আকর্ষণ করে টেনে নেবার প্রবৃত্তি। মাতা বসুমতি। তার বুকে লুকানো থাকে অপ্রমেয়, অপরিমেয় রত্নরাজি, আর সবার জন্য একটি সর্বজনীন আকর্ষণ। জাগতিক বস্তু সেই টানে পৃথিবীর কোলে নেমে আসে আর মহাজাগতিক বস্তু তার বন্দনা স্তুতি গেয়ে তাকে পরিভ্রমণ করে।

গ্রীকদের এই ধ্যানধারণাতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে একজন প্রতিবাদ তোলেন। তিনি সামোসের গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী আরিস্তোকাস। তিনি জানালেন মহাজগতের কেন্দ্রে থাকে সূর্য—পৃথিবী নয়। তবু এই চিন্তা সেযুগে চার্বাক

দর্শনের মত পরিত্যক্ত হলো। তার কারণ গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতলের চিন্তা,—যে চিন্তা গ্রীক ধ্যানধারণাকে আচ্ছন্ন করে মজিয়ে রেখেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে আরিস্তোতলের জন্ম। এই মহাচিন্তাবিদ গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের শিক্ষাগুরু। শোনা যায় তিনি চারশ থেকে হাজার বইয়ের লেখক। এই আরিস্তোতল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উপশাখায় স্বকীয় মতামত জানিয়ে গেলেন। তিনি মানতেন পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাজগৎ। আরিস্তোতলের উক্তি সেযুগে, এমন কি ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, চিন্তাজগতে একচ্ছত্রাধিপতি। অবিসংবাদী তাঁর বক্তব্য—সে যেন অপৌরুষেয় আখ্যায় মহিমান্বিত!

নবযুগের বিজ্ঞানীরা আরিস্তোতলের চিন্তার দেয়ালে বারবার বাধা পেয়েছে। রোজার বেকন একদা বললেন, ‘আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আরিস্তোতলের সব বই পুড়িয়ে ফেলতাম। ঐ বই পড়া মানে সময় নষ্ট, ভুল শেখা আর অজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলা।’ দোষ আরিস্তোতলের নয়—দোষ তাঁকে নির্বিবাদে মেনে নেয়ায়! অথচ, আরিস্তোতল বিজ্ঞান চিন্তার পথিকৃত। তাঁর ট্রাজেডি হলো, তিনি মহাচিন্তাবিদ, যাকে ইংরাজীতে বলে গ্রেট। ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির মানুষেরা তাঁকে সর্ববিষয়ে মেনে নিয়েছিল, তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করে নি, প্রশ্ন করেনি। যে কোন সমস্যার সমাধানে সেযুগে মানুষ আরিস্তোতলের দ্বারস্থ হয়েছে, উত্তরও পেয়েছে। সেই উত্তরেই তারা খুশি—উত্তর শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা ব্যথা ছিল না। আর অসাধারণ মানুষদের, চিরকাল যেমন, তেমনি সাধারণ মানুষ হয় সর্বাংশে মেনে নেয়, নয় ঠেলে ফেলে। আরিস্তোকাসকে সাধারণ মানুষ ঠেলে ফেলে দেয়।

150 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইজিপ্টিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রীকবংশীয় টলেমি পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বলোকের একটি জ্যামিতিক ছক দিলেন। এই ছক থেকে সেযুগে চেনাজানা গ্রহনক্ষত্রদের অবস্থান মোটামুটিভাবে জানা গেল। তবু, তার ছকে জানা যায়, গ্রহরা এক এলোমেলো বক্রীপথে ঘোরাফেরা করে। দুরূহ সেই পথ। গ্রহদের বোঝাতে যে গ্রীক শব্দ ‘প্ল্যানেট’ ব্যবহার হয়েছিল সেই শব্দটির অর্থ যাযাবর। প্ল্যানেটরাও যেন যাযাবর। তবু তারা যাযাবর হাঁসের মত নির্দিষ্ট স্থানে-অবস্থানে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে ফিরে দেখা দেয়।

টলেমির গাণিতিক ছক-নিখুঁত নয়। তবু, তাঁর ছক থেকে সূর্যের পথে দ্বাদশরাশি বা Zodiac-এর ঠিকানা পাওয়া যায়। এই দ্বাদশ রাশির পথে সূর্য ইত্যাদি গ্রহের পথ পরিক্রমা। এই পথ বৃত্তাকার। এখানে বারোটি অংশ—প্রতি অংশ জানায় বৃত্তের মধ্যে ৩০° অংশ। এই অংশটুকুই এককেটি রাশি বা zodiac—যার একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন আছে—সেই চিহ্ন গড়া হলো এককেটি নক্ষত্রমালার আকৃতি ধরে। সূর্যের পথপরিক্রমা এই দ্বাদশ রাশি গড়া বৃত্তাকার পথে আর অন্য গ্রহেরা এই পথে এলোমেলো চরণ বিচরণ করে। গ্রহদের পথকে টলেমি জানালেন এপিসাইকল পথ। একটি বৃত্তের পরিসীমায় আরেকটি বৃত্তের কেন্দ্রকে রেখে সেই দ্বিতীয় বৃত্তটিকে যদি প্রথমটির পরিসীমাটি ধরে ঘুরতে হয় তবে পাওয়া যায় এই জটিল পথ। পথ জটিল, জটিল পথ থেকে গণিতের সূত্রে পাওয়া অবস্থানটিও সর্বাংশে শুদ্ধ নয়। এবং জানা যায় না পৃথিবীর বুকের ঋতুচক্রের আবর্তনের কারণ। স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দল টলেমির ছকটি

সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে দেখেন। অন্যদিকে সেদিনের চার্চ টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলটি বিশ্বাস করে বসে আছেন। সেই মডেল চার্চের আস্থাভাজন, আশীর্বাদপুষ্ট। অতএব এই মডেলটিকে নাকচ করা মানে চার্চের বিরোধিতায় নামা। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত টলেমিকে আঁকড়ে ধরে রাখা হলো। আর তারপর শোরগোল তুললেন একজন পোল্যান্ডের যাজক নিকোলাস কোপার্নিকাস। জীবনের তেত্রিশ বছর পর্যন্ত কোপার্নিকাস ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে গেলেন। পোলান্ডের ক্রাকো (Cracow), ইটালির বোলোন ও পাদুয়া ও সবশেষে ফেরারা থেকে আইন শিখে ফের ফিরে গেলেন পাদুয়ায়, সেখানে শেখেন চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ; 1506 সালে স্বদেশে ফিরে এলেন আর কিছু পরে ফ্রাউয়েনবার্গ চার্চে যাজক হিসেবে যোগ দেন। সেই চার্চের একটি মিনারে তিনি তাঁর অবজার্ভেটরি বীক্ষণাগার গড়ে তোলেন। সেই মিনারটি আজো টিকে আছে—এর নতুন নামকরণ হলো কোপার্নিকাস টাওয়ার !

এই টাওয়ারে খালি চোখে আকাশ দেখে, গণিতের মাধ্যমে একটি তত্ত্বের দ্বারে এসে পৌঁছান কোপার্নিকাস। এই গ্রহলোক সূর্য কেন্দ্রিক। পৃথিবীও সূর্যের একটি গ্রহ, যেমন গ্রহ ভেনাস, মার্কারি, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন—বুধ, শুক্র মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি। গ্রহদের পথ বৃত্তাকার। টলেমির জটিল পথে নয়, গ্রহরা সাদাসিধে সহজ বৃত্তাকার পথে ঘোরে। কোনোরকম যন্ত্র ছাড়া কোপার্নিকাস গ্রহনক্ষত্রের স্থানপঞ্জী তৈরি করলেন। আশ্চর্য শুদ্ধ সেই পঞ্জীকা। সেই পঞ্জীকা থেকে গ্রহদের অবস্থানের পূর্বাভাস দেয়া যায়। আর এই ঘোষণা টলেমির ঘোষণা থেকে অনেক শুদ্ধ।—তাছাড়া পৃথিবীর ঋতুচক্রের আবর্তনের একটা কারণও খুঁজে পাওয়া গেল।…তবু কোপার্নিকাস তাঁর বইটি প্রকাশ করলেন না।

1539 সালে একজন নবীন জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ জোয়াকিম রেটিকাস (George Joachim Rheticus) কোপার্নিকাসের শিষ্যত্ব নিলেন। তাঁরই অনুরোধে জার্মানি থেকে কোপার্নিকাসের বইটি প্রকাশিত হলো—নাম Revolutionebus Orbium Coelesfium অথবা সংক্ষেপে Revolution অথবা বিপ্লব। বইটির প্রকাশ কোপার্নিকাসের জীবিতকালে হলেও, মুদ্রিত বইটি যখন তিনি পান তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে চেতনবুদ্ধি রহিত। তিনি মুমূর্ষু। শোনা যায়, ভঙ্গুর শরীরের দিকে তাকিয়ে রেটিকাসকে হেসে বইটি ছাপানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এখন ছাপলে ওরা আমার আর কি করবে ?'—ওরা অর্থাৎ চার্চ কোপার্নিকাসের কিছুই করতে পারেনি ঠিক ; তবে তাঁর বইটিকে শয়তানের কাজ বলে চার্চ ফতেয়া দিলেন।…তবু কোপার্নিকাসের চিন্তা অন্য বিজ্ঞানীর মনেও অনুরণন তোলে। এঁদের কেউ চান কোপার্নিকাসের তত্ত্বের ভুলটি নির্দেশ করতে, কেউবা চান তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই দুদলের দুজন বিজ্ঞানী একদা চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ (প্রাহা) বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রে কাজ করে গেলেন। এঁদের একজন নির্বাসিত ডেনমার্কের বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে ; অন্যজন একজন জার্মান প্রোটেস্টাইন খৃষ্টান, জোহানেস কেপলের। 1592 সালে দুজনে একত্রে মহাকাশের তারকাপঞ্জী তৈরি করতে

শুরু করেন। একাজে টাইকো ব্রাহে আগেই লেগে গেছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য কোপার্নিকাসের তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণ করে, পৃথিবীকে আবার গ্রহলোকের কেন্দ্রে পুনপ্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে কেপলেরের বিশ্বাস কোপার্নিকাসের তত্ত্বে। দুই বিপরীত মেরুর চি াবিদ একযোগে তথ্য সংগ্রহ করে চলেন। 1601 সালে ব্রাহের মৃত্যু হয়—তাঁর অসম্পূর্ণ কাজটি একাকী করে চলেন কেপলের। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে, নিজের হাতে সংগৃহীত তথ্যমালার দিকে তাকিয়ে, ব্রাহে জেনেছিলেন কোপার্নিকাসই সত্য। এই একই উপলব্ধি কেপলেরেরও। তথ্যের আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় গ্রহলোক সূর্যকেন্দ্রিক। আর গ্রহদের পথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার—ওভাল বা ইলিপ্টিকেল। বিভিন্ন গ্রহদের ক্ষেত্রে এই পথ কেমন হবে তার গণিতের কাঠামোটি তিনি দিতে পারলেন। আর তাছাড়া খুঁজে পেলেন গ্রহদের পথপরিক্রমার প্রাথমিক নিয়মের ইঙ্গিতটি—যে নিয়মের সূত্র ধরে নিউটন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বে পেঁছুতে পারলেন। 1601 সালে কেপলের তাঁর তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। বললেন, 'এই বইয়ের পাঠকের জন্য একশ বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছি। স্বয়ং ঈশ্বর তো একজন সঠিক দর্শকের জন্য ছ হাজার বছর অপেক্ষা করেছিলেন। তবে ?'—

একশবছর নয়। ত্রিশ বছরের মধ্যে কোপার্নিকাস-কেপলেরের তত্ত্ব নিয়ে খৃষ্টান ধর্মের দুর্গ রোমে আন্দোলন জেগে ওঠে। আলোড়ন তোলেন আধুনিক পরীক্ষা-ভিত্তিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা গালিলিও গালিলি !

গালিলিও কেপলেরের অগ্রজ। তাঁর জন্ম 1564 সালে, আর কেপলেরের জন্ম 1571 সালে। গালিলিও'র যে বইটির প্রকাশ নিয়ে রোমে ঝড় জাগে, সে বইটির প্রকাশ কাল 1632 সালে। তার দুবছর আগে কেপলের মারা গেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য জগতে সে যুগে যে দুজন ঝড় তুলেছিলেন তাঁদের দুজনেরই জন্ম 1564 সালে—এঁরা গালিলিও গালিলি এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়র। দুটি বিরল প্রতিভা, দুটি বিপ্লবী !

শোনা যায় মাত্র সতের বছর বয়সে (মতান্তরে কুড়ি বছর বয়সে) চার্চের ঝাড় লন্ঠনের দোলন দেখে গালিলিও পেন্ডুলামের তত্ত্বের দ্বারে পেঁছান। তবে পেন্ডুলামের ঘড়ি তৈরি করেন নেদারল্যান্ডের অধিবাসী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে। এই হাইগেন্স যে কেবল পেণ্ডুলাম ঘড়ি তৈরি করেন তা নয়, তিনি স্পাইরেল ওয়াচস্প্রিং-এর ঘড়িও আবিষ্কার করেন এবং জানান আলো তরঙ্গাকারে চলে। হাইগেন্সের ঘড়ি বিজ্ঞানসমাজ মেনে নিলেও, তাঁর আলোকতরঙ্গ তত্ত্বকে সেযুগে অবহেলা করা হলো—কারণ নিউটন সে সময়ে তাঁর আলোকতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন ;—নিউটনের আলো—কণা !

গালিলিও অবশ্য ঝাড়লন্ঠনের দোলন দেখলেও, আলো নিয়ে কোন গবেষণা করেন নি। তাঁর গবেষণার দুটি ধারা—একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান, অন্যটি মেকানিক্স বা যন্ত্রবিজ্ঞান। আর গবেষণার পদ্ধতিটিও কিছু বিচিত্র। চিন্তাসূত্রে যুক্তির পথে তিনি একটি আইডিয়াকে আগে প্রতিষ্ঠিত করতেন।—কি ঘটতে পারে, কি পাওয়া যাবে—এসবই যুক্তিশৃঙ্খলের ধারাবাহিকতার পথে তিনি খুঁজে নিতেন। তারপর, তাঁর চেষ্টা হলো, আইডিয়াটিকে পরীক্ষার পথে প্রমাণ করা।

বিজ্ঞানের জগতে গালিলিও একটি এলার্জিতে ভুগতেন। সেটি হলো আরিস্তোতলের মতামত। এই মৃত-চিন্তাবিদের মতামত ভূতের মত সে-যুগে সব ধ্যানধারণাকে আচ্ছন্ন করেছিল। গালিলিওর যুক্তি শৃঙ্খলার কাছে আরিস্তোতলের মতামত অসহ্য, অসহনীয়। সুতরাং তিনি ভূত তাড়ানো রোজাগিরির কাজটি বেছে নিলেন। বাস্তব চিন্তা ও পরীক্ষার সঙ্গে অশরীর ধারণার অসম যুদ্ধে সেদিন পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে তিনি জয়ী। আরিস্তোতলের ভূতটি বিজ্ঞানের ঘাড় থেকে নেমে দ্রুত বিদায় নেয়। সেই সূচনা কোপার্নিকাস করলেও, গালিলিওই প্রথম, যিনি কোলাহলে, হট্টগোলে ভূতের উদাসীনতাকে ভঙ্গ করেন।

স্পেসের পরমতত্ত্ব নিয়ে গালিলিও সংশয় প্রকাশ করেন। বস্তু গতিতে যায়—যে গতি অপরিবর্তনীয়, সমগতি। এই সমগতি বা ভেলসিটিটি বজায় থাকে যতক্ষণ না দিকের পরিবর্তন হয়। দিক পরিবর্তন মানে বাইরের থেকে শক্তির জোগান দেয়া—নইলে যে বস্তু সমগতিতে চলে, সে সিধে চলবে, চলবে নাকবরাবর সরলরেখায়। গালিলিওর সংগৃহীত তথ্যে স্থির বলে কিছুই নেই। পৃথিবী ঘোরে, কাজেই তার বুকে থাকা আপাত স্থির বস্তুদেরও আপেক্ষিক গতি থাকে। সর্বত্র যখন গতি, আপেক্ষিক গতি, তখন পরম স্পেসের ধারণা অচল!

অন্যদিকে গালিলিও দেখলেন ভিন্ন ভিন্ন ওজনের বস্তুদের পতন বেগ এক। ভারি জিনিস হালকা জিনিসের চেয়ে আগে নামে—এই আরিস্তোতলীয় চিন্তা সঠিক নয়। আর এই নীচে নামার পতন বেগটি গালিলিও তাঁর নিজের গড়া ঘড়ির সাপেক্ষে মাপলেন—দেখলেন পতনের গতি সময়ের বর্গের অনুপাতে বাড়ে। যে বস্তু নীচে নামে, তার পতন গতিবেগ প্রথম সেকেন্ডে এক মিটার থাকলে, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে সেটি হবে চারমিটার তৃতীয় সেকেন্ডে নয় মিটার এবং চতুর্থ সেকেন্ডে ষোল। তাছাড়া গালিলিও দেখলেন, গতির পরিবর্তনের দুটি ধারা—একটি দ্রুততা আনে, যেটি ত্বরণ বা একসিলারেশন, দ্বিতীয়টি মন্দন অথবা রিটার্ডেশন। একশিলারেশন বা রিটাডেশন যাই হোক, গতির পরিবর্তন ধারায় একই নিয়ম কাজ করে—পরিবর্তনের হার পাওয়া যাবে সময়ের বর্গানুপাতে। তাছাড়া তিনি জানলেন, বাধা না পেলে, যে কোন বস্তু অনন্তকাল সমগতিতে চলতে পারে। নিখুঁত সমতলপথে বায়ুহীন অঞ্চলে গতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে না—দিক পরিবর্তন হবে না। তাছাড়া গালিলিও পেলেন ট্রাজেকটরির পথ। কোন বস্তু ঊর্ধ্বদিকে ছুঁড়লে, অথবা সোজা ছুঁড়লে, সে পৃথিবীর টানে নেমে আসে—এই নেমে আসার পথটি ধনুকের মতো বাঁকা।

সবশেষে গালিলিও বললেন, আপেক্ষিক গতির কথা, গতিবোধের কথা। দুটি ট্রেন একই গতিতে পাশাপাশি চললে, গতিবোধ জাগে না, যদি একটি ট্রেনের দর্শক ভিন্ন ট্রেনটিকে দেখে। অন্যদিকে উল্টো জানালার পথে দৃষ্টি দিলে সে দেখে পারিপার্শ্বিক পটভূমি পেছনে ছুটে চলে। সে নিজে যেন স্থির। গালিলিও দেখেন, দর্শকের চোখে গতির বোধ ভিন্ন। ট্রেনের বাইরে দাঁড়ানো দর্শক যেদিকে ট্রেন চলেছে দেখে, ট্রেনের ভেতরে বসা দর্শকটি বাইরে দাঁড়ানো দর্শককে উল্টো মুখে যেতে দেখে। দেখার

জগতে আপেক্ষিকতা থাকে বলেই—পৃথিবীর পথপরিক্রমাটিকে পৃথিবীর উপরে থাকা মানুষদের কাছে উলটো মনে হয়—মনে হয় সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

1591 সালে পিসা বিদ্যালয় থেকে গালিলিও বিতাড়িত হলেন। আরিস্তোতলের তত্ত্বের এত ভাঙচুর বিদ্যালয়ের অধিকর্তাদের কাছে অসহ্য ঠেকে। তার চেয়েও অসহ্য গালিলিওর সোচ্চার তর্কপ্রবৃত্তি। যাই হোক, একবছর পর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনার পদটি তাঁর জুটে যায়। আর এখানেই তিনি শুরু করেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা। নিজের হাতে দূরবীন তৈরি করে গালিলিও রাতভোর আকাশ দেখেন। দেখেন, চাঁদের বুক এবড়োখেবড়ো; চাঁদে আছে পাহাড়-খানাখন্দ। এই পাহাড়ের উচ্চতাও গালিলিও মাপেন। তিনি দেখলেন, গ্রহেরা ঠিক নক্ষত্র নয়। এরা চাঁদের মত ধার করা আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নক্ষত্র যেন অগ্নিপিণ্ড,—চারদিকে আলো বিচ্ছুরণ করে চলেছে। ছায়াপথে গালিলিও নক্ষত্রের তত্ত্বতালাশ পেলেন। আর দেখলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, চারটি চাঁদ। আদি অকৃত্রিম পৃথিবীর চাঁদের বুকে আলোর তারতম্য দেখে গালিলিও সাব্যস্ত করেন, পৃথিবীও সূর্য থেকে আলো ধার করে উজ্জ্বল। আর চাঁদের দেশে কোন মানুষ থাকলে তারাও দেখবে চন্দ্রকলার মত পৃথিবী-কলা—এবং কোন কোন দিন তারা বলে উঠবে, আজ পূর্ণিমা—পূর্ণপৃথিবী দেখা যাবে!

গতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—দুটি বিষয়ের চর্চাতে একটি সত্য তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়—পৃথিবী গ্রহ; সূর্যই একমাত্র সৌরলোকে নক্ষত্র। সৌরলোকই সত্য। গ্রহলোক সূর্যকেন্দ্রিকে। 1632 সালে গালিলিও ইটালীয় ভাষায় প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ—A Dialogue on the two Principal system of the world। এই বইটিতে তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বেরও পূর্ণ প্রমাণ দিলেন। পরীক্ষাভিত্তিক, তথ্যনির্ভর, গণিতে পাওয়া প্রমাণ। আর সেই বইটির প্রকাশে তিনি চার্চের বিরাগভাজন হলেন। 1634 সালে তাঁর বিচার হয়। বিচারে গৃহবন্দীত্বের শাস্তি পান তিনি। চার্চের বিচারকমণ্ডলীর কাছে সত্তর বছরের বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন "আমি ফ্লোরেন্সের ভিনসেনজিও গালিলির পুত্র গালিলিও গালিলি, বয়স সত্তর, বিচারের সম্মুখীন হয়ে জানাচ্ছি যে স্থিরগতিহীন সূর্যকে কেন্দ্রে ধরে যে তত্ত্ব আমি ঘোষণা করেছিলাম, তা' সর্বাংশে প্রত্যাহার করছি এবং কখনই এই মিথ্যেমত কোনমতেই আমি সমর্থন, প্রচার অথবা বিশ্বাস করব না।" দুবছর পর 1636 সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ Dialogues on Two New Sciences। এটিও তিনি লেখেন ইতালীয় ভাষায়—বিদগ্ধজনদের ভাষায় ল্যাটিনকে সরিয়ে রেখে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখেন গালিলিও। তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত মাতৃভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের লেখক। তাঁর দুটি বইয়ের এখনো অনেক পাঠক।

1642 সালে গালিলিও মারা যান। সেই বছরের 25শে ডিসেম্বরে নিউটনের জন্ম। গালিলিও তাঁর নিজের জীবনের শুরু শেষ বছরে দুটি প্রতিভার আবির্ভাব দেখে গেলেন। জন্মবৎসরে পেলেন শেক্সপিয়রকে এবং মৃত্যুবৎসরে দিয়ে গেলেন নিউটনকে। বিজ্ঞানের রিলে রেসের দৌড়ে হাতের বেটনটি তুলে দিলেন নিউটনকে। অথবা সেন্ট

ক্রিস্টোফারের মত নতুন দিনের যীশুকে দুর্বার দুর্গম বিপদসংকুল নদীটির পরপারে পেঁছে দিলেন। দানবের মত বিশাল বিরাট প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর কাঁধে চেপে নিউটন আরো অনেক দূরে দৃষ্টি দিতে পারলেন! কোপার্নিকাস-কেপলের-গালিলিও-নিউটন—চার দৌড়বাজের খেলায় শেষ দৌড়বীরটি নিউটন—সার আইজাক নিউটন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ এবং নিউটনের প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের টিকাকার-মল্লিনাথ লা প্লাস নিউটনকে বড়দিনের শ্রেষ্ঠ উপহার বলে জানালেন। বড়দিনের ছোটবড় নানা বছরের নানা উপহারের মধ্যে নিউটন যে বিশিষ্টতম এ তথ্য সন্দেহাতীত। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব—বিজ্ঞানের সচল ভাষাটির সুপ্রয়োগ। এই ভাষাটির পরিমার্জনা পরিবর্ধনও তাঁর হাতে। এই ভাষা গণিত। কেপলের-গালিলিও নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন, তাদের নিয়ে আলোচনা করলেন, আইডিয়া জানালেন, তত্ত্বের দ্বারে এলেন; তবু সঠিক নিয়মটি খুঁজে পেলেন না। কারণ নিয়ম খোঁজার হাতিয়ার, সম্বন্ধ-সম্পর্ক জানার ভাষা অংক–তখনো সম্পূর্ণতা পায়নি। কেপলের তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাসের দ্বারে এলেন। গালিলিও পৃথিবীর আকর্ষণ মাপতে গিয়ে গতির পরিবর্তনের ধারায় জানলেন শক্তির পরিবর্তন হারটি হলো $16t^2$ যেখানে t জানাবে সময়ের সেকেন্ড এবং মাপটি জানাবে ফুটের হিসেবে। গালিলিও ওখানেই থামলেন। কারণ পরিবর্তনের ধারা থেকে পরিবর্তনের হারটি মাপার গণিতটির ছক তাঁর জানা নেই। নিউটন একধাপ এগিয়ে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাসের রীতিতে একলহমায় সেই হার জানালেন—মাধ্যাকর্ষণের ফলে নেমে আসা গতিবেগ হলো সেকেন্ডে ৩২ ফুট। এখানেই নয়, গালিলিওর ট্রাজেকটারির সঠিক হদিশ অথবা কেপলেরের গ্রহের উপবৃত্তাকার পথের নিশানা—সবকিছু তিনি গণিতের ছকে জানাতে পারলেন। অসামান্য গণিতের জ্ঞান দেখে তাঁর শিক্ষক আইজাক বারোজ কেম্ব্রিজের গণিতের অধ্যাপনার পদটি নিউটনকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। শিষ্যের প্রতিভার স্বীকৃতি বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন গুরু এমনভাবে জানিয়ে যাননি!

নিউটনের প্রথম কাজ আলো নিয়ে। সাদা আলোয় নিউটন সাতরঙা রামধনুর আদল দেখলেন। তৈরি করলেন দূরবীণ আর আলোকে জানালেন কণা-কর্পাসকুল বলে। তাঁর হাতে তৈরি হলো Geometrical Optics বা জ্যামিতিক আলোকতত্ত্ব। তাঁর প্রথম বই এই আলোকতত্ত্ব নিয়ে। বইটি নিয়ে যতো উচ্ছাস, ততই যেন দুঃসহ সমালোচনা। সেই নিন্দেপ্রশংসার কালে, নিজের কাজ ফেলে নিউটনকে তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে বহুবার তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছে;—যুঝতে হয়েছে সেযুগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স, রবার্ট হুক এবং অন্যান্যদের সঙ্গে। একটি আলোচনায় নিউটন বিজ্ঞানের অন্বেষণের সূত্রটি সংক্ষেপে জানালেন। বললেন, "বিজ্ঞানের কাজের শ্রেষ্ঠ আর নির্ভরতম পদ্ধতিটি হলো প্রথমে যে কোন বস্তুর গুণধর্মটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে নেয়া, তারপর সেই গুণধর্মদের পরীক্ষার পথে প্রমাণ করা এবং সবশেষে সেই প্রমাণের ব্যাখ্যায় ধীরে ধীরে তত্ত্বের দ্বারে হাজির হওয়া।" বিজ্ঞানের যে শৃংখলের কথা নিউটন জানালেন তা হলো, প্রশ্ন-পরীক্ষা-তথ্য-চিন্তা-তত্ত্ব। বিজ্ঞানের অন্বেষণের

পথে নিউটন সবার উপরে স্থান দিলেন প্রশ্নকে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডিটেলসে জানার আগ্রহটিকে ! জানার আগ্রহই হল বিজ্ঞান-সোপানের প্রথম ধাপ ।

একটি বই ছাপিয়ে তার ফলাফল দেখে, নিউটন বই প্রকাশে, নিজের তত্ত্ব জাহির করতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন । যা কিছু কাজ তিনি করেন, নিজের কাছে রেখে দেন । অন্তরঙ্গ মহল ছাড়া আর কাউকে জানাতে চান না । তিনি সমালোচনা নামক আত্ম-ম্ভরিতার কেন্দ্রবিন্দু হতে চান না। 1684 সালে বিখ্যাত ধূমকেতু আবিষ্কর্তা জ্যোতি-র্বিদ এডমন্ড হেলি কেপলেরের উপবৃত্তের গণিতটি বুঝতে নিউটনের কাছে এলেন । তিনি দেখেন এক অজানা সোনার খনির খোঁজ তিনি পেয়েছেন। নিউটনের তত্ত্বের বিশালতা, তাঁকে অজানা অচেনা এক নতুন রূপময় জগতের খোঁজ এনে দেয় । নিউটনকে তাঁর রচনা প্রকাশ করতে পেড়াপিড়ি করেন তিনি । রবার্ট বয়েল আর রয়েল সোসাই-টিকে অনুরোধ করেন ব্যয়ভার নিতে । সব ভার হেলির—নিউটনের কাজ হলো বইটি লিখে দেয়া । 1687 সালে সেই বই প্রকাশিত হয়, ল্যাটিন ভাষায় তিন খণ্ডে লেখা Philosophiac Naturalis Principia Mathematica অর্থাৎ ন্যাচুরাল ফিলজফি বা বিজ্ঞানের গণিতের প্রাথমিক রীতি । সংক্ষেপে প্রিন্সিপিয়া ।

এই বইটিতে নিউটন জাগতিক আর মহাজাগতিক দুই গতিবাদকে একটি সূত্রে গাঁথলেন । তিনি দেখলেন, পৃথিবীর বুকে, বস্তুতে বস্তুতে ক্রিয়াকলাপ সংঘাত-সংযোগের ফলে যে নিয়ম ধরা পড়ে, সেই একই নিয়ম খাটে মহাকাশে, মহাজাগতিক বস্তুর ক্রিয়াকলাপে ।

প্রিন্সিপিয়ার প্রথম খন্ডে নিউটন গতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন । তাঁর বিখ্যাত তিনটি গতিসূত্র জানালেন । আর জানালেন মহাকর্ষতত্ত্ব—বিশ্বব্যাপী বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণের কথা – যে আকর্ষণ কাজ করে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে, যা বস্তুর ভর-নির্ভরশীল আর শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে দুটি বস্তুর মধ্যের দূরত্বের সাপেক্ষে । কিভাবে এই শক্তি, অথবা গতি গণিতে সাজানো যাবে, হিসেব কষা যাবে, তার হদিশ জানা গেল প্রথম খণ্ডে ।

দ্বিতীয় খণ্ডে নিউটন যন্ত্রবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করলেন । গতির বাধা বা রেজি-স্টেন্স কি হতে পারে তা জানালেন । আর গতিবিদ্যার প্রয়োগের দিক নিয়ে জানালেন তাঁর ভাবনাচিন্তা ।

আর সবশেষে পাওয়া গেল তৃতীয় খণ্ড—সেই আশ্চর্য অংশটি যা মানুষের বোধির এক আশ্চর্য বিজয় ঘোষণা । নিউটন এই অধ্যায়ে জাগতিক আর মহাজাগতিক শক্তির একাত্মতা প্রকাশ করলেন। যা ঘটে পৃথিবীতে, তাই ঘটে চলেছে বিশ্বলোকে । যে দেখা পৃথিবীর বুকে—সেই দেখা আবার জাগে মহাবিশ্বে। তিনি সূর্য আর পৃথিবীর ভর মাপলেন, জানালেন মেরুর কাছে পৃথিবী কেন চাপা, আর নিরক্ষবৃত্তে কেন ফুলে ওঠা । চাঁদের কক্ষ পথের সূক্ষ্মতম ত্রুটিটি যেন তাঁর হাতে সংশোধন হলো । জানা গেল জোয়ার ভাঁটার রহস্য । নিউটন এখানেই জানালেন, গণিতের ছকে, গণিতের ভাষায় ভবিষ্যদ্বাক্তির সম্ভাবনা থাকে । আগে থেকেই বলা যায় কখন ঘটবে গ্রহণ, কখন আসবে জোয়ার-ভাঁটা ।

মহাকর্ষের কথা জানালেন নিউটন—তার নিয়ম, তার গণিত। তবু ঐ আকর্ষণের যে কি কারণ সেটি জানাতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, “মহাকর্ষ আছে, এটি আমাদের ঘোষিত নিয়ম মেনে চলছে, মহাকাশে আর মহাসাগরে যে গতি কাজ করে সেখানে এর যে কাজকারবার তাও জানা। এই জানাই যথেষ্ট।”

নিউটন জানেন, যেটুকু জানা যায়, সেটুকুকে আগে আত্মস্থ করে নিতে হয়। তারপর হাত বাড়াতে হয় অন্য অজানাকে মুষ্টিবদ্ধ করতে। কারণ মানুষের মুষ্টির বাইরে থাকে হাতের নাগাল। মুঠোর জিনিস ঝোলায় ভরে তবে নাগাল বাড়িয়ে যেতে হবে।—

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকে সবার উপরে ঠাঁই দিয়েও নিউটন ছটফটানিতে আপত্তি জানালেন। জানালেন, বিজ্ঞানে থাকে ধৈর্য আর স্থৈর্য। এখানে যেমন থাকে গতির দ্রুততা, তেমনি থাকে দুলকিচালে চলা। সবগতি মিলিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আর গতির পথে পটভূমির পরিবর্তনটাকেও উপভোগ করতে হবে। সেটাই যে বিজ্ঞানের মজা !

চার দৌড়বাজ সেই মজার কথাটা রীলে রেসে জানান দিয়ে গেলেন !

———

(২) খোলা জানালার হাওয়া

পৃথিবীর কাছাকাছি জায়গা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার শুরু গ্রীকদের হাতে। তবে তাদের জগৎ আপাতস্থির—যেন ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধান্তের ছকে গড়া। গ্রীকদের জগৎসংসার জ্যামিতিক ; সেখানে গতি নেই, গতির আভাস নেই। গ্রীকদের ধারণা ছিল এই জগৎ পৃথিবীকেন্দ্রিক। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানী টলেমি গ্রহ নক্ষত্রের পথ পরিক্রমার ধারণায় একটি বক্রীপথের ধারণা করলেন, যাকে বলা হয় এপিসাইকল। এখানে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু একটি বৃত্তাকারে ঘোরে, পাওয়া যায় বৃত্তের পরিসীমা। আবার এই পরিসীমার কেন্দ্রবিন্দুটি আরেকটি বড়বৃত্তের পরিসীমা ধরে ঘুরবে। এই গোলমেলে পথটির আকৃতি সেকালে জ্যোতির্বিদরা মেনে নিয়েছিল ; তার কারণ গ্রীক চিন্তায় বিশ্বলোকের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী, আর তাকে ঘিরে সবকিছুর পথ-পরিক্রমা ;—এবং এই পরিক্রমা বৃত্তাকার পথে ; গ্রীকদের মতে, বৃত্তই শ্রেষ্ঠ আকার। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা ঘোষণা করলেন। আর তারপর জানা গেল সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের পথ প্রায় বৃত্তাকার। চাঁদ, যে পৃথিবীর উপগ্রহ, সে পাক খায় পৃথিবীকে, আর পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। কোপার্নিকাসের কাল থেকে এক নতুন কো-অর্ডিনেটের সূচনা, সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহসাম্রাজ্য। সে যুগে এই কো-অর্ডিনেটকে নানা নামে ডাকা হয়েছিল ; যেমন রেশনালিজম বা যুক্তিভিত্তিক ; নেচুরালিজম বা স্বাভাবিক এবং এমনকি, সেকুলারিজম—যার সেকালীন অর্থ ধর্মনিরপেক্ষ নয়,—অধার্মিক। কারণ বাইবেল ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থে ঘোষণা করা আছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আকাশের সব বস্তু ঘোরে ; এর উল্টোটা প্রচলিত ধর্মবোধকে তছনছ করছে,—ভাঙছে সে যুগের যাজকদের, পুরোহিতদের শিক্ষার বিষয়। এই কো-অর্ডিনেট নিশ্চয় অধর্মের। তবু এই অধর্মটিকে মেনে নিয়ে গালিলিও, কেপলের ও পরে সার আইজাক নিউটন গতিবিজ্ঞান বা মেকানিকসের গঠনকার্যে নামলেন।

বিশ্বজগতের গতিসূত্রটিকে সার্থক ভাবে প্রকাশ করলেন নিউটন। যে ভাষায় তিনি এই সূত্রটিকে তৈরি করলেন সেটি গণিত। নিউটনের গতিসূত্রে আছে মেটার বা জড়বস্তু ; অর্থাৎ গ্রীকচিন্তাবিদদের অস্পষ্ট ভাববাদী ধ্যানধারণাকে নিউটন চেনাজানা জগতের চৌহদ্দিতে আনলেন। গতিশীল বস্তু স্পেসের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে যাবে—এই উপপত্তি অনুসারে নিউটন স্পেস ও টাইম, দেশ ও কালকে কয়েকটি গণিতের রীতিতে সম্পর্কের সূত্রে বাঁধলেন। নিউটন স্পেস বলতে বুঝলেন একটি সাবস্টেন্স বা বস্তু যার স্বাধীন সত্তা আছে ; যে শুধু স্বাধীন নয় ; যে পরম, যার নিত্যতা-বিদ্যমানতা শেষকথা ; সে চরম। নিউটন তার স্পেসের গুণ বোঝাতে বললেন এটি হোমোজিনাস, আইসোট্রপিক, এবসল্যুট—স্পেস সর্বত্র উপকরণে বুনোটে এক, সবদিকে

সমান এবং পরম। আবার পরম বলতে জানালেন এটি ইনার্ট ; স্পেস জড়, নিশ্চল, ক্রিয়াহীন। এ নিজের থেকে কোন ক্রিয়ায় নামে না এবং কোন বস্তু একে সক্রিয় করতে পারবে না। যেমন জলে মাছ সাঁতার কাটে, সেই রকম যে কোন বস্তু স্পেসের মধ্যে যাবে, কিন্তু জলের মত স্পেস তাদের গতির কোন বাধা হবে না ; অন্যদিকে বস্তুও স্পেসের বুকে কোন দাগ, কোন চিহ্ন ফেলে যেতে পারবে না।—নিউটনের জগতে প্রতিটি জড়বস্তু অনন্য ; তাদের অবস্থান ভিন্ন, যে কোন দুটি ঘটনার দূরত্বটি নির্দিষ্ট। ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, অথবা একসময়ে ঘটতে পারে ; আবার আরেকদল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা একই সময়ে, বিভিন্ন অবস্থানে ঘটতে পারে। স্পেসের মত নিউটনের টাইম বা সময় অথবা কাল শুধু যে স্বাধীন, তা নয়, এও পরম। অবস্থান ও সময়, দেশ ও কাল, স্পেস এবং টাইম দুটিই স্বাধীন, দুটিই পরম ; কেউ কারো আশ্রিত নয়, নির্ভরশীল নয়। নিউটনের স্পেস পরম বলেই এই স্পেসের সাপেক্ষে গড়া ফ্রেমের কোন পরিবর্তন হবে না। কোনো কোনো অবস্থায় অবশ্য দেখা গেছে নিউটনের স্পেস গতিবিদ্যার রীতিতে কখনো সখনো, অবরে সবরে, মেটারের উপর ক্রিয়া করতে পারে ; তবে নিউটনের স্পেসের উপর ক্রিয়া করার, জোর খাটাবার অধিকার কোনো জাগতিক মেটারের কোনো শক্তির নেই। অর্থাৎ ধ্যানমগ্ন শিবকে দেখে পার্বতীর মনে কোনো সুন্দর অনুভূতি জাগতে পারে ; তবু পার্বতীর পূজাঅর্চনা, ধ্যানধারণা, আরাধনায় শিবের স্থাণুত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।···স্পেস যেন পরম এবং স্থাণু ! সময় যেন নন্দীর তর্জনি-সংকেতে সেই নিশ্চল জড় অঞ্চলে 'তিষ্ঠ' শব্দটি শুনে স্থির হয়ে আছে। এই স্থাণু জগতে গতি নেই, সময়ের বোধ নেই ! সময়ের বোধ বা গতির ফলে অবস্থানের পটভূমিকার পরিবর্তনের ধারণা থাকে শুধু পার্বতীর—যিনি এই স্থির জগতে পথপরিক্রমায় আসেন। তাঁর অলক্তরঞ্জিত পায়ের ছাপটি পর্যন্ত এই জগতে পড়বে না।

স্পেসকে স্বাধীন ঘোষণা করে নিউটন সেযুগের চিন্তাধারা থেকে সরে এলেন। যাকে রিলেশনিস্ট বা সম্বন্ধ-সম্পর্কের স্কুল বলা হয়, সেযুগে এঁদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। তাঁদের মতে স্পেসকে অন্য কিছুর সাপেক্ষে ছাড়া বোঝানো যাবে না। যেমন অক্ষরেখা-দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে পৃথিবীর বুকে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে জানানো যায়, তেমনি স্পেসকে অন্য কিছুর সাপেক্ষে, একজাতীয় পরস্পর-পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন চিহ্নের সাহায্য ছাড়া, কি করে বোঝা যাবে ? অথচ, নিউটনের সংজ্ঞা অনুসারে স্পেসে কোন নির্দেশনা নেই। তবে তাকে জানা যাবে কি করে ? তাছাড়া ইউক্লিডের জ্যামিতি এই জড় জগতে গড়ে উঠেছে ; মহাশূন্যে, স্পেসে, যে স্পেসের কথা নিউটনের ঘোষণায়, সেখানে কি এই জ্যামিতি খাটবে ?···সেকালে স্পেসের ব্যাখ্যায় যে বাগ্‌ভঙ্গিমার ব্যবহার হতো, সে যেন মুখের ভাষার উপমা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে গড়া। যেমন, আমরা বলি, ঝগড়ার ফলে আবহাওয়া বা পরিবেশ গরম হয়ে উঠল ;—সেই আবহাওয়া বা পরিবেশের তাপের পরিবর্তন কি মাপা যায় ? সেই রকম, নিউটনের স্পেস শুধু কথার কথা কি নয় ? স্পেসের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব, তার কোনো গুণাগুণ, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-আয়তন ইত্যাদি জেনে বোঝা যাবে, বোঝা হয়তো সম্ভব। অথবা সম্ভব, যদি সে কোনো ক্রিয়াকলাপে নামে। নিউটনের স্পেসে সেই সম্পর্ক,

সেই ক্রিয়াকলাপ কোথায় ? যে পরম তাকে কোন্ সম্পর্কে বাঁধা যাবে ? গতিশীল বস্তুর উপর স্পেস কোনো ক্রিয়া কেন করবে না ? জলের ক্রিয়া দেখা যায় মাছ বা জাহাজের উপর—সে ধরনের কোনো ক্রিয়া নিউটনের স্পেসে থাকবে না কেন ?

রিলেশনিস্টদের এ ধরনের প্রশ্ন নিউটনের কাল থেকে তিনশ বছর ধরে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁদের চিন্তাধারা থেকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গতিবাদের বীজ অংকুরিত হয়েছে। তবে সে অনেক পরের কথা। স্পেসের সম্বন্ধ-সম্পর্ক, ক্রিয়া-বিক্রিয়া অথবা মৌখিক-ভাষাগত ব্যাখ্যা নিয়ে নিউটন মাথা ঘামান নি। তাঁর গড়া গতিবিজ্ঞানে স্পেস ও টাইম, দেশ এবং কাল—দুটিই পরম, দুটিই স্বাধীন। এবং তাঁর ভাষা-গণিত।

নিউটনের জগৎ গতিতে ভরা—সেই গতি স্পেসের পরিমণ্ডলে জানা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার, নিউটনের কালে অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণে ক্ষুদ্র ও বিশাল জগৎ দেখা সবে শুরু হয়েছে। লীভেনহোক জানিয়েছেন জীবাণুর কথা আর হুক বললেন শেলের চিহ্ন। অন্যদিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গালিলিও কেপলের-হেলি সৌরজগতের নতুন সংবাদ জানাচ্ছেন আর জানা যায় দূরের বিশ্বলোকের দুর্বার অবাধ নিঃসীম বিশালতার আভাস। এই বিশ্বমণ্ডলে নিউটন গতিকে দেখলেন, গতিকে পেলেন—যে গতি স্পেসে ; এই বিশ্বলোক, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে আছে।

দুটি গতির কথা নিউটন ভাবলেন ; একটি ভেলসিটি বা সমগতি আর দ্বিতীয়টি গতির পরিবর্তন যাকে বলা হয় একসিলারেশন বা ত্বরণ। সমগতির বোধ সবদর্শকের জাগে না ; জাগে না সব সময়ে অথবা সব অবস্থানে। এয়ারোপ্লেনের মধ্যে ঝাঁকুনি না থাকলে গতিবোধ বোঝা যায় না। গতিবোধ জাগে,—সর্বত্র সবসময়ে সবার কাছে জাগে—একমাত্র গতির পরিবর্তন দেখা গেলে, ত্বরণের আবির্ভাব হলে।

সমগতিকে বোঝা যায় না—অতএব সমগতিকে বোঝা যাবে কোনো রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষে। যেমন একটি গাড়ি পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে বললে এটি জানা যাবে রাস্তার স্থির ফুটপাথটির সাপেক্ষে অথবা জানা যায়, সে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই স্টার্টিং পয়েন্টটির তুলনায়। সমগতির রেফারেন্স ফ্রেম ভিন্ন হতে পারে, তবু সেই ফ্রেমগুলিকে তুলনামূলক বিচার করে জানা যাবে একটি মাত্র এবসল্যুট বা পরম স্থির ফ্রেমে। নিউটন এখানে আবার তৃতীয় একটি পরমকে আনলেন—পরম স্থির ফ্রেম। সব সমগতিকে মাপা যাবে পরম স্থির ফ্রেমের তুলনায়, পরম স্থাণুর সাপেক্ষে। ধ্যানমগ্ন শিবের তুলনাতেই সব চাঞ্চল্য-চপলতা সবগতিকে নির্দিষ্ট করে বোঝা যায়—বোঝা যায় গাছের পাতার মৃদু শিরশিরানি, পোকার নীরব গতি, তুষারের জল হয়ে গলে পড়া। পরম স্থির—পরম সময়ের জগতে পরম স্থাণুই একমাত্র সব গতির নির্দেশনা, সব গতিকে নিজস্ব স্বকীয় মর্যাদায়, সমান দৃষ্টিতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে। এই পরম স্থির ফ্রেমটিকে নিউটন বললেন, এটি স্থির তারকার সাপেক্ষে গড়ে উঠবে।

আরো পরে, জানা যায় স্থির তারকা বলে বিশ্বলোকে কোথাও কিছু নেই। বিশ্বের সব বস্তু গতিশীল, সবাই নড়ে চড়ে, সবাই আন্দোলনে ঘূর্ণিবেগে চলে। আইনস্টাইনের

শিক্ষক আর্নস্টমাক তাঁর নিজস্ব প্রিন্সিপল বা নিয়মে কিন্তু জানালেন, স্থির বা জড়ত্ব অথবা ইনারশিয়ার বোধ জাগে মেটারের নিজেদের উপর ক্রিয়ার ফলে। স্থির ফোটো মানে কোন একটি ঘটনার ক্ষুদ্রতম একটি অংশ—যেটি তার আগে অন্যরূপ পেতে পারে ; ক্যামেরার প্লেটে একটি মুহূর্তকে শুধু বেঁধে রাখা হয়েছে—বেঁধে রাখা হয়েছে একটি অবস্থানকে, একটি স্পেস-টাইমে গড়া ঘটনাকে। এই স্থির বোধ শুধু আপেক্ষিক নয়, এটি যান্ত্রিক। এই কারণে কোন বস্তুর গতিতে প্রভেদ আনতে গেলে বাইরে থেকে ফোর্সের দরকার হয়। কারণ বস্তুর বেগের ধারণা অন্য কোন মহাজাগতিক বস্তুর সাপেক্ষেই জানা যাবে। কাজেই সমগতির ধারণা করার জন্য নিউটনীয় গতি-বিদ্যায় ভাবা হয় একটি ফ্রেম যেটি ইনারশিয়া ফ্রেম। যে কোন বস্তু যার উপর বাইরের কোন ফোর্স কাজ করবে না, সেটি এই ফ্রেমের সাপেক্ষে হয় স্থির হয়ে থাকবে নয় সমগতিতে সরলরৈখিক পথে যাবে। ঐ বস্তুটির অবস্থান, আবর্তন, দিকচিহ্ন অথবা position, orientation, direction যা খুশি হতে পারে ; তবু মোট ফলাফলের অদলবদল হবে না।

এই যে ইনারশিয়া ফ্রেম, নিউটন ও তাঁর উত্তরসূরীরা এর একটি আকৃতি দিতে চাইলেন। নিউটনের স্পেস অবাধ ; তাকে তিনি বলেছেন হোমোজিনাস, আইসোট্রপিক ও ইনার্ট। এই স্পেসে যে কোন সমগতি যে কোন দিকে যাক না কেন, তার নির্দেশ এক। যেমন দেখা যাক, যেমনভাবে দেখা যাক, যেমন করে দেখা যাক, নিউটনের স্পেসের সমগতি মানে একই গতি। গতি মানে অবস্থানের পরিবর্তন আর সমগতি হলো সেই পরিবর্তনের হার যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বোধ জাগবে। এখানে, অতএব, অবস্থানের সঙ্গে সময়ও কাজে নামে। এই ইনারশিয়া ফ্রেমে সময়কেও আসতে হলো।

একটি ত্রিমাত্রিক ফ্রেমে এক নির্দিষ্ট দূরত্বে, কয়েকটি এক মানের এক ধরনের ঘড়ি রাখা হলো। এই সব ঘড়িদের সমকালে অথবা সমলয়ে বাঁধা হলো—এই ঘড়ি মিলানোকে বলা হবে সিনক্রোনাইজ করা। সব ঘড়ি সমান সময় জানাবে, জানাবে সময়ের পরিবর্তন সব ঘড়িতে সব দিকে সমান। এই বার এই ঘড়িদের কাছে একদল এক জাতের এক মানের কামান রাখা হলো—যে কামানদের থেকে ছোঁড়া গোলার গতিবেগ এক। এখন এই সব কামান থেকে একই সময়ে গোলা ছোঁড়া হলে, সব গোলাগুলি ঐ নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে মিলবে,—এখানে স্পেসের মত সময় সব দিকে, সব অবস্থানে এক। এই যে ফ্রেম, যেখানে স্পেসের সমানত্বের সঙ্গে সময়ের সমলয়ত্ব থাকে, থাকে স্পেস ও সময়ের যুগপত্তা বোধ—এটিই নিউটনের ইনারশিয়া ফ্রেম।

ধরা যাক একটি সমবাহু ত্রিভুজ। তাদের শীর্ষবিন্দুতে রাখা হলো সমলয়ে মেলানো ঘড়ি আর সমান জোরের কামান। এখন কামানের গোলা এক সঙ্গে ছোঁড়া হলে এক সঙ্গেই কেন্দ্র বিন্দুতে মিলবে। অর্থাৎ স্পেসের সমানত্ব স্থির হলো সময়ের সমলয়ত্বের সঙ্গে। স্পেসের ত্রিমাত্রিক জগতে সময় আছে স্পেসের সঙ্গে এক সঙ্গে। এটিই জানায় স্পেস ও সময়ের যুগপত্তা বোধ। এখানে সমগতির জগতে, যে কোন দূরত্বের মান সমান হলে, সময়ও সমান হবে ; কারণ দূরত্ব $x = vt$ ॥ সমগতি বা ভেলসিটির সুবাদে

অবস্থান ও সময় একই ফাংশনে নামে—এদের আলাদা অস্তিত্ব ভেলাসিটির পটভূমিতে পাওয়া যাবে না ; এরা একাত্ম হয়ে থাকে। স্পেস ও টাইমকে বেঁধে রেখেছে ভেলসিটি, যার কোন সংজ্ঞা নিউটন দেন নি। এটিই নিউটনের গতি সূত্রের স্বতঃসিদ্ধান্ত।

সময়ের এই সাদাসিধে সংজ্ঞার বিপরীত কিছু ভাবা মানে জটিলতা আনা। সময়ের সমলয়ত্বের সঙ্গে স্পেসের সমানত্বের একটা যুগপত্তার, পাশাপাশি থাকার বোধ জেগে ওঠে। যেন দুই সম্রাট পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একসঙ্গে একটি কাজ একত্রে করতে স্বীকৃত হয়ে একটি যুগ্ম ইশতাহার প্রকাশ করে ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সেই মুহূর্তটিকে নির্দিষ্ট করতে ফোটো তোলালেন, তোলাচ্ছেন। এই অবস্থানটি বিশেষ ; তবু এটি অনন্য বা পরম নয়। কারণ ঘড়ির কাঁটাদের অন্যভাবে মেলানো যেতে পারে। তবু সেই অবস্থাতেও সমগতিতে কোনো মৌলিক প্রভেদ দেখা দেবে না। গতিশীল দর্শকের কাছে সে কোথায়, কি অবস্থায়, কিভাবে আছে, তার অবস্থান-আয়তন-আবর্তন ইত্যাদির বোধ একমাত্র ঐ ইনারশিয়া ফ্রেমের সাপেক্ষেই জানা যাবে। অথবা জানা যাবে অন্য কোনো কো-অর্ডিনেটের সাপেক্ষে, যে কো-অর্ডিনেটকে ইনারশিয়া ফ্রেমের তুলনায় আগেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যেমন, একজনের সম্পর্কে কেউ তার মামাতো ভাই, অন্যজন তার পিসতুতো ভাই। এখন এই মামাতো ভাই এবং পিসতুতো ভাইদের মধ্যে কি যে এক গোলমেলে সম্পর্ক সেটি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, যদি বলি উনি অমুকের মামাতো আর ইনি সেই অমুকেরই পিসতুতো ভাই। এই অমুক নামক ব্যক্তির মতো ইনারশিয়া ফ্রেমটি অন্যসব কো-অর্ডিনেটে গড়া ফ্রেমের সঙ্গে মানানসই সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। নিউটনের এই ইনারশিয়া ফ্রেম একটি যুক্তিনিষ্ঠ, বুদ্ধিগ্রাহ্য অসাধারণ কল্পনা। এটি স্থির।

এখানে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ঘড়িগুলো কি করে মেলানো হবে? তাদের কি এক জায়গায় এনে মিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে, স্পেসে, নির্দিষ্ট দূরত্বে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে, অথবা একটি মাস্টার ঘড়িকে সব ঘড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের মেলানো হবে? এই যে ঘড়িদের নিয়ে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করা হচ্ছে তার ফলে সময়ের কিছু উনিশ-বিশ ঘটবে না তো? তাদের সমলয়ত্ব কি স্বাভাবিক না কৃত্রিম? ইত্যাদি ইত্যাদি……। নিউটন অবশ্যই এ সব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর ইনারশিয়াল ফ্রেমে কামানরাও যেমন স্থির, ঘড়িরাও স্থির। নির্দিষ্ট অবস্থানে তারা নিজেদের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে হাজির ;—কে কি ভাবে এলো-গেলো, সেটি দর্শকের ধর্তব্যের নয় ; তারা বরং এদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হোক। নিউটনের ফ্রেমে স্পেস যেমন সমানত্ব গুণটি বজায় রাখে, সময়ও তেমনি বজায় রাখে তার সমলয়ত্ব। এই আদর্শ ফ্রেমকে মানলে নিয়মটি সঠিকভাবে জানা যায়, এটিকে বিশদ ভাবে জানতে গেলে গোলমাল। কারণ এই ফ্রেম, স্পেস ও টাইমের মত, পরম।…সে যাক, আধুনিক বিজ্ঞানে বলা হয়, নিউটনের ইনারশিয়াল ফ্রেম হলো সেই ফ্রেম, যেখানে নিউটনের গতিসূত্রের প্রথম নিয়মটি খাটবে। এই সূত্রটি জানায়, যে বস্তু গতিহীন সে গতিহীন থাকবে। যে সমগতিতে

চলে, সে নির্দিষ্ট গতিতে একই দিকে সরল রৈখিক পথে চলবে, চলবে চিরকাল। এর ব্যতিক্রম শুধু ঘটে বাইরের কোন ফোর্স যখন তাদের উপর কাজ করে।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানে সমগতির খুব একটা মান মর্যাদা নেই। আলাপ করিয়ে দিয়ে, তিনি বিশদ পরিচয়টি জানানোর আবশ্যকতা মনে করেন নি। যে সাধারণ, তার আবার বিস্তারিত পরিচয় কি? পরিচয় জানাতে হয় মাননীয় মহাজনদের। নিউটনের জগতে সেই মাননীয়টি হলো একসিলারেশন বা ত্বরণ। তাঁর গতিবিদ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জুড়ে এই ত্বরণের আলোচনা। অন্যদিকে এলবার্ট আইনস্টাইনের জগতে সমগতি বা ভেলসিটিকে বুঝতে চাওয়াটাই দরকারী—ত্বরণ তাঁর কাছে স্বাভাবিক। এই কারণে নিউটনের ত্বরণ ও মহাকর্ষ তত্ত্ব এড়িয়ে সহজেই তিনি ভেলসিটি নিয়ে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করেন। ভেলসিটির আলোচনাই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য।

আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনের গতি-জগতেও এলো। নিউটন এবং তাঁর অনুগামীরা সমগতি নিয়ে আলোচনা করে চলেন। নিউটনের ইনারশিয়া ফ্রেমের সাপেক্ষে সমগতিকে বোঝা যায়। এই সমগতিরাও নিজেরা আলাদা আলাদা ফেমে সেজে দাঁড়াতে পারে। তারা মূল ইনারশিয়া ফ্রেমের সাপেক্ষে সরলরেখার পথে যাতায়াত করবে। এই যে গতিশীল নতুন নতুন ফেম পাওয়া গেল তারাও হাতে ঘড়ি বাঁধতে পারে, কারো আপত্তি নেই। এইসব ফেমের চৌহদ্দিতে একগুচ্ছ ঘড়িকে সযত্নে সমলয়ে রাখলে এটির ব্যবহার হবে ইনারশিয়া ফেমের মত। শুধু এইসব ফেম স্থির নয়; তারা একদিকে সমগতিতে চলেছে। এই যে একগুচ্ছ ইনারশিয়া ফেমের মত অথচ সচল ফেম পাওয়া গেল, তারাও নিজেদের মধ্যে ক্রিয়াবিক্রিয়ায় নামতে পারে। দুটো ফেম একগতিতে একই দিকে গেলে পরস্পরের সাপেক্ষে এদের মনে হবে স্থির। উলটোদিকে গেলে যে আপেক্ষিক গতি বোধ জাগে তা হলো দুটো গতির যোগফল। গালিলিওর আপেক্ষিক-গতির কল্পনা নিউটনের ফেমে ধরা দেয়। একটি ফেমের গতি আগেভাগে কোন নির্দিষ্ট স্থির চিহ্নের সাপেক্ষে মাপা গেলে, তারই সাপেক্ষে অন্য কোনো ফেমের গতি মাপা যাবে—এখানে গতি মাপা হবে পরিমাণ আর দিক নির্দেশনার সাহায্যে।—ভেক্টর গণিতের শাখার প্রয়োগে। নিউটনের গতিজগতে গালিলিওর আপেক্ষিক গতিটি ফেমে বাঁধা পড়ে।

এ পর্যন্ত চিন্তায় কোন ঝুট ঝামেলা নেই। এইবার চিন্তা হলো এই সব ফেমের দর্শকেরা কি দেখে। ছুটন্ত ট্রেনের মধ্যে বসা লোকটি আর লাইনের বাইরে দাঁড়ানো লোকটি—এই দুজনের দেখার জগৎ এক নয়। গতিশীল এয়ারোপ্লেনের পাইলট যা দেখে, কনট্রোল টাওয়ারের নির্দেশক ঠিক তা দেখে না। এখানে দুটি গতিবোধের তফাত থাকে। মনে হয় গতির একটা পরিবর্তন আছে। বিদেশী ভাষায় এই সমস্যাটিকে বলা হয় Kentucky Windage বা coriolis acceleration। এয়ারোপ্লেনের পাইলট—সে তার গতিশীল যানে উর্ধ্বাকাশে বসে থাকে, তার কাছে পটভূমির পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয় বলে ভেলসিটির বোধ জাগে না। তার গতির মান কয়েকটি যন্ত্রের মধ্যে টিঁকে থাকে। অন্যদিকে তাকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই কন্ট্রোল টাওয়ারের

মানুষটির কাছে এয়ারোপ্লেনের গতিটি চাক্ষুষ, বাস্তবিক। এই টাওয়ারে বসে থাকা মানুষটি প্লেনের যে গতি মাপে বা দেখে, তার ধারণা পাইলটের নেই। অথচ দুটি দর্শকের গতিবোধকে যদি একছন্দে, একলয়ে, একসুরে না বাঁধা হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ কার্যকারী হয় না, গোলমাল বাধে। সুতরাং গতিশীল দর্শক যা দেখে বা অনুভব করে, তারই সাপেক্ষে ইনারশিয়া ফ্রেমের গতিবোধটিকে রূপান্তর করে বুঝতে হবে।…এখানে আবার এলেন গালিলিও।

গালিলিও দেখেছিলেন, সমগতিতে চলাগাড়ি থেকে, কোনো বস্তুকে উঁচুদিকে ছুঁড়ে দিলে গাড়িতে বসে থাকা দর্শক দেখে বস্তুটি যেন সোজা উঁচুতে উঠে আবার সোজা নেমে আসে। অথচ গাড়ির বাইরে দাঁড়ানো কোনো দর্শক দেখবে বস্তুটি বেশ খানিকটা সামনে ধনুকের মত বাঁক নিয়ে উঁচুতে উঠে আবার ধনুকের বাঁক নিয়েই নীচে নামে। এই যে দেখার বিভিন্নতা, তার কারণ ছুঁড়ে দেয়া বস্তুটি গাড়ির এগিয়ে চলার গতিটিও পেয়েছিল।—এই গতিটি গাড়ির মধ্যে বসে থাকা দর্শক অনুভব করতে পারে না। অন্যদিকে স্থির দর্শক দেখে গাড়ির গতি আর উঁচুতে ছোঁড়ার গতি এই দুই গতির যোগফলে গড়ে ওঠা একটি জটিল গতি। সব স্থির দর্শকের কাছে এই জটিল গতি ধরা পড়বে। গতির এই পরিবর্তনটুকু যদি স্থির ফ্রেমের আঙিনায় আনা যায়, তবে দুটি দর্শকের দেখার জগতের বিভিন্নতাটুকু আর থাকে না, গোলমাল মিটে যায়। স্টেজে অভিনেতা শুধু দেখে দর্শকদের, আর দর্শক দেখে অভিনেতা আর তার পেছনের দৃশ্য সজ্জাটিকে। শুধু অভিনেতাকে দেখলে থিয়েটার দেখা পূর্ণ হয় না।—এখানেই এল গালিলিওর রূপান্তর ফ্রেম। গতিশীল দর্শকের কাছে ত্রিমাত্রিক স্পেসে অবস্থান ও সময়ের কো-অর্ডিনেটরি যদি হয় x, y, z এবং t, তবে স্থির দর্শকের কাছে এটি হবে $x_1 - vt_1$, y_1, z_1 এবং t_1 অথবা অবস্থানের পরিবর্তনে $x_1 + vt_1$, y_1, z_1 এবং t_1। স্পেসের উনিশবিশ ঘটছে কারণ ফ্রেম চলেছে সমগতি বা ভেলসিটি vকে নিয়ে। সময়ের সঙ্গে ভেলসিটি নিয়ে কোন বস্তু চললে পাওয়া যায় দূরত্ব ; vt_1 জানায় সেই দূরত্বের মাপটি ;

গালিলিওর রূপান্তর ফ্রেমে নিউটনের গতিবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে মাপা হয় আপেক্ষিক গতি। আর এই গতি মাপার সময় কোনো ফ্রেমটি যে স্থির, কোনোটি যে গতিশীল, তা বোঝা যায় না। কারণ উলটোভাবে দেখলে গতিশীল দর্শকের ফ্রেম যদি হয় $x + vt$, y, z, t, তবে স্থির ফ্রেমে এটি হবে x_1, y_1, z_1, t_1। অন্যদিকে গতির সব নিয়ম স্থির অথবা ইনারশিয়াল ফ্রেমে এক। আর এই কারণে উনিশ শতকের শেষাশেষি বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হয় জাগতিক কোন পরীক্ষাতে পরম গতিকে নিশ্চন্তে মাপা যাবে না।

তত্ত্বের দ্বারে আসার জন্য নিউটন সে যুগে প্রচলিত সব তথ্য-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর কাছে গালিলিওর পরম স্পেসকে অমানা করাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। কারণ মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের আলোচনায় স্থির ফ্রেমের প্রয়োজনটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। স্থির ফ্রেম একমাত্র পরম স্পেসেই দেখা দেয়—কাজেই পরম স্পেস তাঁর তত্ত্বে ঠাঁই পায়! অন্যদিকে গালিলিওর মত পরম সময়ের ধারণাটি তিনি মহাসমাদরে

মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়, মহাজগৎ সৃষ্টির সময়—যেটি বিশপ উশার (Usher) জানিয়েছিলেন, যেটি তাঁর মতে 4004 খৃষ্ট পূর্বাব্দে ; এধরনের একটি সময় বিন্দুকাল কেপলেরেরও মত, নিউটনও মেনে নিয়েছিলেন।

আর দ্বিতীয় গতিসূত্রটি বোঝানোর জন্য আবার দ্বারস্থ হলেন গালিলিওর কাছে।…

গালিলিও দুটো সমান ওজনের পদার্থ একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে নামতে দেখলেন। নামার গতিবেগ এক—এটি বস্তুর ওজনের উপর নির্ভর করছে না। অন্যদিকে কোন গতিকে থামানোর সময় গালিলিও যে গণিতের ছকটি পেলেন—সেখানেও দেখলেন নামার গতির ছকের সঙ্গে এই ছকে মিল। দুটিই সময়ের বর্গের সঙ্গে মিল টেনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে বস্তুর নীচে নামার গতি আর গতির পরিবর্তন আনার জন্য যে ফোর্স বাইরে থেকে দেয়া হবে, দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য বোধটি, নিউটন মনে করেন, গতিবাদের বাঁকের নির্দেশ ; এটি শুধু বিশেষ নয়, এটি অতি প্রয়োজনীয়। এইজন্য নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের প্রথম কটি প্যারাগ্রাফ এই সাদৃশ্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে গেলেন। জানালেন, এই তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজে পেণ্ডুলাম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন ; দেখেছেন, পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে গতিতে পরিবর্তন আসে। পৃথিবীর আকর্ষণ যেন একটি ফোর্স, যা সমগতির সাম্যভাব নষ্ট করে। আবার অন্যদিকে যে কোন ফোর্স সমগতিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এদুটি ফোর্সের হাবভাব এক। এরা সদৃশ।

নিউটন সমগতির কোন সংজ্ঞা দেননি। অন্যদিকে একসিলারেশন বা ত্বরণ বোঝাতে ফোর্সের কথা ভাবলেন। গতির পরিবর্তন আনতে হলে বাইরে থেকে ফোর্স বা শক্তি জোগাতে হবে—যে শক্তি শুধু যে বাধা মেটাবার শক্তি তা নয় ; এই শক্তি গতিকে উত্তরোত্তর পরিবর্তিত করবে, ত্বরণ আনবে। আর এই ফোর্স এবং ত্বরণের অনুপাতে বিভিন্ন বস্তুতে একটি ভিন্ন এবং নির্দিষ্ট ধ্রুবসংখ্যা পাওয়া যায় ; তাকে নিউটন বললেন ইনারশিয়াল মাস বা জাড্যজনিত ভর।…নিউটনের গতিজগতে ইনার্ট শব্দটি বারবার হানা দিয়েছে। নিউটনের কালে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শব্দটির মানে ছিল অলস। ইনারশিয়া মানে আলস্য, জড়ত্ব বা জাড্য। নিউটন জানালেন, কোন বস্তুকে গতিতে আনতে গেলে যে স্বাভাবিক বাধা বস্তুটি তুলবে, সেটিই ইনারশিয়া। কেউ কাজ করতে চায় না ; চায় না আপনা থেকে ছুটোছুটি করতে। বসে থাকতে, শুয়ে থাকতে সবার ইচ্ছা ;—সেই ইচ্ছাই স্বাভাবিক। এই যে জড়তা বা আলস্য, যা বস্তুর স্বভাবসম্মত চরিত্রগত গুণ, এটিই নিউটনের ইনারশিয়া। সমগতি বা যে কোন গতি আনতে গেলে সেই আলস্যটিকে ভাঙতে হবে—ভাঙবে একটি ফোর্স। এই ফোর্স যে গতির পরিবর্তন আনে, আনে ত্বরণ, সেই ফোর্স আর ত্বরণের অনুপাতে জানা যায় জাড্যজনিত ভর। অর্থাৎ গণিতের ছকে ফোর্স=ইনারশিয়াল মাস × ত্বরণ ; অথবা $F=m.a.$

কাজেই ফোর্স না থাকলে ত্বরণ থাকে না, গতির পরিবর্তন ঘটে না। এটিই নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র। এই সূত্রের বিস্তৃতি ঘটিয়ে নিউটন বললেন, গ্রহেরা যে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমায় নামে, যেখানে দিক পরিবর্তনের জন্য প্রতি

মুহূর্তে একটি ফোর্স কাজ করছে—সেটি সূর্য কোন উপায়ে খাটিয়ে যাচ্ছে। সে না থাকলে গ্রহেরা ঘোরে না—তৎক্ষণাৎ সমগতিতে মহাশূন্যে গ্রহের দল ভেসে যাবে। কারণ নিউটনের নিয়মে একটি অনুক্ত উক্তি আছে, সমগতি কোনো ফোর্স আনতে পারবে না। এবং জানালেন, সূর্যের টানহারা গ্রহ সমগতিতে স্পেসে তৎক্ষণাৎ ভেসে যাবে, কারণ কোনো গতিশীল বস্তুর উপর স্পেস কোনো ফোর্স খাটাতে পারবে না।

ফোর্স না খাটালেও ভেলসিটি ঐ মাসের সঙ্গে মিলে ছোটখাট ধাক্কা দিতে পারে। এর জোর কম ; তবু মাস ও ভেলসিটির মিলনে মুহূর্তের জন্য যেন শক্তির আভাস ধরা দেয়। নিউটন একে বললেন, মোমেন্টাম (p)॥ তবু ভেলসিটি নয়, নিউটনের জগতে ত্বরণই মাননীয়।

পৃথিবী একটি কক্ষপথে ঘোরে, তার ঘোরার একটি গতি আছে। অথচ বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘোরা মানে ঘোরার বেগের একটি পরিবর্তন থাকবে, যাতে সে বাঁকতে পারে। এই বাঁকটি তার ঘোরার পথের কেন্দ্রের দিকে কোন এক টানে ঘটবে, নইলে বাঁকানো যায় না। গাড়ি ঘোরানোতেও সেই এক রীতি। কেন্দ্রের দিকে টান না থাকলে ঘোরা অসম্ভব। একটি ঢিলকে সুতো দিয়ে বেঁধে ঘুরিয়ে এই তথ্য প্রমাণ করা যায়—কেন্দ্রে টান না থাকলে ঢিলটি ঘূর্ণ্যমান পথ ছেড়ে সিধে রাস্তায় যাবে। পৃথিবীর কক্ষপথে আছে এক কেন্দ্র,—সে সূর্য। সে কোনো এক টান দিয়ে পৃথিবীর সমগতিকে ঘূর্ণায়মান গতিতে রূপান্তরিত করছে। সে না থাকলে পৃথিবী সোজাসুজি বাইরে চলে যাবে, তার পথ অবাধ-নির্বাধ—স্পেস তার বাধা নয়! অন্যদিকে পৃথিবীর বুকে গাড়ি চালাতে সমগতি বজায় রাখতে পেট্রোল পুড়িয়ে ফোর্সের জোগান জুগিয়ে যেতে হয়। তার কারণটিও নিউটন জানালেন ; বললেন, রাস্তার বাধা, বায়ুর বাধা, গাড়ির ওজন এসবই অবাধ চলার পরিপন্থী। সেই বাধাটুকু কাটাবার জন্য, সমগতি বজায় রাখতে বাইরে থেকে ফোর্সের প্রয়োগ দরকার হয়।

মহাজাগতিক ফোর্সের চিন্তায়, নিউটনের ঘূর্ণ্যমানগতির ভাবনা। মেরি গো রাউণ্ড, রাউণ্ড এবাউট অথবা নাগর দোলায় চাপলে ঘোরার গতি ছাড়া আরো একটি গতিবোধ জাগে,—সেটি যেন দোলা থেকে ছিটকে বের করে দেবার একটা প্রচেষ্টা। একে বলা হয় সেণ্ট্রিফুগাল ফোর্স অথবা কেন্দ্রাতিগ বল। যত জোরে দোলাটি ঘোরানো যাবে তত এই ফোর্স বাড়ে। অর্থাৎ এখানেও গতির পরিবর্তন বা ত্বরণ ধরা পড়ে। ছিটকে বের করে দেবার প্রচেষ্টার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ফোর্স।

নিউটনের মতে ইনারশিয়া বা জড়তা ভাঙতে যে ফোর্সের দরকার হবে—সেটি নিশ্চিত ত্বরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সেটি এই বিশ্বের ঘূর্ণ্যমান গতির ফলে ঘটে থাকছে। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে সব ত্বরণ যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তবু যদি ঘূর্ণ্যমান গতিটি থাকে, তবে থাকে তার সৃষ্ট ত্বরণটি এবং থাকে সমগতি!

নিউটন দেখেন ফোর্স কাজ করে দুটি রীতিতে—একটি সংযোগী বা contact ফোর্স। যেমন দেয়ালে বল ছুঁড়লে, ঘুসোঘুসি করলে, সোজাসুজি সংযোগে ফোর্সের ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়ে। আর অন্য ফোর্স দূর থেকে ভেসে আসে—সূর্য টান দেয় পৃথিবীকে, পৃথিবী টানে আপেল ফলকে। এই যে ফোর্স, যা দূর থেকে ভেসে

আসে। নিউটন একে বললেন actio in distans বা দূরগত ক্রিয়া—এটিকে বোঝা তাঁর এক সমস্যা। প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে নিউটন লিখলেন, "দূরের জগতে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর উপর মহাশূন্যে কোনো মাধ্যম ছাড়া যে ক্রিয়া করে চলেছে—সেটি আমার কাছে যেন এক অবাস্তব-অসম্ভব কল্পনা। আমার ধারণা, দর্শন-ধ্যানধারণা সম্পৃক্ত কোনো মানুষ এটিকে মেনে নিতে পারে না।"

দূরের শক্তির টান কিভাবে জানা যাবে? এডমণ্ড হেলিকে নিউটন তাঁর ছেলেবেলায় দেখা ঘটনার কথা জানান। বাছুরের ডাকে মা-গরু দূর থেকে ছুটে আসে—এই ডাকের কী যে আকর্ষণ! শব্দ ছুটে যায় বায়ুর মাধ্যমে, তবেই তো আকর্ষণ জাগে। মহাকর্ষের টান বা ফোর্স এও ছুটে যাবে মাধ্যম দিয়ে। এই মাধ্যম, নিউটনের সিদ্ধান্তে, তাঁর স্পেস। এই স্পেসে গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়—যত দূরে তারা থাকে, তত তার গতি হ্রাস। অর্থাৎ সূর্য যে টান দিয়েছে সেই টানের ফোর্স দূরত্বের সঙ্গে কমে আসে। এছাড়া নিউটন দেখলেন যে কোনো বস্তুর ইনারশিয়াল মাস (যাকে সংক্ষেপে মাস বা ভর বলা হয়) যা গতির পথে বাধা তোলে, সেও এখানে কাজে নামে। গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়মের পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ দেন নিউটন—তাঁর পেণ্ডুলামের পরীক্ষা দিয়ে। এই পরীক্ষা থেকে নিউটন জানেন, বস্তুর পতন বেগ, যাকে মহাকর্ষ বলা হচ্ছে, সেই মহাকর্ষের চার্জ আর জাড্যজনিত ভরের অনুপাত সব সময়ে এক। অর্থাৎ মহাকর্ষের চার্জ আর ভর এদুটি অভিন্ন, সদৃশ। আর, নিউটন দেখলেন, এই অভিন্ন রাশিটি দূরত্বেও ধ্রুব হয়ে থাকে। স্পেস নামক মাধ্যমটি ফোর্সের বুকে বাধা তোলে না। অতএব স্পেস নিশ্চিত পরম, এবসল্যুট!

মহাকর্ষের চার্জ কি? চার্জ বলতে আমরা বস্তুর কোন চারিত্রিক, স্বাভাবিক গুণ বুঝি, যেটি যারা নিতে পারে, তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মাস্টারমশায়ের কাছে ছাত্র পড়ে—তাঁর পড়ানো যদি ছাত্রটি নিতে পারে তবে আমরা সার্থক অর্থে বলি ছাত্রটি মাস্টারমশায়ের চার্জে আছে। চার্জ মানে এখানে দায়িত্ব হলেও, যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর স্বভাব, দোষগুণ ছাত্রটি অনুকরণ করে। দায়িত্বের প্রয়োগে গুণগত বৈশিষ্ট্যের বিনিয়োগ ঘটে। এই যে বিনিয়োগ,—এই শব্দটি জানাবে কতটা বিনিয়োগ হবে, কি পরিমাণ। গুণধর্মের পরিমাণগত মানটি জানায় চার্জ। মহাকর্ষের একটি স্বাভাবিক গুণ জড়তা কাটানো। যে ছাত্র যত অল্পবুদ্ধি, জড়,—মাস্টারকে তার পিছনে বেশী সময় দিতে হয়। যে বস্তুর বেশী ভর, তাকে গতিতে নামাতে মহাকর্ষের বেশী চার্জ লাগে। আর গালিলিও এ দুটির অনুপাতে একটি ধ্রুব সংখ্যা দেখেছিলেন—অন্যভাবে দেখলে, মহাকর্ষের চার্জ আর ভর বা মাস এদুটি সমার্থক। এই সমার্থক চার্জ ও মাস জানায় সাদৃশ্য বোধ। এটিই গালিলিওর প্রিন্সিপল অফ ইকুইভেলেন্স বা সাদৃশ্য নিয়ম।

গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়মের সাপেক্ষে নিউটন তার মহাকর্ষের সমীকরণটি গড়ে তোলেন। এটি হলো $F=G\frac{m_1 m_2}{d^2}$ যেখানে F হলো মহাকর্ষের ফোর্স, m_1 ও m_2 দুটি বস্তুর মাস যাদের মধ্যে ঐ ফোর্স কাজ করছে। d তাদের মধ্যের দূরত্ব আর G

হলো মহাকর্ষের ধ্রুবক, যা গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়মে প্রাপ্ত। এই G, যা মহাকর্ষের ধ্রুবক, এটিকে এখন বলা হয় নিউটনের ধ্রুবক। এটি জানায় এক ইউনিট মাসকে এক ইউনিট মহাকর্ষের চার্জের রূপান্তরের হারটি। অন্যদিকে নিউটন দেখেছেন কনট্যাক্ট ফোর্স F হলো মাস × ত্বরণ অথবা ma ll ফোর্সের দুটি নিয়ম এক করে নিউটন এবার গ্রহ নক্ষত্রের আকার, আকৃতি, গ্রহণের সময় ইত্যাদি সহজেই ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণাকৃত তথ্যগুলি আজো অম্লান।

— গতিবিজ্ঞানে নিউটন পরিবর্তনের ধারা পেলেন। আর পরিবর্তনের ধারাটি প্রকাশ করতে তাঁর নিজের সৃষ্টি ডিফারেনশ্যাল কেলকুলাসের সাহায্য নিলেন। গতিতে পরিবর্তন বোঝাতে লাগে দুটি মাত্র চিহ্ন—একটি স্থানিক বা spacial, দ্বিতীয়টি কালিক বা Temporal। অর্থাৎ পরিবর্তন অবস্থানের হতে পারে অথবা পারে সময়ভিত্তি করে। আবার সময় ও অবস্থান দুটিরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই পরিবর্তনের ধারা যখন বস্তুর মাসের উপর কাজ করে তখনই দেখা দেয় শক্তি।

গতিসূত্রে নিউটন তিনটি মাত্র বিষয়কে হাতে নিলেন—স্থান, কাল ও পাত্র ; স্পেস, টাইম ও মাস। সময়ের সঙ্গে স্পেসের পরিবর্তনের হারটি জানায় ভেল্‌সিটি অর্থাৎ $s/t = v$। আবার ভেলসিটির কালিক পরিবর্তনের হার জানাবে একসিলারেশন ; $a = \frac{v}{t}$ ॥ এই ভেলসিটি বা একসিলারেশন যদি মাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তবে সেই মাস জোরদার হয়। mv জানায় মোমেন্টাম (p) আর ma জানায় ফোর্স (F) ॥ এই জোরদার মাসের যদি অবস্থানিক পরিবর্তন ঘটানো যায়, তবে সে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সে কাজে নামে। মোমেণ্টাম ও স্পেসের দূরত্ব s-এর সংযোগে পাওয়া যায় ps যাকে বলা হবে একশন (action=l) আর ফোর্স ও স্পেসের দূরত্বের সংযোগে জাগে কাজ ; F.s হলো ওয়াক (work=W) ॥ কাজের ইচ্ছাতে প্রকাশিত হয় এনার্জি (Energy=E)।

স্থানিক পরিবর্তন ঠিক সময়ের উপর নির্ভর করে না। একটি ঢিলকে ছাদের কার্নিশে রেখে দিলে সেখানেই সে থাকতে পারে। তার পতনের ফলে যে শক্তি জাগবে তার হদিশ কিন্তু জানা যায় না। অথচ সেই উঁচুতে যে ইঁটটি আছে, সে যখন নামে তখন সে মহাকর্ষ ফোর্সটি সঙ্গে নিয়ে নামে। তার আঘাতের শক্তি আছে, সেই শক্তি নিরুদ্ধ হয়ে আছে। তার প্রকাশ ঘটলেই আমরা শক্তিটির আভাস পাই। এই যে লুকিয়ে রাখা গুণ, যার বাহ্যিক প্রকাশ নেই, তাকে বলা হয় পোটেনশিয়াল। এই পোটেনশিয়াল দুই ধরনের হতে পারে। একটি হলো অবস্থানের পরিবর্তনে পাওয়া—যেমন ছাদের কার্নিশে রাখা ইঁট। আর দ্বিতীয়টি হলো গাঠনিক পরিবর্তন। রবারকে টান দিয়ে গুলতিটির মধ্যে শক্তি সঞ্চার হলো—রবারের স্থিতিস্থাপকতা, যা তার আণবিক গঠনের উপর নির্ভর করে, তার পরিবর্তনে পাওয়া যায় পোটেনশিয়ালকে। এককথায় পোটেনশিয়াল হলো ভেলসিটির যেন অনুরূপ ; তফাত হলো এখানে সময় নিয়ে মাথাব্যথা নেই। যখন সময়কে আনা হয়, তখন পোটেনশিয়াল একশনে নামে, কাজে নামে। দেখা দেয় এনার্জি হয়ে।

নিউটনের মোমেণ্টাম বা ভরবেগ একটি সমন্বয়ের ধারণা ঃ ভর বা মাস এবং বেগ বা ভেলসিটির মিলিত ক্রিয়ায় ঘটে ভরবেগ, মোমেণ্টাম। অন্যদিকে ঘূর্ণ্যমানগতিতে যে ভরবেগ কাজ করে, যেটি কৌণিক বা এঙ্গুলার, সেটি সার্থক অর্থে একটি একশন— কারণ এখানে ভরবেগের সঙ্গে ক্রিয়ায় যোগ দেয় দূরত্ব—কেন্দ্র থেকে ক্রিয়ার অবস্থানের দূরত্বটি—এটি জানায় মোমেণ্টামের স্থানিক পরিবর্তনের ধারা। এই কৌণিক ভরবেগ বা একশন পারমাণবিক বিজ্ঞানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোয়াণ্টাম তত্ত্বে একশন ছাড়া গতি নেই।

এই একশনটিকে গ্রহণ করে নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্রটি গড়ে ওঠে—যে কোনো একশন বা ক্রিয়ার একটি সমান অথচ বিপরীতমুখী ক্রিয়া থাকবে। নিউটন এই সূত্রটি যেন গালিলিওর রূপান্তর ফ্রেমটি মেনে গড়ে তোলা।—চলন্ত ট্রেনে জানালায় বসে থাকা দর্শক যেন হঠাৎ নেমে লাইনে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনটিকে দেখে। দর্শকের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য গতির দিক আলাদা হয়ে ধরা পড়ে। একটি গতিশীল ফ্রেম যখন স্থির ফ্রেমে ধাক্কা মারে, স্থির ফ্রেম একই দিকে গতি নিয়ে সরে যায়। ধাক্কা খাওয়ার আগে স্থির ফ্রেমের দর্শক গতিশলি ফ্রেমটিকে যেভাবে দেখেছিল, সে যখন নিজে গতি নিয়ে চলে তখন দেখে আগের গতিশীল ফ্রেম, যে এখন স্থির, সেই যেন উলটোমুখী চলেছে। এই যে দেখা, এ দেখা আপেক্ষিক, এ দেখা ফ্রেমের সাপেক্ষে।

ধাক্কার কথা ভাবলেই শক্তির কথা মনে হবে। নিউটনের ওয়ার্ক যা কিনা ফোর্সের স্থানিক পরিবর্তনের ধারা জানায় সে যেন একটি স্প্রিং-এর পুতুলের মত—যে পুতুলটি যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ নেচে চলে, শক্তি খরচ করে। পুতুলটির মধ্যে কাজ করার মালমশলা ভরে দেয়া হয়েছে। তার কার্য ক্ষমতা আছে—আছে অপ্রকাশিত পোটেনশিয়াল শক্তির রূপ নিয়ে। যখন সে নেচে চলে, তখন পোটেনশিয়াল শক্তি গতিশক্তিতে, কাইনেটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত হবে। যতক্ষণ দম, ততক্ষণ নাচ। দম ফুরোলো তো নাচ ফুরোলো। কাজের প্রবৃত্তি, যা পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে রুদ্ধ ছিল, সে গতিশক্তি হয়ে কাজের প্রকাশ জানিয়ে শেষ হয়ে যায়।

স্পেস, টাইম ও মাস এই তিনটিকে নিয়ে নিউটনের গতিশক্তির আলপনা।

1687 সালে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের প্রকাশ হয়। সুযোগ্য পাঠকের জন্য তাঁকে একশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। কেপলেরের উক্তিটি খাটে তাঁর উত্তরসূরী নিউটনের ক্ষেত্রে। জীবদ্দশায় ইউরোপ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন নি। 1699 সালে তিনি ফরাসী বিজ্ঞান সভার বিদেশী সভ্য নিযুক্ত হন। ঐ সভায় বিদেশী সভ্য ছিল সাকুল্যে আটজন। এই আটজনের মধ্যে লাইবনিৎসের নাম ছিল প্রথমে। আর নিউটন ছিলেন সপ্তম স্থানে। সেকালের ইউরোপীয় চিন্তায় ঐ স্থানটিই ছিল নিউটনের যোগ্য। 1790-92 সালে ইউরোপীয় গণিতবিদ লাপ্লাস সার্থক অর্থে নিউটন ও তাঁর প্রিন্সিপিয়া জগৎকে চেনালেন। লাপ্লাসের চোখ দিয়ে, মন দিয়ে বিজ্ঞান সমাজ নিউটনের সার্থক মূল্যায়ন করে।

একবার ইংল্যাণ্ডের হুইগদল পার্লামেণ্টে নিউটনকে তাদের মনোনীত সদস্য করে নেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে শিক্ষাবিদ হিসেবে নিউটন সদস্য হলেন।

পার্লামেন্টে কোনো বক্তৃতা তিনি কোনোদিন দেন নি। কখনো কোনো কথা, উচ্চবাচ্য করেন নি। শুধু একবার পার্লামেন্টের একজন গার্ডকে বলেছিলেন, 'জানালাটা খুলে দাওতো।'

নিজের জীবনে নিউটন জ্ঞানের নানা জানালা দুপাট করে খুলে গেলেন। বিজ্ঞানের ঘর আলোয়, গতিতে ভরিয়ে তুললেন। পার্লামেন্টে জানালা খোলার কথা তিনিই তো বলতে পারেন। তাঁকেই এ কথা বলা সাজে!

চলচপলার চমক

স্থির বিদ্যুৎ থেকে বিদ্যুৎচুম্বক তত্ত্বে পেঁছুতে মানুষের প্রায় দু'হাজার বছর লাগলো। গ্রীস দেশেই স্থির বিদ্যুৎ নিয়ে চিন্তা শুরু। এম্বার পাথর কাপড়ে ঘসে নিলে এক অদ্ভুত-আশ্চর্য আধিভৌতিক রোমাঞ্চকর শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ঘসে নেয়া পাথরটি মাথার চুলের কাছে ধরলে কোন্ এক বিস্ময়-রহস্য-উন্মাদনায় চুল খাড়া হয়ে ওঠে ; ভয়ে নয়, রোমাঞ্চনায় নয় ; ঘটনাটা ঘটে পাথরের শক্তিতে। গ্রীক এম্বার শব্দের অনুকৃতিতে ইলেকট্রিক শব্দটি পাওয়া গেল, এম্বারের যে শক্তি সেটি ইলেকট্রিক শক্তি ; এটিই স্থির বিদ্যুৎ। এই স্থির বিদ্যুৎ নিয়ে চর্চা তারপর থেকে দিব্বি চলে এল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি মিস্টিক মহলে, কুহেলি ঘেরা জগতে, একান্তে গোপনে এই চর্চা বজায় থাকলো। ইলেকট্রিক শক্তি এক দৈবীশক্তি ; পার্থিব কোন চিন্তা-ভাবনার সূত্রে একে প্রমাণ করা যায় না ; এর ব্যাখ্যা নেই। মুষ্টিমেয় লোক গোপনে এই চর্চা করে গেলেন, তাঁদের পাওয়া তথ্যগুলি লুকিয়ে রাখলেন ; এ-সব বাইরে প্রকাশ হলো না। এই গোপনীয়তার অন্দরমহলটি চাবি দিয়ে খুললেন আমেরিকার ব্যাঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। 1744-45 সাল নাগাদ আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছরের এই বুড়ো খোকাটি ঝড়-বিদ্যুতের বিকেলে ঘুড়ির সুতোয় চাবি বেঁধে জানলেন আকাশের বিদ্যুৎ আর ইলেকট্রিসিটিতে কোনো তফাত নেই। ঘুড়ির সুতো বেয়ে তড়িৎলেখা আর ইলেকট্রিসিটি একাত্ম হয়ে ধরা দেয়। ফ্রাঙ্কলিনের স্থির বিদ্যুতের চর্চা উড়ন্ত ঘুড়ির পথ বেয়ে এল। স্থির বিদ্যুতের তত্ত্বও তিনি জানালেন। তাঁর মতে পার্থিব সব বস্তু তৈরি হয় দুটি উপকরণে, সাধারণ বস্তু আর বৈদ্যুতিক বস্তুতে। এই দুটি বেশ সাম্য সমতা বজায় রেখে থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ বৈদ্যুতিক বস্তুর বৃদ্ধি বা ঘাটতি ঘটে, তবে সেই বস্তুতে চার্জ দেখা যায়—বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা জাগে। —সহজ সাধারণ তত্ত্ব। আর তার প্রমাণও পাওয়া গেল ফ্রাঙ্কলিনের হাত থেকে। একটি অসাধারণ-বিরল পরীক্ষা। ফ্রাঙ্কলিন দুজন মানুষকে নিলেন, তাদের একজনকে দিলেন বেশী ইলেকট্রিক বস্তু বা ফ্লুয়িড—সে হলো পজিটিভ চার্জের। আর একজনকে তৈরি করলেন নেগেটিভ চার্জের। দুটি লোক দুটি শুকনো কাঠের টুলের উপর দাঁড়ালো মাঝে ফাঁক। দুজনে হাত বাড়িয়ে যখনই দুজনকে ধরে তখনই তারা শক খায়। শকের ধাক্কা খেয়ে বিজ্ঞান সমাজের মালুম হয়—বিদ্যুৎশক্তির ঘাটতি বৃদ্ধি আছে। এরা দু'জাতের পজিটিভ আর নেগেটিভ। ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুতের ক্যাপাসিটার তৈরি করলেন—যেটি আজও রেডিও-টিভিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর লিখলেন একটি বই —**Experiment and observations on Electricity made in Philadelphia in America**—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কবিতা ছেড়ে বিদ্যুৎশিখা বিজ্ঞানপুস্তকে হাজির হলো।

তবু ইলেকট্রিক শক খাওয়াটি সেদিন মানুষের তেমন পছন্দ হলো না। স্থির

বিদ্যুৎ নিয়ে চর্চা বিজ্ঞান জগতে এসে গেলেও, তাকে সমাদরে ডেকে আসন দিতে কিছু দেরী হলো। কারণ স্থির বিদ্যুতের গতি নেই, সে দ্রুত জায়গা দখল করতে পারে না। সেই গতি এল 1786 সালে যেদিন লুইগি গালভানি ইলেকট্রিক স্রোত বা কারেণ্ট দিয়ে মরা ব্যাঙের পা নাচালেন। গালভানি দেখলেন বিদ্যুৎ হর্ষিত-ছন্দিত চরণ।…স্থির বিদ্যুৎশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হলো। যা ছিল শুরুতে মাথার চুল খাড়া করে তোলা, সেটি এবার পায়ে হাজির হয়ে পাটিকে ঠকঠকিয়ে কাঁপিয়ে দিল। চুল থেকে পায়ের নখে পর্যন্ত রোমাঞ্চনা জাগে!…সেদিন গালভানি দেখলেন ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বিভিন্ন আরকে ডুবিয়ে রাখলে একটা শক্তিস্রোত পাওয়া যায়—এই শক্তিস্রোতের নামকরণ হলো গালভানি কারেণ্ট। গালভানির খপ্পরে পড়ে স্থির বিদ্যুতের পা গজায়, সে চলতে ফিরতে শুরু করে। আর চলতে শিখেই শুরু হলো চল-বিদ্যুতের লম্বা লম্বা দৌড়। দৌড়বাজ এই বিদ্যুৎকে ট্রেনিং দিতে এলেন অনেক বিজ্ঞানী।

গালভানির পথ ধরে আলেসান্দ্রো ভোল্টা ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে 20শে মার্চ 1800 সালে প্রথম বিদ্যুৎ-সেল তৈরি করলেন। ভোল্টা নিলেন দুটি ধাতুর পাত; একটি জিংক, অন্যটি কপার বা তামা। দুটির মাঝখানে রাখলেন নুনজলে বেশ করে ভেজানো একটি ব্লটিং পেপার। এখানে স্বচ্ছন্দে গালভানি কারেণ্ট পেলেন ভোল্টা। তাছাড়া এধরনের সেলদের সিরিজ বা প্যারালাল করে সাজিয়ে গাঁথলে শক্তির পরিমাণ যে কমানো বাড়ানো যায়—সেটিও ভোল্টার আবিষ্কার। এই আবিষ্কারটি নবদিগন্তের দ্বার খুলে দেয় ইলেকট্রিক শক্তির ব্যবহার সহজ হয়ে ওঠে। অনেক তথ্য পাওয়া যায় —তত্ত্বের দ্বারে আসা সহজ হয়। এই দ্বারে নাড়া দেবার খুটখুট আওয়াজ, আক্ষরিক অর্থে কান পেতে শুনলেন ভোল্টা। এক সারি বা ব্যাটারি সেল থেকে দুটো তার দুকানে লাগিয়ে ভোল্টা শুনলেন রান্নাঘরের ঝোলের ফুটে ওঠা বগবগানি-টগবগানি শব্দ। গল্পে আছে, ভোল্টা এই শব্দটি তাঁর স্ত্রীকে শোনাতে চেয়েছিলেন। স্ত্রী বললেন, থাক, তোমার হাতে পড়ে, সারাজীবন রান্নাঘরের আওয়াজটাই কানে নিয়ে ঘুরছি। - আর ঐ শব্দ বাড়িয়ে কাজ নেই।…স্ত্রীকে শোনাতে না পারলেও ভোল্টা ঐ শব্দ বিজ্ঞানের কানে শুনিয়ে গেলেন। আর সেই শব্দের সূচনা দিয়ে শুরু হলো বিদ্যুতের রেশ।

এর আগে কুলম্ব স্থির বিদ্যুতের চার্জের শক্তির সূত্র জানিয়েছেন; মহাকার্ষ গণিতের শক্তির সঙ্গে মিল রেখে এই সূত্র গড়ে উঠলো। কুলম্বের আগে কেভেণ্ডিস দুটি চার্জের মধ্যবর্তী শক্তিটির নিয়মের ইঙ্গিতটি জেনেছিলেন। তবে এটি তিনি প্রকাশ করেন নি।… সে যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যুতের যে দৌড় শুরু হলো সেই দৌড়ে যোগ দিয়ে আন্দ্রে মারী এম্পিয়ের এবং বিয়েরা সার্ভার্ট বিদ্যুৎ-চুম্বকের মৌলিক নিয়মের দ্বারে শতাব্দীর প্রথম পদেই পেঁছে গেলেন। এঁরাই দেখলেন শুধু বিদ্যুৎ দিয়েও চুম্বকধর্মী শক্তি পাওয়া যায় ইলেকট্রিক কারেণ্টের চারপাশে স্পেসে যেন চুম্বকের টান জাগে। 1823 সালে এম্পিয়ের বিদ্যুৎ আর চুম্বক নিয়ে তাঁরা তথ্য আর তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন আণবিক বিদ্যুৎ-এর পরিচলন থেকে চুম্বক পাওয়া যায়! যে আশ্চর্য ঘোষণা তিনি করলেন প্রায় এক শতাব্দী পরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোয়াণ্টাম

বিজ্ঞানীরা সেই ঘোষণার ব্যাখ্যা দিলেন। এটমের পজেটিভ চার্জের কেন্দ্রের চারদিকে পাক খায় নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন; পাওয়া যায় বিদ্যুৎ-কারেণ্ট আর পাওয়া যায় চুম্বক-ফোর্স।

তবু এম্পিয়ের বা সার্ভার্ট নয়; যিনি চল-বিদ্যুতের রথটি দ্রুত চালিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি মাইকেল ফেরাডে। জন্মসূত্রে কর্মকার বা ব্ল্যাকস্মিথ তিনি। পেশায় ছিলেন দপ্তরি। একুশ বছর বয়সে সেই পেশা ছাড়লেন। তিনি হলেন বনেদী ধনী ইংরেজদের Journev man বা চলন সাথী। এই সূত্রে তিনি সেদিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হেমফ্রি ডেভির কাছাকাছি এলেন, তাঁর সাহায্যে রয়েল ইনস্টিট্যুশনের লেবরেটারি এসিসটেণ্টের পদটি পান। 1813 সরলে স্যার ডেভি তাঁর নববিবাহিত পত্নীকে নিয়ে আড়াই বছরের লম্বা হনিমুনে বেরুলেন। সঙ্গে ফেরাডে। এই যাত্রাটি ফেরাডের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তিনি আর নিজেকে হরিপদ কেরানি ভাবতে পারলেন না ফিরে এলেন একজন পরীক্ষক বিজ্ঞানীর রূপ নিয়ে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে :821 সালে প্রথম ইলেকট্রিক মোটর তৈরি করলেন তিনি। সেদিন 25 শে ডিসেম্বর। ক্রিসমাসের দিনে নববিবাহিত স্ত্রীকে একটি আশ্চর্য উপহার দেবেন বলে নিয়ে এলেন তাঁর লেবরেটারিতে। মিসেস ফেরাডে সেই আশ্চর্য উপহারের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেটি ইলেকট্রিক মোটর। ক্রিসমাসের দিনে মাইকেল ফেরাডের উপহার; —শুধু স্ত্রীকে নয়। মানবসমাজকে দিয়ে গেলেন তিনি।···তবু তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হলো ইলেকট্রিক ইনডাকশন বিভাগে—যে বিভাগের মুখবন্ধটুকু ডেনমার্কের পদার্থবিদ হান্স ক্রিশ্চান ওরস্টাডের সৃষ্টি। গুণধর্ম যেমন অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে; ফেরাডে দেখলেন, ইনডাকশনের ফলে তেমনি কিছু কিছু বস্তু যেন বিদ্যুৎ-ধর্মে উত্তিষ্ঠিত—জাগ্রত হয়ে ওঠে। এরই পথ ধরে বিদ্যুৎ আর চুম্বকে মিল খুঁজে পান ফেরাডে। দীর্ঘ দশ বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 17ই অক্টোবর 1831 সালে বিশ্ববাসীকে ফেরাডে জানালেন, বিদ্যুতের স্রোতের ফলে চুম্বকধর্ম পাওয়া যায়, আর উল্টোদিকেও চুম্বকের স্রোতের পরিবর্তনের ধারায় ধরা দেয় বিদ্যুতের স্রোত বা কারেণ্ট।···মিল খুঁজে পেয়ে ফেরাডে আর এই তত্ত্বতথ্য নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি লাইন অফ ফোর্স আইডিয়াটি আনলেন। ব্যাস ঐখানেই থামলেন তিনি। খেলনার মজাটা জানা হয়ে গেছে —আর ওটা নিয়ে টানা-হেঁচড়ার দরকার নেই—এবং দরকার নেই তার আবিষ্কারের পেটেণ্টে অথবা ব্যাণিজ্যক রূপ দিতে। তিনি বিদ্যুৎ-চুম্বকের অন্য গুণধর্ম খুঁজতে ব্যস্ত রইলেন।

ফেরাডের ইণ্ডাকশন তত্ত্বের দ্বারে, এদিকে আরেকজন বিজ্ঞানী প্রায় একক প্রচেষ্টায় হাজির হলেন—তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ হেনরি। তাঁরই পথ ধরে মোর্স আবিষ্কার করলেন টেলিগ্রাফ। গালভানির কানে গতিবিদ্যুৎ যে আধো-আধো বক্‌বকানি শুনিয়েছিল, মোর্সের হাতে সেটি সংকেতময় টরেটক্কায় সংবদ্ধ হলো। আর জোসেফ হেনরি 1842 সালে রেডিওর সংকেতের কথা জানালেন। সেই কথা শোনার জন্য সেদিন বিজ্ঞান জগৎ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই হেনরির বেতার তরঙ্গ অবহেলিত হয়ে থাকলো।

টুকটাক আবিষ্কার হচ্ছে, তথ্য জোগাড় হচ্ছে। তবু সঠিক তত্ত্বের দেখা নেই। ফেরাডের গণিত-জ্ঞান সামান্য। তাঁর প্রখর ইনষ্ট্যুশনের সাহায্যে তিনি যন্ত্রবিজ্ঞানে বিপ্লব আনতে পেরেছিলেন। তবু কেন যে এসব হচ্ছে সেই ধারাটি বোঝার-জানার ক্ষমতা বা ভাষা তাঁর আয়ত্তে ছিল না। সেই ভাষাটি হাতিয়ার করে বিজ্ঞান জগতে হাজির হলেন একজন, নাম জেমস্ ক্লার্ক মেক্সওয়েল।

উনিশ বছর বয়সেই তিনি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বন্ধুরা তাঁকে ডাকতো Dafty-খেপা বলে। কেম্ব্রিজে যখন ছাত্র তিনি, তখন তিনি দিনের চব্বিশ ঘণ্টাকে তরঙ্গের মত ভাগ করলেন—একভাগে থাকবে জেগে থাকা—অন্য ভাগে ঘুমনো। আর সেই কারণে রাত্রি দুটো থেকে আড়াইটা পর্যন্ত হলো তাঁর ব্যায়ামের সময়। এই সময়টা তিনি ছাত্রাবাসের করিডরে ছুটোছুটি করতেন। এই রুটিনের ব্যত্যয় ছিল না—ব্যতিক্রম ঘটেনি। 1854 সালে তেইশ বছর বয়সে তিনি ডিগ্রি পেলেন। তবু সঙ্গীদের আরো যেন জ্বালাতে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন। এই সময়ে তিনি জানালেন বর্ণালীর মূলবর্ণ তিনটি—লাল, সবুজ, নীল। বাকি সব রঙ—এই তিনরঙে রাঙানো। মেক্সওয়েলের রঙের সূত্র ধরে রঙিন টেলিভিসনের কল্পনা—তবে তা' অনেক পরে।···বাবার অসুখের জন্য তিনি স্কটল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন ; আর এখানেই তিনি বিয়ে করেন তাঁর কলেজের প্রধানের কন্যাটিকে। পিসীকে একটি চিঠিতে বিয়ের আগে লিখলেন, "ও কিন্তু মোটেই অঙ্ক জানে না ; তবে অন্য অনেক কিছু জানে। তাছাড়া, মোদ্দাকথা হচ্ছে, আমার গণিত চর্চার ও কোন বাধা হবে না।"—মিসেস মেক্সওয়েল তাঁর স্বামীর বাধা ছিলেন না। এক আশ্চর্য সহমর্মিতা ছিল এই দম্পতীটির।···নির্বাধ মেক্সওয়েল তাপগতি বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন, শনির বলয় সম্পর্কে গবেষণা করেন। তারপর 1865 সালে চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশ করেন একটি যুগান্তকারী রচনা—A Dynamical Theory of Electromagnetic field—বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের গতিতত্ত্ব। এর আগে অবশ্য তিনি 1860 সালে লণ্ডনের কিংসকলেজে 29 বছর বয়সে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদটি পান।

1865 সালে ফেরাডে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের খুঁজে তুলে আনা, ভরে ওঠা ফুলের সাজিটি হাতে নিয়ে একটি সূত্রে মালা গাঁথলেন মেক্সওয়েল—এটি তাঁর তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্র-তত্ত্ব। কারেণ্ট বা স্রোতের ধারণার বদলে তিনি শক্তিক্ষেত্রের চিত্রকল্পটি ব্যবহার করলেন। ক্ষেত্র কি ? এই প্রশ্নের জবাবে মেক্সওয়েল দেবতার মাথার চারদিকের Halo বা জ্যোতির্বলয়ের কথা তুললেন। দেবতার মাথার চারদিকে যে গোলাকৃতি উজ্জ্বল আলোক বৃত্তটি শিল্পী এ'কে থাকেন এটির উজ্জ্বলতা সীমার কাছে কমে যায়, কেন্দ্রের কাছে ঔজ্জ্বল্য বেশী। মেক্সওয়েল বললেন, ক্ষেত্রও তাই। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে শক্তির পরিমাপ বা পরিমাণ যা থাকে, সেটি দূরত্বের সঙ্গে কমে যায়। তবু অনেক অনেক জায়গা জুড়ে শক্তি তার টানক্ষমতা বজায় রাখে। একটি বিদ্যুৎ চার্জ বা একটি চুম্বক-অণুর চারপাশে ব্লটিং পেপারে ধেবড়ে যাওয়া কালির ফোঁটার মত শক্তির ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। আর ধেবড়ে যাওয়া দাগটি যেন ঐ একফোঁটা কালির শক্তিক্ষেত্র—যা

সমতলিক। জ্যামিতিতে ক্ষেত্র বোঝাতে জানানো হয়—এটি অনেক রেখার সমষ্টি। শক্তিক্ষেত্রও অনেক শক্তিরেখার সংহত অবস্থা। ফেরাডের লাইন অফ ফোর্স সহজেই মেক্সওয়েলের ফিল্ডে ঠাঁই খুঁজে পায়। চার্জ বা চুম্বক অণুর কাছে ঐ রেখার শক্তি বেশী —যেন ঘন করে আঁকা। যতদূরে যাওয়া যায়—শক্তিরেখা আবছা অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়—ক্ষেত্রের পরিসীমা সেখানেই যেন আপাতত শেষ। আর তার আমেজ নেই।

মেক্সওয়েলের ক্ষেত্রতত্ত্বে একটি ঘোষণা থাকে—সেটি হলো পরিবর্তিত চুম্বক ক্ষেত্র থেকে যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র পাওয়া যায়, তার ফলাফল পরিবর্তিত বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাপ্তির চেয়ে কম। অনেক কম। তাঁর ক্ষেত্রতত্ত্বের ফলাফল জানাতে হাজির হলো টাইম বা সময়। জানা গেল, এখানে কাজ করে আলোর গতি ; আর তড়িৎ তরঙ্গ ও চুম্বক তরঙ্গ সেই গতিতে একসঙ্গে ছুটে যায়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রের মিল টেনে মেক্সওয়েল যে বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্র পেলেন, সেখানেই তিনি পেলেন বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ, যার গতি আলোর গতির সমান। আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যবর্তন ইত্যাদির গাণিতিক ব্যাখ্যা তাঁর গড়া বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে দেয়া গেল। তাঁর তত্ত্ব থেকে জানা যায়, দৃশ্য আলোর বর্ণালী তরঙ্গ বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ বর্ণালীর একটি সামান্য অংশমাত্র। এর দু পাশে, বড় ছোট নানাজাতীয় তরঙ্গ থাকতে পারে। আর এই ধারণা প্রমাণ তাঁর মৃত্যুর আটবছর পর 1887 সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেনরিখ হের্ৎসের কাছ থেকে পাওয়া গেল।

বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ তত্ত্বের শেষটানটি দিবার জন্য মেক্সওয়েল কাজ ছেড়ে পৈত্রিক জমিদারীতে এলেন। কাজ করেন, অঙ্ক কষেন, প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করেন এবং কবিতা লেখেন। এই নিরুপদ্রব অবসরটি সরিয়ে রেখে 1871 সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত কেভেণ্ডিস লেবরেটারির এক্সপেরিমেণ্টাল ফিজিক্সের প্রধান হয়ে যোগ দিলেন। আর এই সময়েই তিনি হেনরি কেভেণ্ডিসের কাগজপত্র নথিপত্তর সম্পাদনা করেন। জানা যায়, বিদ্যুৎ নিয়ে কেভেণ্ডিসের কাজের কথা।

জীবনের শেষ দু বছর মেক্সওয়েল রুগ্ন পঙ্গু স্ত্রীর সেবাতে কাটালেন। অথচ, তাঁর হাসিমুখ দেখে কেউ জানতে পারেনি, তিনিও রুগ্ন ; ভীষণ অসুস্থ। তাঁর অসুখ ক্যানসার! তবু যন্ত্রণার ভাব চোখমুখে ফুটে ওঠেনি, বন্ধু-ডাক্তার কাউকে জানান নি। জীবনের শেষ অংশে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের নবম ভল্যুমের ইথার নামক নিবন্ধটি রচনায় ব্যস্ত রইলেন। অবশেষে 1879 সালের 5ই নভেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ইথার নিয়ে মেক্সওয়েলের লেখা যেন সাজে। কারণ মেক্সওয়েল জানিয়েছেন আলো হলো বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ!

তরঙ্গের প্রবাহে একটি মাধ্যম দরকার। যেমন জলতরঙ্গ—জলবিনে তরঙ্গ নেই। যেমন শব্দ। এই তরঙ্গ বাতাস বা অন্য কিছুর মধ্যে আলোড়ন আন্দোলন ঘটিয়ে এগিয়ে যায়। মাধ্যম ছাড়া শব্দের গতি নেই। অন্যদিকে আলোকে নিউটন তাঁর তত্ত্বে কণা বা কর্পাসকুল জানালেও তাঁরই সমসাময়িক হাইগেন্স এটিকে তরঙ্গ বলে

জানিয়েছেন। মেক্সওয়েলের আলো—সেও তো তরঙ্গ! এই আলো—যার একটি প্রচণ্ড গতি আছে, সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার, সে কোন পথে তরঙ্গাকারে ছুটে যাবে? দূর লোক থেকে আলো আসে—আসে সূর্য থেকে, দূরের নক্ষত্র নীহারিকা থেকে। আসে প্রচণ্ড গতি নিয়ে মহাকাশের পথ ধরে মহাশূন্য পেরিয়ে। আসে তরঙ্গ-রূপ বজায় রেখে। কি সেই তরঙ্গের মাধ্যম? মহাশূন্য পথে, মাধ্যমহীন স্পেসে আলো তরঙ্গাকারে ছুটে চলে, এটি যুক্তি-বিচারে মানা যায় না। তার একটি মাধ্যম থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা বললেন এই মাধ্যম Lumeniferous ether বা আলোক-পরিবাহী ইথার, অথবা সংক্ষেপে ইথার। এই ইথার মহাশূন্য ভরে আছে। আছে সব বস্তুর অভ্যন্তরে। নিউটনের স্পেস ইথার নামক বস্তুতে ভরা। ইথারের উপস্থাপন এতই যুক্তিসম্মত, এত সুন্দর যে বিজ্ঞান-সমাজ একে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসন দেন। এমন কি কোনো কোনো বিজ্ঞানী থিয়োরির পথ ধরে ইথারের ডেনসিটি-ঘনত্ব মাপতে চেষ্টা করেন।

1864 সালে মেক্সওয়েলের তরঙ্গতত্ত্ব ইথারের চিন্তার ভিত্তিটিকে আরো সুদৃঢ় করে তোলে। পুকুরে ঢিল ফেললে ঢেউ জাগে—সেই ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রজ্বল-উজ্জ্বল বস্তু থেকে আলো বেরিয়ে আসে—সেও যেন ঢেউ, যে ঢেউ স্পেসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে আলোড়ন তুলে শব্দতরঙ্গ যায়, জলের বুকে কাঁপন জাগিয়ে ঢেউ জাগে। একই চিন্তার পথ ধরে বিজ্ঞানীরা ইথার নামক মাধ্যমের কথা ভাবেন। —এই ইথারের চিন্তা আরিস্তোতলের ছিল। তাঁর পঞ্চভূত বা এলিমেণ্টের পঞ্চমটি হলো ইথার—যাকে হিন্দুরা নাম দিয়েছিল ব্যোম—যা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে থাকে, যার বাইরে আর কিছু নেই—যে আছে সব কিছুর শেষে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গীর প্রশ্নের জবাবে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আকাশে সব কিছু ওতপ্রোত, আকাশই সবকিছু ঢেকে রেখেছে। আকাশের আর পর নেই।'—এই আকাশ, এই ব্যোম—এটিই সুপ্রাচীন ইথার। আর মেক্সওয়েলের ইথার হলো আলোকপরিবাহী মাধ্যমটি—যে স্পেসে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আছে মহাকাশে, আছে এটমের অভ্যন্তরে! এটি একটি সাবস্টেন্স বা বস্তু!

ইথার যদি বস্তু হয়, তবে তার গুণ থাকবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এও গুণের। সর্বত্র ইথার যদি ছড়িয়ে থাকে, তবু ইথার নিজে স্থির, তার কোনো গতি নেই। তবে গ্রহ-নক্ষত্র মহাকাশে কি করে গতি নিয়ে চলে? কেমন করে আলো ছুটে যায়? বিজ্ঞানীরা ফ্লুয়িড তত্ত্বের প্রয়োগ করে ইথারের গুণধর্ম বর্ণনা করেন। যেমন এক টুকরো মোম। যে কোন যান্ত্রিক আঘাতের কালে এটিকে শক্ত-সুদৃঢ় মনে হয়। অথচ, এই টুকরোটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে গলে যায়, গলে নিজের ভারে। ইথারও সেই রকম। ইথার শক্ত, কঠিন—সে শুধু আলোর কাছে। তাই আলোক-তরঙ্গ ইথারের বুকে কোন চিহ্ন না রেখে, গতি না হারিয়ে সিধে ছুটে যায়। ইথার নরম, তরল অন্য সব বস্তুর কাছে, যাদের গতিবেগ আলোর তুলনায় অনেক কম। গ্রহ-নক্ষত্র সেই নরম ইথারের পথে হালকা চালে আলতো পায়ে ঘুরতে পারে—ইথার তাদের গতির প্রতিবন্ধক নয়।

এই যে অজানা-অচেনা ইথারকে বর্ণনা দেবার চেষ্টা—এটি যেন কোনো চেনা-জানা যান্ত্রিক ছকে ধরা যায় না। আমাদের জানা সাবস্টেন্স বা বস্তুর গুণধর্ম বোঝাতে আমরা তার এটমিক গঠনের কথা ভাবি। জলের তরলত্ব, রবারের স্থিতিস্থাপকত্ব অথবা হিরার কাঠিন্যের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিতে আমরা অণু-পরমাণুর জগতের কথা টানি। জলের অণু সহজেই নড়াচড়া করে, তাই জল তরল। রবারের অণু সহজে অন্য গঠনে সাজিয়ে দাঁড়ায়, রবার তাই স্থিতিস্থাপক। কার্বনের অণু তার লেটিস বা ছকে সুদৃঢ় করে আঁটকে থাকে,—হিরা কঠিন! ইথারের কাঠিন্য বা তরলত্ব বোঝানোতে এমন কোন এটমিক নিয়ম নেই। ইথার মেটার নয় ;—ইথার একটি সাবস্টেন্স, যার তুলনা সে নিজে! এই অতুলনীয় ইথারের বর্ণনা মেক্সওয়েল তাঁর কাব্যময় ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে করলেন।

তবু প্রশ্ন থাকে! সব মহাজাগতিক বস্তু গতি নিয়ে চলেছে এই গতির পরিমাপ করা হয় তুলনা নিয়ে। এই যে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে গড়া গতি—সেই গতি যদি গতিহীন ইথারের বুকে ছুটে চলে বলে জানানো হয়, সেটি কি সঠিক বর্ণনা? গতিহীন ইথারের সাপেক্ষে কোনো গতি কি ধরা পড়ে? ইথার,—যে সর্বত্র আছে, যার পরিমণ্ডলের কোন পরিবর্তন নেই, সেই ইথারের তুলনায় গতিকে কি বোঝা যায়? বিজ্ঞানীরা বলেন, পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটবে। যেন অনন্ত অপার সমুদ্রে জাহাজের বুকে বসে থাকা লোকটি জলের পিছনে সরে যাওয়া দেখে জাহাজের গতি জানে, তেমনি ইথার নামক মাধ্যমটিও গতির ফলে সরে যাওয়া ঘটবে। চলন্ত নৌকায় বসে জলে হাত দিয়ে জলের সরে যাওয়ার গতি স্পর্শ পাওয়া যায়,—এই একই ছোঁয়া ইথারের বুকে জাগবে—ইথারের Drift বা সরে যাওয়া, ইথার বায়ুর ক্রিয়া, গতির ফলে দেখা যাবে, জানা যাবে। এই চিন্তা মেক্সওয়েলের। তবু চিন্তা ভাবনায় শেষ তুলির টান দেবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেদিন 1879 সাল। ঐ বছরে—ফিজিক্সের জগতে কোন রোমহর্ষক কাজের দেখা পাওয়া যায়নি! এই বছরে জোসেফ স্টেফান একটি পেপার প্রকাশ করেন Sitzungsberlche der akademic der Wissenschaften in Wein নামক পত্রিকায়। এখানেই তিনি জানান, একটি নিখুঁত শোষক (Perfect absorbing body) যে শক্তি বিকিরণ করে সেটি পরম তাপাঙ্কের চতুর্বর্গের (T^4) অনুপাতে জানা যাবে। এই অনুপাতে একটি ধ্রুবকের বা কনস্ট্যান্টের কথা জানা গেল—যেটি স্টেফানের কনস্ট্যান্ট। এই কনস্ট্যান্টটি নিয়ে পদার্থবিদ্যার জগতে খুব একটা হইচই আলোড়ন ঘটলো না। এর সঠিক মূল্যায়ন ঘটে প্রায় কুড়ি বছর পর মাক্সপ্লাঙ্কের হাতে 1900 সালে। এবং এই 1879 সালে একুশ বছর বয়সে প্লাংক তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি পান।

1879 সালে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা প্রবন্ধটি লেখার জন্য মেক্সওয়েল একটি ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। আর সেই সময়ে তিনি ডিপি টডের একটি চিঠি পান। ওয়াশিংটনের নটিকেল এলমানাক অফিসের ডিরেক্টর ছিলেন টড। তাঁর চিঠিতে ছিল জুপিটারের চাঁদের গ্রহণের সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা ও প্রশ্ন। টড লেখেন, "আলোক পরিবাহী ইথার নামক মাধ্যমের সাপেক্ষে সূর্যের গতির পরিমাণ আর দিকনির্দেশনার

একটা ইঙ্গিত, খুব সম্ভবত, আমার বিবেচনায়, এই চাঁদদের সাহায্যে জানা যাবে।... "মহাকাশে আলোর ভেলসিটি মাপার যে পদ্ধতি আছে, সেখানে ধরে নেওয়া হয় যে আলো তার পূর্বের পথ ধরেই ফিরে আসে। অথচ, ইথারের সাপেক্ষে এই যাতায়াতের কালে, পৃথিবীর ভেলসিটি ঐ সময়ের হিসেবে একটি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ধারা আনবে—সেটা হলো পৃথিবীর গতি আর আলোর গতির অনুপাতের বর্গফল অর্থাৎ $\frac{v^2}{c^2}$॥ অবশ্য এটা এত ছোট যে প্রায় ধরা যায় না। তবুও সময়ের হিসেবে অসঙ্গতি থাকে।"

এই চিঠির একটি উত্তর 1879 সালের নভেম্বরের নেচার পত্রিকায় ছাপা হয়—লেখক মেক্সওয়েল এবং ছাপা হয় তাঁর মৃত্যুর মাসে। এই চিঠিটি পড়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভেল একাডেমির একজন ইনস্ট্রাক্টর এলবার্ট এ মাইকেলসন। তিনি ঠিক করেন, আলোর যাতায়াতের সময়ের অসঙ্গতিটুকু মাপবেন। মেক্সওয়েল তাঁর চিঠিটি যে কাগজে লেখেন সেটি কেমব্রিজের কেভেণ্ডিস লেবরেটারির লেটার হেডে, তারিখ 19শে মার্চ 1879 সাল। চিঠি লেখার পাঁচদিন আগে আইনস্টাইনের জন্ম।

এই 1879 সালে দুটি সমস্যার সূচনা হয়। একটি বিকিরণের শক্তি বণ্টনের সমস্যা—একটি ধ্রুবকের হাজির হাওয়াতে বিপত্তি। এই সমস্যার পদপূরণ করতে একুশ বছরের প্লাংক সেদিন এগিয়ে আসেন নি। সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় আরো একুশ বছর পর, বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, 1900 সালে।

আর ইথার নিয়ে টড যে প্রশ্ন তোলেন তার জবাবে মেক্সওয়েল বললেন যে, এনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে সংগৃহীত জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন, ইথার আর এরই মধ্যে যেসব বস্তু ঘুরে চলেছে তাদের আপেক্ষিক গতিটি ঠিকমত জানা যায় না। হয়তো কোন দূরের গ্রহের উপগ্রহের সাহায্যে এই আপেক্ষিক গতিটি জানা যাবে। তবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন। তিনি জানেন না কি করে এই মাপজোখ হবে।

ইথারের গতি মাপা কঠিন এটি জানেন মেক্সওয়েল। সেই কঠিন কাজটি করতে গিয়ে বিজ্ঞান জগতে সমস্যা তোলেন মাইকেলসন। আর সমস্যার সমাধানে নামেন সেই বছরে যে ছেলেটির জন্ম, সেই এলবার্ট আইনস্টাইন!

একই বছরে, 1879 সালে এক মহাবিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় আর জন্ম হয় আর এক মহাবিজ্ঞানীর। অপ্রতিরোধ্য, অপ্রতিহত বিজ্ঞানের প্রবহমানতা আরেকবার যেন প্রমাণ হয়!

শ্রী ডি. পি. টডকে লেখা মেক্সওয়েলের চিঠি

কেভেণ্ডিস লেবরেটরি
কেম্‌ব্রিজ
19শে মার্চ, 1879

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পাঠানো জুপিটার বা বৃহস্পতির উপগ্রহের সারণীটি পেয়ে সম্মানিত হলাম। এই বার্হস্পত্য জগতে আপনার এই ইণ্টারেস্ট দেখে একটি প্রশ্ন আপনাকে

করতে আগ্রহী হচ্ছি ; বৃহস্পতির ভূকেন্দ্রিক অবস্থানের সাপেক্ষে গ্রহণকালের কোন হ্রাস কি আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

শুনেছি আলোর ভেলসিটি মাপার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ জাতীয় পদ্ধতি আজকাল অন্যান্য নানা রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা ফেশনাবেল নয়। তবু মনে হয়, আলোক মাধ্যমের তুলনায় সূর্যের গতি ও দিগ্‌নির্দেশনার পরিমাণ একমাত্র এই পদ্ধতিতেই করা যেতে পারে। থিয়োরি অফ এবারেশন বা অপেরণ তত্ত্বকে সঠিকভাবে মেনে নিলেও, নক্ষত্রের অবস্থানের বিভিন্নতা ধরা যাবে। অপার্থিব বস্তুর সাপেক্ষে আলোর গতি মাপার নানা প্রণালীতে আলো তার পুরনো পথে ফিরে আসে,—কাজেই ইথারের বিধৃতিতে পৃথিবীর গতির জন্য যাতায়াতের সময়ের সামান্য হেরফের ঘটবে ; —এটি জানা যাবে, পৃথিবীর গতি আর আলোর গতির অনুপাতের বর্গ-অনুসারে। এত ছোট তফাত যে ধরা বোঝা মুস্কিল।

যদি ধরা যায়, JE হলো জুপিটার থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এবং t হলো পৃথিবী-কেন্দ্রিক পথের লংগিটুড, এবং v গতি নিয়ে সূর্য যে পথে ইথারের মধ্যে ঘোরে, তার লংগিটুড t আর ল্যাটিটুডের t´, দিগ্‌নির্দেশনার পরিমাণ π, এবং যদি আরো ধরে নেয়া হয় যে, V হলো আলোর গতি এবং t হলো J থেকে E তে যাবার সময়, তবে

$$JE=[V-v\cos\pi\cos(t-t')]\,t.$$

রাশিচক্রের বিভিন্ন অবস্থানে জুপিটারের স্থিতি ধরে, t এর বিভিন্ন মান পাওয়া যাবে আর তারই ভিত্তিতে t´ ও $v\cos\pi$ কে স্থির করা যায়।

কোনো গ্রহের পথ খুব একটা উপবৃত্তাকার না হলে জানি না কি করে π'র মান জানা যাবে। লক্ষ্য করবেন, পৃথিবীর কক্ষ পথের সাপেক্ষে, JE'র বিভিন্ন অবস্থানের দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আলোর গতিটিকে মাপা হবে ; অন্যদিকে $V\cos\pi$'র মাপটি সম্পূর্ণ ভাবে JE'র উপর নির্ভরশীল,—এই দূরত্বটি তুলনায় বেশ বড়।

তবু, উপগ্রহদের গতিপথের সারণী ছাড়া কোন রীতিই এখানে ঠিকমত খাটানো যাবে না। আমি জ্যোতির্বিদ নই ; বলতে পারি না Damoiseau-এর (ডামোইসিউ-এর) পরীক্ষা ভিত্তিক টেবিলটির তুলনা টেনে $V\cos\pi$'র মান মাপার চেষ্টা হয়েছে কিনা। কাজেই এ পর্যন্ত যে উপগ্রহ নিয়ে বিশেষ কোন চর্চা করেনি, তার কাছে এই সব তথ্য জানার পরিধির বাইরে। অতএব আপনার কাছেই আমার প্রশ্নটি রাখছি।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের 'E'-অধ্যায়ে ইথার নিবন্ধে যে সব বস্তু ইথার-সমুদ্রের গতি নিয়ে চলে, ইথার সাপেক্ষে তাদের সম্পর্কে জানা সব তথ্য সংকলন করে দেখিয়েছি যে ঐ সব পরীক্ষাভিত্তিক তথ্য থেকে আপেক্ষিক গতি নিয়ে কোন মন্তব্য-মতামত করা যাচ্ছে না। মনে হয়, একমাত্র গ্রহদের উপগ্রহের গ্রহণ নিয়ে একাজ হয়তো সম্ভব। আর, গ্রহদের দূরত্ব যত বেশী হবে, ভুলের সম্ভাবনা তত কম।

আপনি বা আর কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে থাকেন, আর সে সংবাদ যদি আমাকে জানান, তবে আমি বাধিত ও কৃতজ্ঞ হব। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত / (সাঃ) **জে. ক্লার্ক মেক্সওয়েল**

[উৎস ঃ আইনস্টাইন শতবার্ষিকী ঃ কেম্‌ব্রিজ পেপার্স]

বাতাসে ঝড়ের সংকেত

নিউটন গতিবিজ্ঞানের অর্কেষ্ট্রা বৃন্দগানের স্বরলিপিটি দিলেন। অর্কেষ্ট্রাটির প্রথম সার্থক কণ্ডাকটার ফরাসী গণিতবিদ লাপ্লাস। তাঁরই হাতে নিউটনের সুরের উত্তালতায়, উচ্ছলতায় তীরভূমি ছাপিয়ে বহুদূরের অনাবাদি জমি সিক্ত হয়, অহল্যাভূমি শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে। নিউটনের গতিবিজ্ঞান খাটে সৌরলোকে, পার্থিব জগতে, যন্ত্রবিজ্ঞানে, তাপগতি বিজ্ঞানে। তবু নিউটনের তত্ত্ব বিচিত্র পথগামী হলেও সে সর্বত্রগামী নয়। সর্বশক্তিক্ষেত্রে, বিশেষ করে আলোক অথবা তড়িৎ চুম্বক-ক্ষেত্রে, নিউটনের গতিবিজ্ঞানটিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় না। তড়িৎ-শক্তি আর চুম্বক-শক্তি—এ দুটিকে নিউটনের তত্ত্বের মাপ-মশলা দিয়ে বোঝানো গেল না। এ দুটি শক্তির পরিমণ্ডলে আছে দু'ধরনের চার্জ বা পোল। তাদের মধ্যে যে ফোর্স কাজ করে সেটিও দু'ধরনের,—আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। অথচ বিশ্বজগতের সব বস্তুতে আছে এবং কাজ করে যে ফোর্স. যেটি গ্রাভিটেশন বা মহাকর্ষ, সেটি শুধু আকর্ষণের। বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া গেল চার্জের, যারা বিপরীতমুখী। —চার্জ মানে বস্তুর সেই গুণের পরিমাপ যেটি যারা নিতে পারে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে—পরিমেয় গুণধর্ম. চার্জ বিনিময়ে ক্রিয়াকলাপে অংশী হয়। একমুখী নিউটনীয় চার্জের ছকে দুমুখী চার্জের ক্রিয়াকে স্তব্ধ করা যায় না।

এই চার্জ বা পোল জাতীয় চিন্তা বহুদিন থেকে শুরু হলেও মাইকেল ফেরাডে তার পরীক্ষার ফলে পাওয়া নানা তথ্য সম্ভারের আলোচনা করে একটি সম্বন্ধ-সম্পর্ক, রীতিনীতির দ্বারে বিজ্ঞানীদের এনে দিলেন। সেই সম্পর্ক খোঁজা শুরু করেন গণিতবিদ গাউস। তরঙ্গ তত্ত্বের গণিত, সম্ভাবনার গণিত তাঁর হাত থেকে পাওয়া গেল। নিউটনের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, বাইনোমিএল থিয়োরেম এবং ফার্মেট-কার্তের হাতে গড়া কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি এবং ভেক্টর গণিতের ভাষাভঙ্গিমা ব্যবহার করে তিনি তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের বারোয়ারি উপন্যাসটির সূচনা করেন। আর মেক্সওয়েল এই উপন্যাসটির সার্থক সমাপ্তি টানেন। বিদ্যুৎ আর চুম্বক-তত্ত্ব দুটিকে একীকরণের অনন্যতার দাবী তিনিই করতে পারেন।

মেক্সওয়েল তাঁর তত্ত্বে নতুন যে ধারা বা ধারণা আনলেন, সেটি ফিল্ড। এই ফিল্ডের ক্রিয়াকলাপ শুধু চার্জের সঙ্গে। একটি চার্জ বা চুম্বক অণুর চারপাশে জ্যোতির্বলয়ের মত থাকে ফিল্ড; সে আছে, থাকে; তাকে সহজে বোঝা যায় না। শুধু অন্য আরেকটি চার্জ বা চুম্বক-অণু এই ফিল্ডের কাছাকাছি এলে তার ঘুম ভাঙে; ফোর্সের জন্ম হয়; ফোর্স কাজ করে। রসিকতা করে জেরম কে জেরম এই শতকে তাঁর রচনায় ফিল্ড শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করলেন, ফিল্ড প্রায় তাই। জেরমের বর্ণনাটি আমাদের দেশীয় পরিমণ্ডলে অনুদিত করলে যে গল্পটি পাই, তাহলো—যেন একদল শ্রমিক কাজ করছে। তাদের পরিশ্রমজাত স্বেদ গন্ধের জন্য তারা একেকজন যেন একেকটি গন্ধে ভরপুর কর্পূরদাস। এই গন্ধ অন্য শ্রমিকদের এতই গাসওয়া যে তারা এটি বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে কোনো ফিনফিনে ফটিকবাবু হঠাৎ যদি এই গন্ধের

ফিল্ডের আওতায় এসে পড়েন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ নাকে রুমাল দিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে পিটটান দেবেন।…উপমাটা খুব একটা জুৎসই হলো না; কারণ বিপরীত চার্জে আকর্ষণ থাকে, সমচার্জে বিকর্ষণ; জেরমের গল্পে এর উলটোটাই ঘটছে। তবু ফিল্ডের কাজ যে দূরে ছড়িয়ে থাকে এই গল্পে তারই নির্দেশনা পাওয়া যায়। ফিল্ডের জন্য শক্তি স্তর দূরে ছড়িয়ে থাকতে পারে।

উনিশ শতকে পদার্থবিজ্ঞানীরা সবকিছু ফ্লুয়িড তত্ত্ব নিয়ে বুঝতে চাইলেন; ফ্লুয়িডের বাক ভঙ্গিমা অন্যত্র খাটালেন। এখানেও, ঠিক সেই একই কারণে, ফিল্ডের সঙ্গে একটি শব্দ এল—ফ্লাক্স, যার মানে ফ্লুয়িডের ভাষায় প্রবাহ। ক্ষেত্রতত্ত্বে এই শব্দটির ব্যবহার হলো নিরন্তর পরিবর্তনের হার বোঝাতে—যেটি ঘুরিয়ে বললে প্রবাহই জানাবে। আর এলো লাইন অফ ফোর্স বা বলরেখা; এরা যেন ফ্লুয়িডের স্ট্রিম লাইনস বা ক্রমশঃ সরুরেখা। এই শব্দ, উপমা ইত্যাদির সাহায্যে, গণিতের ভাষার অনুবাদে, মেক্সওয়েলের হাতে বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্র তত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে। আর ঐ ফ্লুয়িড নিয়ে চিন্তাভাবনা একটি গোলমালের সৃষ্টি করে। ফ্লুয়িড মাধ্যম ছাড়া প্রবাহিত হয় না। এখানে বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তির মাধ্যমটি কি? মেক্সওয়েল এই মাধ্যমটির কথা ভাবলেন, তার নাম দিলেন ইথার। মাধ্যম থাকলে তাতে বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে, বিশৃঙ্খলা ঘটলে গতি দেখা দেয়। যেমন শব্দ বায়ুর মাধ্যমে চাপ স্ট্রস ইত্যাদি সৃষ্টি করে। শব্দের তরঙ্গে গতি আনে, এখানেও চার্জের দল ইথারের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে গতি আনবে। এই গতিটিকে বিদ্যুৎ ও চুম্বক ফোর্সের নিয়মে মাপা যায়। মেক্সওয়েল মাপলেন, এটি প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার,—অর্থাৎ সে আমলের সর্বোচ্চ যে গতি, সেই আলোর গতির সমান। অতএব, মেক্সওয়েল বললেন, আলো নির্ঘাত বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ; যেটি চার্জের গতির ফলে, স্পেসে ইথারের আন্দোলনে প্রবাহিত হবে।—এটি দূরদূরান্তে, ইথারের চাপে স্ট্রেসে পরিবর্তন ঘটিয়ে, ইথারের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। দূরদূরান্তে যে গতিক্রিয়া ঘটে, যাকে নিউটন বলেছিলেন actio in distans বা দূর জগতে ক্রিয়া, তারও মাধ্যমে থাকে। নিউটনের মাধ্যম ছিল স্পেস, যা পরম, ক্রিয়াহীন, উদাসীন। ইথার নামক মাধ্যমটির কল্পনা করে মেক্রওয়েল ঐ actio in distans-এর একটা বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর স্পেস ইথারে ভরা, সেই ইথার ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় নামতে পারে, গতিটিকে প্রবাহিত করে। ইথার আলোক পরিবাহী স্পন্দনশীল কঠিন, যার ভিতর দিয়ে আলো-তরঙ্গ সরলরেখায় যাবে। ইথার আবার খাঁটি ফ্লুয়িড, তাই সে কোন মহাজাগতিক বস্তুর গতির বাধা হবে না। আলোর কাছে ইথার কঠিন, অন্যের কাছে সে নরম। অথবা প্রচণ্ড গতিশীল বস্তুর কাছে ইথার কঠিন, আর ধীরগতিশীল বস্তুর কাছে তার হাবভাব ফ্লুয়িডের। এই কঠিন নরম বিপরীত গুণের আধার ইথার সেকালীন বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে এক অসম্ভব-অবাস্তব-অস্বাভাবিক মাধ্যম হয়ে ওঠে। নিউটনের পরম স্পেসের প্রতিদ্বন্দ্বী ইথার বিপরীত অলংকারের গুণে সেজে ওঠে; নির্গুণ স্পেসের পরিবর্তে বিজ্ঞানীরা সগুণ ইথারকে মেনে নেন।

নিউটনের গতিসূত্রে, মেকানিকসের তত্ত্বে প্রাকৃতিক বা ফিজিকেল ফোর্সরা বিশেষ বলে চিহ্নিত;—এদের বোঝাতে লাগে ইনারশিয়াল ফ্রেম। আবার গতিশক্তির ক্রিয়া-

কলাপ বোঝাতে লাগে গতিশীল রেফারেন্স ফ্রেম যেখানে গালিলিওর রূপান্তর রীতি প্রযুক্ত হবে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি জানায় যে, যেসব ফোর্স দূরের জগতে ক্রিয়াশীল তাদের যেকোন সময়ে স্পেসে বস্তুদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যাবে—স্থির ফ্রেম গতি পেলে দিকের ওলোটপালোট ধারণা জাগতে পারে—এ তথ্য নিউটনের গতিসূত্রের গঠনের ভিত্তিভূমিতে লেখা। এই তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় জানানো হয় যে, সব দর্শক তারা যেমন ঘূরূক-ফিরূক অথবা চলুক তাদের দেখার জগতে একটা সাধারণ ও সমান চারিত্রিক বিশেষত্ব দেখা দেয়। সময়ের সংস্কারের সঙ্গে এ ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নেই। নিউটনের জগতে পরমগতির কোন সুন্দর গ্রহণীয় ব্যাখ্যা নেই। অন্যদিকে তাঁর জানানো আপেক্ষিক গতিটি নানা ভেলসিটির ভেক্টর ভিত্তিক যোগফলে বোঝা যায়। তাঁর মেকানিকসের জগতে যে কোন গতিশীল বস্তুকে তার পরিপূরকের ফ্রেমের রেফারেন্সে স্থির করে বোঝানো যেতে পারে।

বিদ্যুৎবাহী চার্জকণার ক্রিয়ায় বা কারেন্টের রীতিতে তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রে যে ফোর্স ধরা পড়ে সেখানে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রটি খাটে না। তৃতীয় সূত্রের সাদামাটা ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা হলো, যে কোন ক্রিয়ার একটি বিপরীত অথচ সমান ক্রিয়া থাকবে,—এই ক্রিয়া ও বিপরীত ক্রিয়া এক জাতের, একটির সাপেক্ষে অন্যটি গড়ে ওঠে। অথচ ইলেকট্রিক চার্জযুক্ত কণা স্থির অবস্থায় তৈরি করে স্থির বিদ্যুৎ, এই কণারা যখন গতিশীল তখন পাওয়া যায় বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্র। একইভাবে পরিবর্তনীয় দিক অথবা গতিতে প্রবাহমান বিদ্যুৎ কারেন্ট তৈরি করে চুম্বক ক্ষেত্র। আবার এই বিদ্যুৎ কারেন্ট যখন অসিলেটারি, স্পন্দনশীল অথবা যখন পরিবর্তিত গতি ধারায় প্রবাহিত, তখন পাওয়া যায় সেই বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্র। এছাড়া 1854 সালে মেক্সওয়েল দেখলেন মুক্ত স্পেসে ছুটে চলা বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের গতি আলোর গতির সমান। নিউটনের গতিসূত্রে সমগতিতে ছুটে চলা ভরকণার সাপেক্ষে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, যেমন ভরবেগ বা মোমেন্টাম, শক্তি অক্ষয়ের নিয়ম ইত্যাদি,—এদেরও পাওয়া যায় বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের গতিময় রূপে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বিদ্যুৎ চুম্বকের ক্ষেত্রের গতিময় রূপ পদার্থবিদ্যার জগতে এক সন্ধিক্ষণ এনে দেয়।

দুটো গতিসূত্র পাওয়া যায়, একটি নিউটনের যান্ত্রিক বা মেকানিকেল ডাইনামিক্স,—সংক্ষেপে মেকানিকস এবং অন্যটি মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের গতিসূত্রটি। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের স্পেসের পরমতত্ত্ব জানতে সেযুগে বিজ্ঞানীদের সংশয় দ্বিধা। তাপ গতিবিজ্ঞান আর বিকিরণের পরীক্ষায় পাওয়া নানা তথ্যের প্রমাণ অথবা ব্যাখ্যা পরম স্পেসের সাপেক্ষে কিরশফ দিতে পারছেন না। আর্ণস্ট মাক এবং আঁরিপোআঁকার এই পরমতত্ত্বের সমালোচনায় সোচ্চার। এই সময়ে মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রতত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হলে, বিজ্ঞানীরা ভাবেন, ইথারের বিধৃতিতে, আলোর পথ ধরে স্পেসের গতিটির অবস্থিতি পরিমিতি ইত্যাদি জানা যেতে পারে। এই পরীক্ষাটি যার উপর নির্ভরশীল সেটি হলো আলোর মাধ্যম ইথারের আচার ব্যবহার। সে যদি মাধ্যম হয়, তার একটা স্বাধীন ক্রিয়া-বিক্রিয়া গতি-প্রকৃতি থাকবে। এটি নিউটনের স্পেসের মত নির্গুণ পরম নয়। অতএব স্পেসে যে কোনো বস্তুর গতি ইথারের সঞ্চালন বা গতি ধরে

বোঝা যাবে। কারণ, মেক্সওয়েলের তত্ত্ব থেকে জানা যায়, আলো একটি নির্দিষ্ট গতিতে ইথার নামক ইলাসটিক বা স্থিতিস্থাপক মাধ্যম দিয়ে প্রবাহিত হয়, ইথারের ইলাস্টিসিটিত্ব মেক্সওয়েলের তত্ত্বেই নিহিত। এটি নিউটনের স্পেস নয় যে, এ কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। ইথারের মডেল অনেক চেনাজানা বাস্তবসম্মত। তার একটা নিজস্ব গতি থাকা সম্ভব।

ইথারের গতি মাপার চেষ্টা হয়। শব্দ বাতাসের মধ্য দিয়ে যায়। বায়ুর সাপেক্ষে শব্দের গতি মাপা যায় এবং মাপা যায় পৃথিবীর গতির সাপেক্ষে। দ্বিতীয় মাপটিতে মাপা হবে বায়ুর গতির সাপেক্ষে শব্দের গতি আর পৃথিবীর সাপেক্ষে বায়ুর গতি ; তারপর এই দুটি গতির ভেক্টর যোগফল কষে জানা যাবে পৃথিবীর সাপেক্ষে শব্দের গতি। যা শব্দ ও বায়ুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা আলো এবং ইথারের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় প্রযোজ্য হবে। আর যদি ইথারের গতি নিশ্চিতভাবে মাপা যায়, তবে তারই তুলনায়, সাপেক্ষে পৃথিবী অথবা যে কোন মহাজাগতিক বস্তুর গতি অবস্থানটি সুনিশ্চিতভাবে স্থির করা যাবে—স্থির করা যাবে ইথারের ফ্রেমে, যে ইথার এই স্পেস ভরে রেখেছে। ভরে রেখেছে তার গতি দিয়ে, আন্দোলনে, সঞ্চালনে।

পৃথিবীর একটি গতি আছে—এটি সেকেণ্ডে 3×10^4 মিটার। আর আলোর গতি হলো 3×10^8 মিটার প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিটি স্থির করে মেপেছেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইকেলসন। মেপেছেন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে—যার নাম ইন্টারফেরেমিটার। তিনি ভাবেন, পৃথিবীর গতির দিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আলো পাঠিয়ে যদি আবার সেই যাত্রাবিন্দু বা উৎসবিন্দুতে আলোটি ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়, তবে একটি সময় পাওয়া যাবে। তেমনি পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি সেই একই দূরত্বে আলো পাঠিয়ে ফিরিয়ে এনে তারও একটা সময় মাপা যায়। সনাতন বিজ্ঞানের নিয়মে এই দুই মাপের সময়ে একটা তফাত থাকে। পৃথিবীর গতির দিকে আলো যাতায়াতে যতটা সময় নেয়, সেই সময় পৃথিবীর আড়াআড়ি পথে যাতায়াতের সময়ের চেয়ে $\frac{v^2}{c^2}$ বেশী। এখানে v হলো পৃথিবীর গতিবেগ আর c হলো আলোর গতিবেগ। অর্থাৎ সময়ের প্রভেদ হবে মাত্র 10^{-8} সেকেণ্ড। অতএব আলোর গতি পৃথিবীর গতির দিকে, আর আড়াআড়ি পথে মেপে, ইথারের সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট করে জানা যাবে। সেই নির্দিষ্ট পরিশুদ্ধ আলোর গতির সাপেক্ষে, পৃথিবীর গতিটিও একেবারে নির্ধারিত হবে।

1887 সালে মাইকেলসন ও তাঁর সহযোগী মোরলে একই পদ্ধতিতে মাইকেলসনের আবিষ্কৃত ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে আলোর গতি মাপার পরীক্ষাটি করলেন। পরীক্ষায় কিন্তু সময়ের কোনো পার্থক্য ধরা পড়লো না—কোনো তফাত, এমন কি $\frac{v^2}{c^2}$ এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো তফাত নেই। দুটি গতি-পথে আলোর যাতায়াতের সময় এক। ইথার নামক মাধ্যম আলোর গতিটিকে ভ্রষ্ট করছে না ; আপেক্ষিক ভাবে পৃথিবীর পরমগতি আর সম্পূর্ণ স্থির ফ্রেম নির্ণয় করা

সম্ভব হলো না। মাইকেলসন-মরলে তাঁদের পরীক্ষাটি নানাভাবে বারবার করলেন। —সব পরীক্ষাতে পাওয়া উত্তর-এক, উত্তরে কোন ফারাক নেই ; আলোর গতি সর্বত্র সর্বদিকে এক। ইথারের কোনো গতি ধরা পড়লো না। অন্যদিকে নিউটনের আপেক্ষিক-তত্ত্বের গণিতটি আলোর গতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ভুল উত্তর পাওয়া যায়।—এক বিরাট সংকটের মাঝখানে বিজ্ঞানকে মাইকেলসন-মরলে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এই সংকটের কথা মাইকেলসন তাঁর সুবিখ্যাত নিবন্ধ The relative motion of the Earth and Luminiferrous Aether এবং লার্মর্ট (J. Larmort) তাঁর প্রবন্ধ On Kinematic and mechanical modes of the activity of the Aether from Aether and matter—এই দুটি পেপারে জানালেন। ইথারের গতি কেন পাওয়া গেল না, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তিনটি সম্ভাব্য সমাধানের আভাস পেলেন। প্রথমটি হলো পৃথিবীর কোনো গতি নেই। এই আইডিয়াটিকে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করা হলো, এই ধারণা কোপার্নিকাস থেকে নিউটনের চিন্তাধারার বিচ্যুতি। দ্বিতীয়টি হলো, পৃথিবীর সঙ্গে জড়াজড়ি করে ইথার এমনভাবে চলে যে তার কোনো আলাদা গতি বোঝা সম্ভব নয়। এই আইডিয়াটিকেও বরখাস্ত করা হলো, কারণ জ্যোতির্বিদ ব্রাডলির পরীক্ষায় এই ধারণার কোনো সুসঙ্গত ব্যাখ্যা বা প্রমাণ পাওয়া গেল না। তৃতীয় সম্ভাবনাটি হলো, ইথার বলে কিছু নেই।⋯ইথার নেই, এটি সেযুগে, সে সময়ে ভাবা অসম্ভব। উনিশ শতকের ফিজিক্সের কাঠামোটাই তবে নড়বড়ে হয়ে যায়। তবু আলোর গতির গোলমেলে ফলাফল যেন জানায় ইথার পরম, নিশ্চল ; সে কোন ক্রিয়াকলাপে নামে না।⋯ইথারের এ গুণ যে আবার নিউটনের স্পেসের গুণ ! অন্যদিকে নিউটনের জগতে স্পেস ও টাইমের যুগপত্তার বোধ থাকে। সমগতির ফ্রেমে সমান স্পেসে সময়ের সমলয়ত্ব বজায় থাকবে। অর্থাৎ দূরত্বের পরিবর্তনে সময়ের পরিবর্তন একই হারে ঘটবে। অথচ মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষায় সময়-স্পেসের সেই যুগপত্তার ধারণা থাকছে না। দূরত্বের আপেক্ষিক তফাত পাওয়া যায় পৃথিবীর গতিপথে আর আড়াআড়ি পথে—এটি নিউটনীয় গণিতে জানা। অথচ এখানে সময়ের তফাত নেই। নিউটনের নিজস্ব ফ্রেমটিও এই পরীক্ষার জগতে খাটে না। তাঁর স্পেসে ইথার হারিয়ে যেতে পারে—তবু তাঁর ফ্রেম দিয়ে আলোর গতির ফলাফলটির ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

এই দিশেহারা চিন্তার জগতে তিনজন গণিতবিদ-বিজ্ঞানী একটি চিন্তার দ্বারে হাজির হলেন। ইংলন্ডের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ফিটজিরাল্ড 1893 সালে বললেন, গতির দিকে সব বস্তু কিছুটা সংকুচিত হবে। এই ঘোষণা হলো উলটো দিক দিয়ে অঙ্কের উত্তরের সাপেক্ষে কারণ খোঁজা। সমান্তর আর আড়াআড়ি পথে আলোর যাওয়া আসার সময় এক হওয়া মানে দুটো পথই এক মাপের— আলো তার সমগতি নিয়ে একই সময় নেবে। এটি সম্ভব হয়, যদি গতির দিকে অর্থাৎ সমান্তর পথটি যদি কিছুটা সংকোচনের ফলে খাটো হয়।

দুবছর পর 1895 সালে এই আইডিয়ার ভিত্তিতে বিখ্যাত ডাচ বিজ্ঞানী হেনরিক লরেন্স একটি গাণিতিক মডেলে সমাধান দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর Electrc-

magnetic Phenomenon in a system moving with velocity less than that of light—পেপারে তিনি ফিটজিরাল্ডের সঙ্কোচন তত্ত্বের একটি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারলেন। তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিতে আছে তিনটি ধারণা : (1) নিউটন ও মেক্সওয়েলের সব সমীকরণ সত্য, (2) সব বস্তু ইলেকট্রনে গড়া এবং (3) বিদ্যুৎ চুম্বক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন কিছু দিয়ে ইথারের সাপেক্ষে কোনো গতি মাপা যাবে না। ···লরেন্সের এই তৃতীয় ধারণাটি এক অর্থে ভয়ংকর, কারণ এটি পরবর্তীকালের নানা ধ্যানধ্যারণার ভিত্তিভূমি। লরেন্স ইলেকট্রনের আবিষ্কারক, 1902 সালে এই কারণে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি জানালেন, বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি যে কোনো পদার্থের উপর এমন প্রভাব আনে যে এটি যখন ইথারের মধ্য দিয়ে যাবে তখন সেই পদার্থটির আকারের সমতা নষ্ট হয়; কারণ ইলেকট্রন জাতীয় কণাদের নিজেদের মধ্যেকার দূরত্বের তফাত ঘটে, বস্তুর আকারের পরিবর্তন ঘটে। এককথায় লরেন্স যেন সব বস্তুর একটা স্থিতিস্থাপকত্ব গুণের কথা বললেন—এই গুণটি ইলেকট্রন ভিত্তিক, আর এটি ঘটে গতি নিয়ে ইথারের মধ্যে যাত্রাকালে।

লরেন্স তাঁর গণিতে সঙ্কোচনের মানটি পেলেন; এটি সেই ফিটজিরাল্ডের ঘোষিত মানটি—: $\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$ যাকে পরে γ (গামা) চিহ্ন দিয়ে জানানো হয়। মেক্সওয়েলের সমীকরণগুলি লরেন্স দুটি ফ্রেমের ছকে ফেললেন; একটি হলো ইথারের তুলনায় একটি রেস্ট ফ্রেম, অন্যটি ইথারের তুলনায় একটি গতিশীল ফ্রেম। এই দুই ফ্রেমের রূপান্তরের রীতিটি লরেন্সের গণিতে পাওয়া গেল। এরা হলো :

$$x' = \gamma(x+vt),\quad y'=y,\quad z'=z \text{ এবং } t'=\gamma\left(t+\frac{Vx}{c^2}\right)$$

লরেন্সের সমীকরণে সময়ের রূপান্তর ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, সময়ের পরিবর্তনের ধারাতে স্পেসের কো-অর্ডিনেটিও উঁকি মারে।

একই নিয়ম পেলেন ফরাসী গণিতবিদ পোআঁকার। তিনিও ইলেকট্রনের গতি প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে প্রকাশ করেন তাঁর The dynamics of Electron নামে পেপারটি। তিনিও পেলেন লরেন্সের ফ্রেম, পেলেন মেক্সওয়েলের সমীকরণের সাহায্যে। এছাড়া তিনি নিউটনের স্পেসের পরমতত্ত্ব ভাঙতে চাইলেন। জানালেন, এ বিশ্ব যদি হঠাৎ বেড়ে যায়, তবে সেই বৃদ্ধির ধারণা আমাদের থাকে না—কারণ সাদৃশ্য বোধ। দূরজগতে বস্তু যেন নিজস্ব আকৃতি হারায়। কোনো দূরত্ব তাই সঠিকভাবে মাপা যায় না। শুধু জানা যাবে একটির সাপেক্ষে অন্য একটির মাপ। অর্থাৎ পোআঁকার বললেন, সব মাপই আপেক্ষিক।

লরেন্স পোআঁকার একটি বিশেষ ফ্রেমে মেক্সওয়েলের সমীকরণগুলিকে সাজালেন। কিন্তু অন্যসব ফ্রেম, যারা গালিলিওর ফ্রেম মেনে চলে, তারা এখানে ধরা দিচ্ছে না। এই সময়ে আরেকবার নিউটনের পরমস্থির ফ্রেমটিকে স্থির করার চেষ্টা হলো, ভাবা হলো ইথারের সাপেক্ষে স্পেস স্থির। তবু আগের মতই, পরীক্ষায় ইথারের গতি পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল সেটি সেই মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য—

আলোর গতি সবদিকে এক। বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে লরেন্স বললেন, আলোর গতি হয়তো উৎসের গতির পরিপ্রেক্ষিতে এক থাকবে। কিন্তু জ্যোতির্বিদরা Double Star বা যমক তারার গবেষণা থেকে জানালেন, আলোর গতি উৎসের গতির উপর নির্ভর করে না। আলোর গতি, যা পাওয়া যায়, তা সব সময়ে সবদিকে এক; অথচ যা মাপা হচ্ছে তা আলোর আপেক্ষিক গতি!

মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষাটি যেমন স্পেস ও সময়ের যুগপত্তা বোধটি ভাঙছে, তেমনি স্থির ফ্রেমটিকেও অনিশ্চিত করে তুলছে বলে ভাঙছে স্পেসের পরমত্ব। মনে হয়, এই মহাবিশ্বে কোথাও কিছু স্থির নয়; মহাবিশ্ব গতিতে ভরা। কোনো এক আদর্শ স্বপ্নের ফ্রেমে হয়তো যুগপত্তা-সমানত্ব-সমলয়ত্বের ধারণা করা যায়। তবু সেকি প্রপঞ্চের মডেলে, কার্যকারণ সম্পর্কের ছকে ধরা পড়বে? অন্যদিকে আলোর প্রচণ্ড গতি যেন জানায় একটি সিস্টেমে সব ঘটনা একসঙ্গে ঘটলেও, ঘটে মনে হলেও, অন্য একটি সিস্টেমে তারা এক সঙ্গে না ঘটতেও পারে। লরেন্সের ফ্রেমে যেভাবে অংক কষা যাক, আলোর গতি আসছে—যে গতি সর্বত্র এক, যে গতি উৎস নিরপেক্ষ। এই সংকটের কালে পোআঁকার বললেন, তিনটি উপপত্তির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে; এক, হয়তো আলোর গতি অপরিবর্তনীয়, এটি ইনভেরিয়েন্ট। দুই, আলোর গতি বোধ হয় অনতিক্রমা, এর চেয়ে বেশী গতি নিয়ে কোন বস্তুর যাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ উৎসের গতি আলোর গতিতে কোন তফাত আনে না। দুই গতিতে যোগ করে পাওয়া যায় সেই একই আলোর গতি। তিন, সনাতন বিজ্ঞানে কাঠামো বদল করা দরকার। সেই কাঠামো তৈরি হবে আলোর গতির সাপেক্ষে।

1904 সালে পোআঁকারের (1854—1912) বয়স পঞ্চাশ, লরেন্সের (1853-1928) একান্ন আর মাইকেলসনের (1852-1931) বাহান্ন। ফিটজিরাল্ড (1851-1901) অবশ্যই আগে মারা গেছেন। আর মরলে (1838-1928) তখন ছেষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। দিশেহারা দ্বিধাজীর্ণ জগতে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বিজ্ঞানীরা সাহস করে বৈপ্লবিক চিন্তার মাধ্যমে নিউটনকে ভাঙতে পারলেন না। তাঁদের মনে হয়, ইথার কিছু নয়; মনে হয়—আলোর গতি জানায় কোন গতি পরম নয়, সব গতি আপেক্ষিক; গতিশূন্যতা বা রেস্টের বোধও আপেক্ষিক। তবু! তবু কিছু 'তবু' থেকে যায়, থাকে ঐতিহ্যের বাঁধন, পুরনোকে ছিঁড়ে ফেলে যাবার দুর্বলতা, প্রৌঢ়ত্বের দুর্বহ ভার।

সময়ের এই ক্রান্তিকালে একটি নতুন দিনের বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হলো। নাম এলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর বয়স, 1904 সালে, মাত্র পঁচিশ!

জোড়াভরতের কাহিনী

1905 সালে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকবাদের পেপারটি প্রকাশ করেন ঃ On Electrodynamics of moving bodies ;—এখানে তিনি কোন গ্রন্থপঞ্জী দেননি অথবা করেননি কোন পূর্বস‍ূরীর তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখ। নিবন্ধটি এমনভাবে তিনি প্রকাশ করলেন, যেন এটি ঊর্বশীর মত আপনাতে আপনি বিকশি, এই বিশ্বলোকে ধরা দিয়েছে। কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিটুকু জানালেন একমাত্র তাঁর বোন মাজার ননদের স্বামী মাইকেল এঞ্জেলো বেসোর কাছে। বেসো কিন্তু পদার্থবিদ নন, তাঁর বিজ্ঞানজ্ঞান যৎসামান্য, এমন কিছু আহামরি গোছের নয়, অতি সাধারণ। তবু আইনস্টাইনের কাছে তাঁর প্রয়োজন ছিল ; ছিল একজন বুদ্ধিমান রসজ্ঞ সজীব শ্রোতা হিসেবে, যাঁর কাছে তিনি তাঁর ভাবনাটি সোচ্চারভাবে বলতে পারতেন, যাঁর কাছে মন উজাড় করে দেখা যায়। অন্যদিকে 1915 সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের শেষ তুলির টান যে পেপারটিতে দিলেন, সেখানেও কোন গ্রন্থ, কোন পদ্ধতি, কোন বিজ্ঞানীর উল্লেখ-স্বীকৃতি নেই। 1916 সালে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ—The foundation of General Theory of Relativity ; এখানে উপক্রমনিকাতে তিনি জানালেন গাউস-রীমান-ক্রিস্টোফেলের হাতে গড়া নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিক পদ্ধতির কথা, মাকের উপপত্তি, লরেন্সের তত্ত্ব, গালিলিও-নিউটনের মহাকর্ষবাদ আর মিনকোওস্কির দেশকালের গণিত,—এ সবই তাঁর তত্ত্বের গঠনে সাহায্য করেছে। আর বললেন, তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি রইল তাঁর বন্ধু গণিতজ্ঞ গ্রোসমানের কাছে, যাঁর সাহায্য ছাড়া তাঁর তত্ত্বের গাণিতিক গঠনের সমাধান সহজ ছিল না। গ্রোসমানের সহযোগিতা যে কতটা ছিল, সে সম্পর্কে তর্কের অবকাশ থাকে। তবু, এটি মেনে নেয়া যায়, যে বেসো ও গ্রোসমান, এ দুজনে আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির কালে আইনস্টাইনের চিন্তা ও মননকে সজীব করে রেখেছিল। আইনস্টাইন এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি যেমন তাঁর হৃদয়ের প্রসারতাটি জানাচ্ছে, তেমনি জানায় ইতিহাসের প্রবহমানতার স্বীকৃতির প্রতি তাঁর তৎকালীন অনীহা।

এই অনীহা অবশ্য তাঁর জীবনের সর্ব অংশে, সর্ব কালে প্রকাশ পায়নি, এটি বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। 1921 সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের ধারার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি জানালেন। সুস্পষ্টভাবে বললেন, "একথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আপেক্ষিকতাবাদ গঠনে কোন সুদূর পরিকল্পনা নেই, নেই ফাটকাবাজির ঝোঁক। যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, দেখা গিয়েছে পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের বন্ধনে এদের বাঁধতে গিয়ে এটির সৃষ্টি। এখানে কোনো বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ নেই ; শুধু থাকে শতাব্দীর চিন্তাধারার অনুসৃতির সহজ স্বাভাবিকতা। স্পেসটাইম, মোশন, দেশকাল ও গতির প্রচলিত ধারণার বিলুপ্তির কারণটি মৌলিক ; এই তত্ত্ব অবাধ সার্বভৌম নয়, বরং প্রচলিত শর্তের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত।"

1940-41 সালে জার্মান বিজ্ঞানীদল মিউনিক কনফারেন্সে আধুনিক বিজ্ঞানের গঠন নিয়ে যখন পরপর দুবার আলোচনা করলেন, তাঁরাও দেখলেন আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যকে ভিত্তি করে, লরেন্স-পোআঁকারের পথ ধরে। আইস্টাইন এঁদের সার্থক উত্তরসূরী। এই তত্ত্ব স্বয়ম্ভূ নয়, এটি কোনো দর্শন চিন্তার বাইপ্রোডাক্ট নয়। এটি বিজ্ঞানের প্রবহমানতার একটি পরিচ্ছন্ন নিদর্শন।

এই একই ঘোষণা বিজ্ঞানীরা করলেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের অর্ধশতাব্দী পূর্তির কালে প্রকাশিত The Principle of Relativity বইটিতে। পরবর্তীকালে সেই প্রবহমান বিজ্ঞানের ধারাটি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন জর্জ গেমো. উলফগাঙ পাউলি, মাক্সবোর্ণ, কিলমিস্টার, আহরোনি (AHARONI) স্টিফন হকিং এবং আরো অনেকে। আইনস্টাইনের চিন্তার মূলসূত্রটি এঁদের কাছ থেকে জানা গেল। জানা গেল তাঁর তত্ত্বের সৃষ্টির কালে কি ভাবে তিনি নানা বিকল্পের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট উপকরণটি বেছে নিতে পারলেন, কি করে নির্দিষ্ট করলেন লুকিয়ে থাকা সক্রিয় কুশীলবদের। তাঁর চিন্তার পথের গলিঘুঁজির তত্ত্ব-তালাশের নানা হদিশ এঁরাই জানালেন। এঁদের সেই জানানোর আলোতে ইতিহাসের প্রবাহের উজান বেয়ে জানতে পারি আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির প্রথম বর্ষার ঢলনামা জলোচ্ছ্বাসটিকে। তবু প্রশ্ন জাগে, আইনস্টাইন কি ইতিহাসের এই ধারাটি সম্পূর্ণ করে জানতেন? জানতেন লরেন্স-পোআঁকারের শেষ কাজের ইতিবৃত্ত? সে সম্ভাবনা কি পেটেন্ট অফিসের কেরানির ছিল? থাকে? অন্যদিকে তাঁর পেপারটিতে যেভাবে তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক ছকটি দিলেন, সেটি নিউটনীয় রীতিসম্মত। লরেন্স-পোআঁকারের হাতে গড়া মেক্সওয়েলের তত্ত্ব ও গণিত নির্ভর পথে নয়। যেভাবে, যে যুক্তি শৃংখলার পথ ধরে, তিনি তাঁর তত্ত্বটি জানালেন, সেটি যেন গেডাঙ্কেন বা চিন্তা-সমীক্ষার একটি সুন্দর উদাহরণ, যুক্তির পথ বেয়ে তত্ত্বটি গড়ে উঠছে, তথ্যের প্রয়োজন যেন হচ্ছে না। যেন আইনস্টাইন ধীরে ধীরে একেকটি স্বরশ্রুতি নিয়ে একটি রাগের কাঠামোটি প্রকাশ করছেন, সার্গম-তানের প্রয়োজন শুধু যেন অলংকরণের জন্য।... 1972 সালে হোল্টন (Holton) ইতিহাসের ধারায় যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রাপ্তি—সেই ধারণায় আবার সংশয় জাগালেন!

মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষাটির কথা আইনস্টাইন জানতেন কিনা সেখানেও হোল্টনের সংশয়। মনে হয় এই সংশয়ে কিছুটা অতিরঞ্জনা বা বাড়াবাড়ি আছে। 1887 সালে মাইকেলসন-মরলে ইথার বায়ুর পরীক্ষা নিয়ে যে সমস্যাটি তুলেছিলেন, সেটি যে কোন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে 1900 সালে নিশ্চিতভাবে জানা। এবং লরেন্স 1895 সালে সংকোচনের যে তত্ত্বটি জানালেন সেটিও এমন কিছু অবজ্ঞাত তত্ত্ব নয়। বস্তুত 1895 সাল থেকে 1900 সাল পর্যন্ত লরেন্স পোআঁকারের মেক্সওয়েলীয় সমীকরণভিত্তিক সংকোচনের তত্ত্ব ও গণিত যে কোন উৎসাহী পদার্থবিজ্ঞানের সক্রিয় ছাত্র সে কালে, সে যুগে জানতেন। তাঁদের পরবর্তী কাজগুলি অজানা থাকতে পারে, সেটি সম্ভব। মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষার ফলটি

না জেনে, লরেন্সের সঙ্কোচন তত্ত্ব বা রূপান্তরী ফ্রেমের হদিশ না পেয়ে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদে পেঁাছে যাওয়া একটি দুরূহ কল্পনা। আপেক্ষিকতাবাদের বিশ্বরূপ দর্শনের যে ছবি আইনস্টাইনের বোধি চেতনা ও উপলব্ধিতে ধরা পড়ে সেটি জানা যায় উদ্যোগ পর্বে, যা মাইকেলসন-মরলে, লরেন্স-পোআঁকারের বিরাট প্রচেষ্টার পরই দেখা দেয়। এই বিরাট পর্বের সবকিছু জানা-চেনা না থাকলেও, কুরুশিবিরে বিশ্বরূপ প্রকাশ পেতে পারে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পক্ষে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারে হাজির হওয়া অসম্ভব নয়।

1905 সালে Annalen dar Physik-এর সপ্তদশ ভল্যুমের 891-921 পৃষ্ঠার একটি একত্রিশ পাতার রচনায় তিনি গতিশীল বস্তুর তড়িৎগতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সূচনা করলেন। অতি সংক্ষেপে আইনস্টাইন তাঁর চিন্তা পদ্ধতির বর্ণনা দিলেন।

মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ আলোর গতি নিয়ে চলে—সে চলে ইথার নামক মাধ্যমে—যে নিউটনের স্পেসের মত পরম নয়। এখানে কিন্তু টাইম বা সময়কে পরম ভাবা হচ্ছে। এই যে আলোর একটা প্রচণ্ড ভেলসিটি, যেখানে স্পেস পরম নয়, শুধু টাইম পরম, সেখানে এই ভেলসিটিটি কি ধারণা জানাবে? কার সাপেক্ষে মাপা হবে এই ভেলসিটি? নিউটন পরম টাইম ও স্পেস মানতেন। গালিলিও ও রিলেশনিস্ট স্কুলের বিজ্ঞানীরা মানতেন শুধু টাইম পরম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা পরম স্পেসে সংশয় জানান। পরম স্পেসের সমস্যা এড়িয়ে মেক্সওয়েল ইথার নামক মাধ্যমের কল্পনা করলেন। আর জানা গেল, আলোর ভেলসিটি মাপা হবে ইথার-ফ্রেমের সাপেক্ষে! এই ইথার কি পরম? সে সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। অন্যদিকে মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষায় ইথারের সাপেক্ষে পৃথিবীর গতি মাপা যায় না, ধরা পড়ে সবদিকে সব সময়ে আলোর গতি অপরিবর্তনীয়।

আইনস্টাইন দেখলেন, স্থির ফ্রেমের চিন্তায় গড়া গতিশীল ইনারশিয়া ফ্রেম, যাদের চিন্তা নিউটন স্কুলের, তাদের আচার ব্যবহার, গুণাগুণ এক; তাদের যে পার্থক্য দেখা যায় সেটি ব্যবহারিক—এখানে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এই সব ফ্রেম যা ক্লাসিকেল আপেক্ষিকতার রীতিতে গড়া, যেখানে কাজ করে গালিলিওর রূপান্তরী ছক, সেখানে একটি মূল সত্য যেন ধরা পড়ে,—যে কোনো ভেলসিটি সমগতিকে, যে কোনো ইনারশিয়া ফ্রেমে একইভাবে বোঝা যেতে পারে। এটি হয়তো একটি নিয়ম, হয়তো একটি সুসম্বন্ধ-সুসম্পর্কের রীতি।

অন্যদিকে মাইকেলসনস-মরলের পরীক্ষায় জানা যায়, আলোর গতিকে যে কোন ফ্রেমে মাপা হোক না কেন, সেই গতি অপরিবর্তনীয়-ইনভেরিয়েণ্ট। অথচ মাপা হচ্ছে আলোর আপেক্ষিক গতি, মাপা হচ্ছে গতিশীল ফ্রেমের গতির সাপেক্ষে। অন্যভাবে, যমক তারার জগতে, দুটি তারার আবর্তন, অবস্থান বা গতি, Rotation, Position, Movement কোন মতেই আলোর গতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারছে না। আলোর চেয়ে বেশী কোনো গতি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একমাত্র সেই গতি যাকে পোআঁকার বলেছেন আলোর অনতিক্রম্য অপরিবর্তনীয় গতি। এই যে প্রাপ্তি, সে বুঝি জানায়,

আলোর গতির নিত্যতার নিয়ম যেন আপেক্ষিকতাবাদের জগতে একটি শাশ্বত সত্য··· নানা ফ্রেমের সাপেক্ষে প্রাকৃতিক নানা সম্বন্ধের নিত্যতা যেমন সত্য, তেমনি যে কোনো ফ্রেমে আলোর আপেক্ষিক গতির অপরিবর্তনীয়তা যেন নিত্য। এখানে যে অসঙ্গতি চিন্তাসূত্রে ধরা পড়ে, তাকে বুঝতে গিয়ে আইনস্টাইনের কাছে এক নতুন সত্য ধরা পড়ে।

নিউটনের স্পেস ছিল, সর্বত্র সবদিকে সমান—হোমোজিনাস ও আইসোট্রোপিক। আলোর আপেক্ষিক গতির যেন সেই গুণ। যে কোন ফ্রেমে, যে কোন দিকে এই গতি মাপা হোক, এটি এক। এই গতি উৎস নিরপেক্ষ, ফ্রেম বা দর্শক নিরপেক্ষ। যে মাপে, সে মাপে আলোর আপেক্ষিক গতি—সে গতি দর্শকের কাছে এক। কোনো ফ্রেম, কোনো দর্শক আলোর কাছে বিশেষ নয়, বিশিষ্ট নয়; সব দর্শক, সব ফ্রেম আলোর জগতে সমান। অর্থাৎ স্পেসের সমানত্ব বোধ ধরা দেয়, আলোর সাপেক্ষে নানা ফ্রেমে। সব ফ্রেম, সব দর্শক আলোর কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী; এই আলো ছুটে চলে সমগতিতে, সময়ের সঙ্গে স্পেসে। অতএব স্থির ফ্রেমে সমলয়ী সময়কে বোঝাবার জন্য যেমন কামান আর ঘড়িকে আনা হয়েছিল, তেমনি এদের বাদ দিয়ে আলোর গতি দিয়ে যে কোন রেফারেন্স ফ্রেমে সময়কে স্থির করা যাবে। এখানে অবশ্য একটি তফাত থাকে,—নিউটনের ঘড়ি আর কামান ছিল স্থির। অন্যদিকে স্থির ফ্রেম বা অস্থির ফ্রেম, যে ফ্রেমই ধরা হোক না কেন, আলো গতিশীল এবং তার গতিটিও এক। কাজেই এইসব উৎস ঘড়ির একদিকে স্থির হয়ে টিকটিক করে চলার কল্পনাটি আর আসন পেতে বসতে পারে না; যান্ত্রিক ঘড়ির বদলে, আলোর ঘড়ি ব্যবহার করা যাবে। এই ঘড়ি পাল্টানোর অসুবিধে নেই; ফ্রেমদের সময়ের উনিশ-বিশ ঘটবে না। সময় নির্দিষ্ট হচ্ছে আলোর গতি ধরে, যে আলোর গুণ স্পেসের মত।

একটি ঘটনা, যা একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্ট সময়ে ঘটছে সেটি একটি ফ্রেমে যেমন দেখা হবে, অন্য একটি ফ্রেমে সেই ঘটনা যখন রূপান্তরিত হবে, তখন সেই ক্রিয়া-কলাপে মাস্টার অফ সেরিমনি অথবা অধিকারীর রূপে রাজসিক মহিমায় আলোর গতি হাজির হবে। তার উপস্থিতিটি নকিবের মত সোচ্চারে জানাবে স্পেস কোঅর্ডিনেট এবং টাইম কো-অর্ডিনেট। অন্যদিকে ইথার নিয়ে মাথাব্যাথার কোন কারণ নেই; কারণ এই জগতে জানা যায়, বোঝা যায়, শুধু আপেক্ষিক গতি। জাগতিক কোন পরীক্ষায় কোন পরম গতিকে মাপা যায় না, কারণ সব ইনারশিয়াল ফ্রেম গতিশীল; গালিলিও স্কুলের এই চিন্তা বাস্তব-সম্মত। তাছাড়া ইথারের যে গুণ ধরা পড়ে, সে যেন স্পেসের গুণ। যে ইথার স্পেসকে ভরেছিল, সে স্পেসেই মিলিয়ে যাবে; তার কোনো পৃথক সত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না; যায় না!

একটি ঢিল পুকুরে ফেললে ঢেউ জাগে, সেই ঢেউ ক্রমশঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরটিকে ভরিয়ে তোলে। একটি আলোর ঢিল স্পেসে পড়লে সেও ছড়িয়ে পড়ে স্পেসে দুর্দান্ত 3×10^8 মিটার গতিতে। আলোও ঢাকে স্পেসকে, সেও যেন স্পেসকে জাগিয়ে তোলে। লরেন্স পোআঁকারের সময়ের কো-অর্ডিনেটে স্পেস কো-অর্ডিনেট দেখা দেয়। এই দেখা

স্বাভাবিক, কারণ আলোর ঘড়ি দিয়ে সময় মেলানো ফ্রেমে স্পেসকে ঢেকে আলো ছুটে চলে !

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে x-y কো-অর্ডিনেটের সাপেক্ষে জানা যায় $l^2=x^2+y^2$, এটি দ্বিমাত্রিক জগতের গণিত। তিনমাত্রিক জগতে জানা যাবে $l^2=x^2+y^2+z^2$। অন্যদিকে একটি আলোর ঢিল বা ঝলকানি দ্রুত একটি বিরাট স্ফিয়ারে বা গোলকে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্ফিয়ারটিকে ত্রিমাত্রিক দেশের বা স্পেসের সাপেক্ষে যে সমীকরণে জানাতে পারি সেটি হলো $c^2t^2=x^2+y^2+z^2$। একটি ফ্রেমে, আলোয় গড়ে ওঠা যে স্ফিয়ারটিকে দেখি, একই রূপানুভূতি দেখা দেবে ভিন্ন একটি ফ্রেমে। শুধু যদি ধরে নেয়া যায় দুটি ফ্রেমের অরিজিন বা কেন্দ্রবিন্দু এক এবং যখন আলোর ঝলক দেখা দেয় সেই মুহূর্তটি দুটি ফ্রেমে এক, অর্থাৎ $t=t_1=0$, তবে নতুন ফ্রেমে আলোর স্ফিয়ারটিকে এক নতুন সমীকরণে লেখা যাবে, যেখানে $x_1{}^2+y_1{}^2+z^2{}_1=c^2t_1{}^2$। পুকুরে ঢিল ফেললে সেই ঢিলে গড়ে ওঠা ঢেউকে বিভিন্ন অবস্থানে, দূরত্বে বা সময়ে বিভিন্ন দর্শক যা দেখবে, সেটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ঘটনা। একই ঘটনা, বিভিন্ন অবস্থানে বা সময়ের তফাতে ভিন্ন রূপ পাচ্ছে। তবু নানা রূপেগড়া নানা ভঙ্গিমা থেকে সেই নির্দিষ্ট ঘটনাটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। গণিতের ছকে বলা হয় $x^2+y^2+z^2-c^2t^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2-c^2t_1^2=x_2^2+y_2^2+z_2^2-c^2t_2^2$ ইত্যাদি অর্থাৎ নানা ফ্রেমে একই ঘটনাকে নানাভাবে দেখলেও তাদের গড়া জগতে যে স্পেসটিকে আমরা দেখছি, সেটি একই ঘটনার স্পেস। $x^2+y^2+z^2$ এবং c^2t^2 এর তফাতে, ইন্টারভেলে, সেই ঘটনাটি অপরিবর্তনীয়রূপে সব ফ্রেমে উঁকি মারে। স্পেস টাইমে এই ইভেন্ট সুনির্দিষ্ট। এখানে জানা যায় $s^2=x^2+y^2+z^2-c^2t^2$ এই সমীকরণটি ইনভেরিয়েন্ট বা অপরিবর্তনীয়—যে কোনো ফ্রেমে এটি সেই একই ঘটনাকে জানাবে। আর জানা যায়, একটি ইভেন্টের S এর চারটি মাত্রা ; স্পেসের জন্য থাকে তিনমাত্রা : x, y এবং z আর সময়ের জন্য একটি মাত্রা, সেটি $(-ct)$ ॥

এই সত্যটি আইনস্টাইনের মনে সহসা উদয় হয়। পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে বিচার করে পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে পাওয়া যায় এই তত্ত্ব। তিনি দেখলেন, 1) আপেক্ষিকতাবাদের নিয়মে যে কোনো গতির সাপেক্ষে জানা যায় আলোর গতি। এই গতিটিও আপেক্ষিক, অথচ এটি সব ফ্রেমে একটি রাশিকেই জানায়। কাজেই কোন্ ফ্রেম যে স্থির,কোন্‌টি যে গতিশীল, আলোর জগতে তা বোঝা যায় না। যা জানা যায় তা আপেক্ষিক গতি—রিলেটিভ মোশন। এবং 2) আলোর গতি এই জগতে নিত্য। এটি যেন একটি ধ্রুব-রাশি, যা উৎস—অথবা দর্শকের অবস্থান, আবর্তন বা গতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না। আপেক্ষিকতার জগতে এটি একটি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ সমগতি।

দুটি আইডিয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই। কারণ আলোর গতি দিয়ে স্পেস ও টাইম, দেশ এবং কালকে এক সূত্রে বাঁধা হয়। স্পেস ও টাইমে গড়া ঘটনাটি শুধু দর্শক জানতে পারে। আলোর দুরন্ত গতি স্পেস ও টাইমের পরিসীমা টেনে দেয়।

স্পেস ও টাইমের কোনো ভিন্ন পরম বা মর্যাদাবান উপস্থিতি নেই। যা থাকে সেটি এদের শ্যামদেশীয় যমজ, জোড়া-ভরতের রূপ। দুই ভরতের সংযোগী মাংসপেশীটি হলো আলো।

এই আইডিয়াটি যেদিন তাঁর মনে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়, শোনা যায় তার ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে তাঁর সুবিখ্যাত থিসিস On Electrodynamics of moving bodies-টি সমাপ্ত করেন। আলোয় গড়া নতুন ফ্রেমটিতে পেলেন লরেন্সের ফ্রেম। আর সেই ফ্রেমে v যখন অতি সামান্য, ফ্রেমের গতিটি অতি ছোট, ক্ষুদ্র, সেখানে ধরা পড়ে গালিলিও—নিউটনের ফ্রেম। এরপর বাকি থাকে নতুন ফ্রেমটির সাপেক্ষে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের রূপটি সম্পূর্ণ করা। সেটিও তিনি ঐ পাঁচ সপ্তাহের কাজেই করলেন। সম্পূর্ণ তত্ত্বটি প্রকাশ হলো পোআঁকারের চিন্তার এক বছরের মধ্যে, 1905 সালে।

সেই বছরেই সূচনা হলো এক নতুন আপেক্ষিকতাবাদের, পোআঁকারে চিন্তায় ভেসে ওঠা আলোর গতি-ভিত্তিক গতিবিজ্ঞানের। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের!

ইথার-পরীক্ষার আলোচনা করে আইনস্টাইন দুটি সিদ্ধান্তের দ্বারে এলেন। এ'দের তিনি জানালেন পসট্যুলেট বা স্বীকার্য বলে। ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তিভূমিতে থাকে স্বতঃ সিদ্ধান্ত ও স্বীকার্য। স্বতঃ সিদ্ধান্ত হলো তারাই যাদের প্রমাণ দেয়া যায় না। প্রমাণ জানাতে গেলে প্রমাণের তথ্যটিকে ঘুরিয়ে বলতে হয়। স্বতঃ সিদ্ধান্ত প্রায় সব পরিসরে নিত্য বা ধ্রুব হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে স্বীকার্যটিও এক জাতের সিদ্ধান্ত; এটি নিত্য-সত্য শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিসরে বা পরিসীমায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, প্রাণী মাত্রেই ক্ষিধের বোধ থাকে। এটি একটি স্বতঃ সিদ্ধান্ত! ক্ষিধে পেলে সব প্রাণী খাবার চেষ্টা করে, এটিও একটি স্বতঃ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই খাদ্য সকলের কাছে এক নয়। খাদ্যের আকর্ষণ বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে ভিন্ন। সাধারণ-ভাবে যা একের কাছে ডেলিকেসি, অন্যের কাছে তা' পরিত্যাজ্য। এই সত্য একটি নির্দিষ্ট পরিসীমাতে কাজ করে—এই সত্য স্বীকার্য।

আইনস্টাইন স্বীকার্যের উল্লেখ করলেন—কারণ তিনি যে জগতের কথা জানালেন, সেটি আলো ভিত্তিক। তাঁর স্বীকার্য দুটি হলো, ইথারের খোঁজ পাওয়া যাবে না, এবং দ্বিতীয়টি হলো, যে কোন দর্শকের কাছে আলোর গতি একটি ধ্রুবমান জানাবে! আইনস্টাইনের চিন্তাসূত্রটি আলোচনা করলে, এই দুটি সত্যে কোন সন্দেহ থাকে না। অন্য দিকে এই দুই স্বীকার্যের ঘোষণা শুধু যে বৈপ্লবিক তা নয়, আইনস্টাইন মনে করেন যে দুটি সত্য প্রকৃতির সাম্রাজ্যে দুটি সুনির্দিষ্ট মৌলিক নিয়ম। এই স্বীকার্য দুটি সেকালীন চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে যেন থাকে। এরা ইণ্টারেষ্টিং হতে পারে, তবু এই দুটি স্বীকার্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তত্ত্বগুলি যদি খাঁটি, প্রমাণিত না হয়, তবে স্বীকার্য দুটিকে বিজ্ঞান নাকচ করবে। আইনস্টাইনের মনে অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুটি স্বীকার্যকে মেনে নিয়ে গণিতের ছকে কয়েকটি সমীকরণ তিনি জানালেন। অসম্ভব, অবাস্তব ঘোষণা তারা করলো। আবার তারা একদিন প্রমাণিত হলো। অতএব আইনস্টাইনের ঘোষিত স্বীকার্য দুটি সত্য।

$x^2+y^2+z^2=c^2t^2$ ও $x_1{}^2+y_1{}^2+z_1{}^2=c^2t_1{}^2$ এই দুটি সমীকরণে যদি

ধরা হয় দুটি ফ্রেমের কেন্দ্রবিন্দু এক এবং যখন আলোর ঝলকানি শুরু সেই মুহূর্তে যখন $t=t=0$ এই দুটি সমীকরণ যে দুটি কো-অর্ডিনেটের অনুবাদে সূচিত হতে পারবে সেটি জানায় লরেন্সের ট্রানসফরমেশন বা রূপান্তরের রীতি। এখানে $x^1= \gamma(x-vt)$, $y^1=y$, $z^1=z$ এবং $t^1=\gamma\left(t-\frac{vx}{c^2}\right)$ এবং উলটোভাবে দেখলে $x=$

$\gamma(x^1+vt)$, $y=y^1$, $z=z^1$ এবং $t=\gamma\left(t^1+\frac{vx}{c^2}\right)$ ॥

এই রূপান্তর ফ্রেমটি লরেন্স পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন পোয়াঁকার। তবে এঁদের গাণিতিক ভিত্তির মূলে থাকে কৃত্রিমতা—দুজনেই ইথারকে ধরে নিয়ে, মেনে নিয়ে রূপান্তরের এই ধারা পেয়েছিলেন, এই ছক থেকে লরেন্স দৈর্ঘ্যের সংকোচন তত্ত্বটি পেয়েছিলেন—তবে দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে তাঁর তত্ত্ব কেবলমাত্র বিদ্যুৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আইনস্টাইনের গণিতের ছকে সর্বজনীনতা থাকে; এটি দুটি স্বীকার্যকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয় বলে সব মেটারের জগতে খাটে। তাঁর গণিতের বিশেষত্ব হলো গতিবিজ্ঞান বা কাইনামেটিক্স এর একটি বিশেষ পদ্ধতি গঠন, যা স্পেসে আলোর গতিবেগের অপরিবর্তনীয়তার উপর নির্ভরশীল। গতিশীল রেফারেন্স ফ্রেমের অনুবাদে অথবা রূপান্তরে পাওয়া সমীকরণ-গুলি আইনস্টাইন স্পেস টাইম বা দেশকালের অনুপুঙ্খ ব্যবহারটি জেনে লিখলেন। তাঁর আইডিয়ার মূল সূত্রটি হলো, আলোর নির্দেশনা দিয়ে স্পেস টাইমের পরিমাণটিকে মাপা। এই রীতির সুকু সমালোচনা তাঁর জীবনকালেই হয়েছে। তবু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল রীতিটি এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁর বিচারের মূল ভিত্তিতে আইনস্টাইন দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ আর সময়ের একটি সামান্য পলকের সমন্বয়ের কথা ভাবলেন। এদের তিনি বললেন, ইভেণ্ট বা ঘটনা। পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যগুলির যে ফলাফল জানায় তাদের যদি কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে বিচার করা যায়, অথবা প্রাকৃতিক বা ফিজিকেল ঘটনার সাপেক্ষে জানার চেষ্টা করা হয়, তবে এরা একটি নির্দিষ্টতা জানায়:—সব ঘটনা জানা যায় স্পেস ও টাইমের ম্যাপে। নির্দিষ্ট স্পেস রেখা ও টাইম রেখায় ছেদবিন্দু জানাবে ঘটনা—যেমন অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের ছেদ বিন্দু জানায় পৃথিবীর বুকে কোন স্থানের অবস্থান। মহাজগতে কোন ঘটনা শুধু স্পেস নিয়ে থাকতে পারে না—ঘটনাটি সময়কে মেনে নিয়ে গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই আইনস্টাইনের ইভেণ্টের ছকে এই কারণে ধরা পড়ে স্পেস-টাইমের চতুর্মাত্রার নকশা।

দেশ কালের সমন্বয়ের বোধটি প্রাকৃতিক ফেনোমেনা বা প্রপঞ্চের মডেলে আইনস্টাইন সরলরেখার হিসাবে জানালেন। এর কারণ ছিল। গালিলিওর ফ্রেমে একটি গতিশীল বস্তুর কার্যকলাপ মাপা হয় একটি স্থির ফ্রেমের তুলনাতে, সাপেক্ষে। অন্যদিকে যদি বিশ্বের সব ফ্রেম গতিশীল হয়, স্থির বলে কোনকিছু না থাকে, তবে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে বস্তুটিকে যে ভাবে বিচার করা হবে, ঠিক সেই ভাবে অন্য আরেকটি ফ্রেমেও সেই বিচার খাটবে—যদি সেই নতুন ফ্রেমটি পুরনো ফ্রেমের সাপেক্ষে সমগতিতে

আবর্তিত হয়। যেমন একটি জিনিসকে দেখা—এই দেখাটি অন্যরূপ পেতে পারে যদি তাকে দেখা যায় আয়নাতে অথবা সোজা পায়ে না দাঁড়িয়ে দেখা হয় শীর্ষাসন করে। দর্শকদের দেখার ফ্রেমে আবর্তন ঘটালে যে বস্তুটিকে দেখা হচ্ছে সেও যেন আবর্তিত হয়। আয়নাতে ডান হাত দেখা দেয় বাঁহাতে—শীর্ষাসনে চোখের সামনে মাথার বদলে থাকে পা। অথচ এই রূপান্তরী দৃশ্যেও যাকে দেখা হচ্ছে, তার বিচারটি এনালিসিসটি একই ধারণা জাগাবে।—এই চিন্তার পথে সনাতন বিজ্ঞান থেকে আইনস্টাইন যেটুকু সরে এলেন, তা হলো দর্শক নিরপেক্ষ, মহাশূন্যে আলোর সংগতি বা ভেলসিটির ঘোষণা। এরই ফলে এক নতুন যুগপত্তা বোধের ধারণা জাগে, যা লরেন্সের কো-অর্ডিনেটের ভিতকে অনুসরণ করে গড়ে তোলা যায়। বিশ্বজগত যেখানে আলোর গতিটি একমাত্র অপরিবর্তনীয় সেখানে সব গতিকে মাপা যাবে আলোর গতির সাপেক্ষে। মাপ হবে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক, কারণ দুটি ফ্রেমই গতিশীল। দুটি স্থির বস্তুর মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব থাকে যে দূরত্ব অবস্থান ও আবর্তন অথবা পজিশন ও ওরিয়েণ্টেশনের উপর নির্ভর করছে না এবং এটি সময় নির্ভর নয় ঃ আবার দুটি নির্দিষ্ট অবস্থানে সময় মাপার জন্য ঘড়ির কাঁটা স্থির থাকলেও, সেখানে সময়ের পরিবর্তন থাকে, যে পরিবর্তন সময় এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। নিউটনের জগতে দুটি পরম—স্পেস ও টাইম,—এরা যখন একযোগে একটি ইভেণ্টকে জানাবে—তখন সেই ইভেণ্ট জানা যায় সরলরেখার পথে এখানে নির্দিষ্ট হয় অবস্থানের তফাত বা দূরত্ব আর সময়ের তফাত বা মুহূর্ত এবং তাদের দিক! নিউটনের জগতে একটি নির্দিষ্ট স্পেসে সময় অনির্দিষ্ট থাকতে পারে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্পেস ও অনির্দিষ্ট। একই স্পেসে বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা ঘটতে পারে—অন্যদিকে একই স্পেসে বিভিন্ন ঘটনা এক সময়ে ঘটে। আবার আলোর গতিসূত্র দিয়ে যেখানে স্পেস ও টাইমকে গাঁথা হচ্ছে, সেখানে দূরের নক্ষত্রের কোন ঘটনা এই পৃথিবীতে এখনই দেখা গেলেও, সেখানে সময়ের পার্থক্য থাকে—যে ঘটনা দূর নক্ষত্রে আগে, অতীতে ঘটেছে, তার খোঁজ বর্তমানে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। একই ঘটনা দুটি অবস্থানে দুটি সময়কে জানায়। ঘটনা স্থিরকৃত হবে শুধুমাত্র স্পেসটাইমের নির্দেশে, তাদের ছেদবিন্দুতে।

ইনারশিয়া ফ্রেমে আপেক্ষিকতা এনে, দুটি দর্শকের দুটি ভিন্ন অবস্থান ধরে, তাদের মধ্যকার দূরত্বটি বিশাল এই চিন্তা করে গণিতের ভিত্তিতে যে কোন গতির এবং আলোর গতি c এই দুটি গতির সাপেক্ষে আইনস্টাইন একটি ফেক্টর পেলেন, সেটি লরেন্সের ফেক্টর গামা (γ)। যখন আলোর গতির তুলনায় কোন বস্তুর গতি v খুব ছোট তখন, γ (যা জানায় $\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$) জানায় তার মান—এক। তখন লরেন্সের ফ্রেমের পরিবর্তে পাওয়া যায় গালিলিওর ফ্রেম। এক অর্থে আইনস্টাইন ও নিউটনের জগতের তফাত ঐ গামা ফেক্টার ; গতি কম হলে গামা সেখানে তুচ্ছ, সেখানে থাকে নিউটনের গতিজগৎ।

অন্যদিকে লরেন্সের সঙ্কোচন তত্ত্ব আইনস্টাইনের গণিতে ধরা পড়ে। এবং জানা যায়, আরো নতুন সংবাদ। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ শুধু যে দৈর্ঘ্যের সংকোচনটি

জানায় তা নয়, জানায় আরো কিছু ঘটনা ; বস্তুর ভর বা মাস সেই একই হারে বেড়ে যায়, সময় কমে যায় সেই একই হারে। সব কিছু ঘটে একটি ফেক্টারের হিসেবে। সেটি সময় গতি সম্পর্ক চিহ্নিত আলোর গতি সূত্রে গড়া গামা। বিশ্বজগতে এই গামা মহাবলশালী—সে ইচ্ছা করলে সময়কে ছোট করতে পারে, পারে দৈর্ঘ্যের সংকোচনা ঘটাতে, ভর বাড়িয়ে তুলতে। আইনস্টাইনের তত্ত্বে এদের জানানো হলো তিনটি সমীকরণেঃ

$$L' = \frac{Lo}{\gamma}, \ m' = mo\gamma \text{ এবং } t' = \frac{to}{\gamma}$$

এরপর আইনস্টাইন বললেন আলোর অনতিক্রম্য গতির কথা। তাঁর ঐ গামার সাহায্যে তিনি দেখালেন যে আপেক্ষিকতাবাদের গণিতে 0·9c + 0·9c কখনই গালিলিওর রীতিতে 1·8c নয়, এটি 0·995c। অর্থাৎ আলোর গতিই সর্বোচ্চ। কোন কিছুই আলোর গতি ছাড়িয়ে যেতে পারে না। অনেক গতির যোগফলে পাওয়া যেতে পারে 0·9 c অথবা শুধু c। আলো অনন্য, অনতিক্রম্য তার গতি। তবে তিনি এটাও বললেন কোনো জড় বস্তু আলোর গতির বাধা পার হতে পারে না—এটিই তার পস্টুলেটের স্বীকার্যের পরিসীমা-পরিসর! তাঁর এই কথার বিস্তৃতি ঘটিয়ে আলোর গতি পার হতে পারে যে কণা, কোনো মেটার বা জড় বস্তুর সংজ্ঞায় যাকে জানা যায় না, যার গতি আলোর গতির চেয়ে ঢের বেশী—সেই স্বপ্নের কণা টেকিয়নের খোঁজ করা হয়। টেকিয়নকে এখনো পাওয়া যায়নি!

এত হইচই, ভাঙচুর করেও আইনস্টাইন সুস্থির হন না। তার মোক্ষম অস্ত্রটি এরপর তিনি হানলেন। মাক্স প্লাংকের কোয়ান্টা তত্ত্ব প্রয়োগ করে সেই 1905 সালে তিনি ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বোঝাতে পারলেন। কোনো কোনো বস্তুতে আলো পড়লে কেন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তার সুবোধ্য কারণটি আলোকে কণা হিসেবে ধরে তিনি জানালেন। অথচ আলো বিকিরণ, তার শক্তি আছে। আলো মেক্সওয়েলীর বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ—তার গতি আছে। অন্যদিকে আলো যখন কণা, তখন থাকবে তার অবস্থিতি, তার ভর। এই বিবিধ ধারণাগুলিকে একসূত্রে গাঁথলেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন যে কোন বস্তুর স্থিরভর (স্থিরভর কেননা বস্তু গতি নিয়ে চললে তার ভরের বৃদ্ধি ঘটে—এটি আইনস্টাইনের তত্ত্ব।) যদি হয় m তবে সেই স্থিরভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে, রূপান্তর হবে আলোর গতির সাপেক্ষে। অর্থাৎ শক্তি বা এনার্জি বা E হলো mc^2 অথবা $E = mc^2$॥ শক্তি ভরের রূপান্তর আলোর গতির সাপেক্ষে হবে। জাগতিক যে কোনো মেটার যার ভর বা মাস আছে তার শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। অন্যদিকে শক্তিও মেটার তৈরি করতে পারবে। এক আশ্চর্য বিস্ময়ের তত্ত্ব আইনস্টাইন জানালেন। এই তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জানা যায় কোন বস্তু যদি গতি নিয়ে চলে তবে তার গতিকালীন মাস m যেহেতু দাঁড়ায় $mo\gamma$ ছকে, গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ সমীকরণটি জানাবে $E = mo\gamma c^2$। এই এজামসনটির পথে জানা যায় কেন কোনো জড়কণা আলোর গতি ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কেননা তখন γ (গামার) মান শূন্য এবং ভরের বৃদ্ধি হয় m/o অর্থাৎ m দাঁড়ায় অসীমে। এই অসীম ভরকে নাড়াতে

লাগে অসীম শক্তি—যা বিশ্বজগতের সব শক্তির চেয়েও বেশী শক্তি। এই অসীমভরকে নড়াতে আইনস্টাইনের জগতে কোন শক্তি নেই—কাজেই আলোর চেয়ে বেশী গতি কোনো জড়কণা পেতে পারে না।

মোমেণ্টাম ও এনার্জিকেও একটি সম্বন্ধের সূত্রে গাঁথলেন আইনস্টাইন। তাঁর জগতে এনার্জি E কে মোমেণ্টামে P-এর সাপেক্ষে জানা যায় একটি সমীকরণে $Eo^2 = P^2c^2 + m^2c^4$; আর এই সমীকরণটি কোয়াণ্টা গণিতে, কণাদের গতিধর্ম বোঝাতে বারবার এসেছে। শক্তির রূপান্তরের ধারায় দেখা যায় ভর বেগ এবং ভর বা মাস। রূপান্তরে অংশ নেয় আলোর গতি c॥

আইনস্টাইন আলোর সুতো দিয়ে দেশ ও কাল স্পেস ও টাইমকে বাঁধলেন। তাঁর জগতে চারটি মাত্রা—স্পেসের তিনটি মাত্রা x, y, z এবং সময়ের জন্য একটি মাত্রা! সেই মাত্রাটি ct। তাঁর গণিতের ছকে জানা গিয়েছিল $x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$ রাশিটি ইন্‌ভেরিয়েণ্ট। এদের ইণ্টারভেল বা তফাতটুকু জানায় আইনস্টাইনের স্পেস-টাইম। পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে এই ইণ্টারভেলটির চারটি মাত্রা, x, y, z, এবং (− ct)॥ এখানে স্পেসের তিনটি কো-অর্ডিনেটের চিহ্ন যা—সময়ের কো-অর্ডিনেট ct'র চিহ্ন তার উল্টো। এই বিভিন্ন চিহ্নের জন্য দেশ ও কালের বন্ধনটি ঠিক পাকাপাকি করে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। এটি একটি ত্রুটি। এটিকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা হলো। সেই 'যদিদং হৃদয়ং তব' মন্ত্রের উদ্‌গাতা হলেন আইনস্টাইনের প্রাক্তন গণিত গুরু, জন্মসূত্রে রাশিয়ান, সে-কালীন গণিতের পীঠস্থান গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্মান মিনকোওস্কি। দেশ-কালের সীমারেখাটি তিনি চিরকালের মতো মুছে দিলেন। এই-জন্য আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে গড়া স্পেসটাইমকে বলা হয় মিনকোওস্কির স্পেস।

দৈর্ঘ্যের সংকোচন ও সময়ের হ্রাস দুটিই যেন স্পেসের বৃত্তির কথা জানায়—দুটি যেন স্পেসটাইম জগতে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। দৈর্ঘ্য কমে যায়—অতএব সেই কম দৈর্ঘ্য একই গতিতে পার করতে সময় কম লাগবে—এটি স্বাভাবিক ও মৌলিক যুক্তি। আলোর সুতো দিয়ে বাঁধা স্পেস ও টাইমের আইনস্টাইনীয় জগতে যেন এক নতুনতর যুগপত্তার বোধ জাগে। স্পেস ও টাইমের সমানত্ব-সমলয়ত্ব আলো দিয়ে গাঁথা। যেন দুটি শ্যামদেশীয় যমজ—যাদের সংযোগী মাংসপেশীটি হলো আলো। মিনকোওস্কি সেই সংযোগী মাংসপেশী, যা হাইফেনের মতো দেশ-কাল—স্পেস-টাইমকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে বিদায় করে দিলেন। পাওয়া গেল মগধরাজ জরাসন্ধকে।—যার দুটি অর্ধ জানায় দেশ ও কাল। দুটি অর্ধের মিলনে পাওয়া যায় দেশকাল। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় জরাসন্ধের।

নব জরাসন্ধ পালা

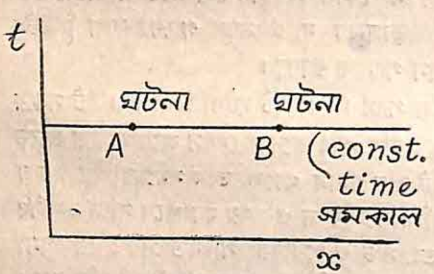
স্পেস নিয়ে চিন্তাভাবনা সেই আদ্যিকাল থেকে ঘটে এসেছে। প্রাকনিউটন যুগে স্পেসের যে চারটি গুণের কথা ভাবা হতো তারা হলো, স্পেস continuous বা অবিচ্ছিন্ন ; স্পেসের ডায়মেনসন বা তার আয়তন আছে। এখানে দেখা দেয় connectivity অনবন্ধতা। যার ফলে বুনোটের মত সংহত সংবন্ধ অবস্থা দেখা দেয়। আর থাকে orientability বা দিগস্থিতি বোধ। এই চারটি সুপ্রাচীন গুণাবলী এক করে নিউটন দুটিমাত্র গুণে স্পেসকে জানালেন—স্পেস হোমোজিনাস ও আইসোট্রোপিক—এটি অবস্থানে এক, বুনোটে এক। আর স্পেস বোঝাতে জ্যামিতির কো-অর্ডিনেটের ব্যবহার নিউটনের আগেই শুরু। স্পেসে যে কোন অবস্থান বোঝাতে জানানো হবে Direction ও Angles—দিক্‌দূরত্ব ! তাছাড়া দুটি নতুন গুণের কথা নিউটন জানালেন—স্পেস এবসল্যুট ও ইনার্ট—স্পেস পরম ও স্থাণু।

নিউটনের স্পেস ও টাইম দুটিই স্বাধীন পরম। একটি ঘটনা স্পেসে একটি সময়ে ঘটতে পারে, একই সময়ে অনেক ঘটনা ঘটতে পারে এবং অনেক স্পেস অনেক সময় জুড়ে তৈরি হয় ঘটনার ইতিহাস। ঘটনার গতিটি যদি সমান থাকে, তবে সময়ের আলোচনা নিরর্থক। কারণ নিউটনের গণিতে ভেলসিটিতে স্থান ও সময় ফাংশনে নামে অর্থাৎ v=f (s, t) অথবা সময় t হলো v/s—ভেলসিটি ও দূরত্বের পরিবর্তনের হারে জানা যায় সময়। গতির বন্ধনে স্পেসে সময়কে জানা যাবে—নিউটনের তত্ত্বে এই তথ্য নিহিত ; তবে এর আলোচনা নিউটনের গতিসূত্রে নেই।··· মিনকোওস্কি সেই ইঙ্গিতটিকে বেছে নিলেন—আলোচনা তুললেন ; আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদটি জানাতে মিনকোওস্কি স্পেসের জ্যামিতিক গুণের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

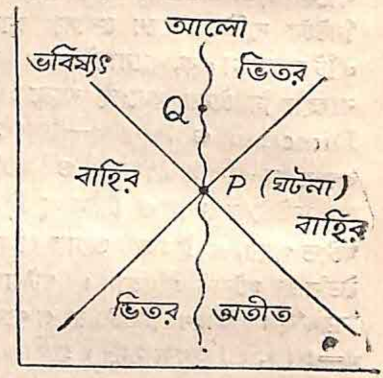
নিউটনের স্পেস টাইমের ছকে একটি ঘটনার ইতিবৃত্ত রেখা সময় ও স্পেস ধরে চলে যায়,—চলে সমগতিতে। অন্যদিকে যে কোন মুহূর্তে একটি দর্শকের কাছে সব স্পেস সমান মর্যাদার—সেই দর্শক একই সময়ে অনেক ঘটনার সাক্ষী হতে পারে।—ঘটনাদের গতি প্রকৃতি আলাদা হতে পারে ;—তবু দর্শকের চোখে তাদের দেখার কালটি এক। ছোট গতির ক্ষেত্রে সময় নিয়ে মাথাব্যথা হচ্ছে না। অথচ যদি ভাবা হয় বড় দূরত্বের কথা—যে দূরত্ব মাপা হবে আলোর গতির সাহায্যে—সেখানে দূরজগতে ঘটে ওঠা অনেক ঘটনার সংবাদ কোন দর্শকের কাছে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে জানা হলেও, দূরত্বের জন্য সময়ের তফাত ঘটে, ঘটতে পারে ; কারণ সময় হলো সমগতি ও দূরত্বের আনুপাতিক হার। মোট দূরত্বকে গতি দিয়ে ভাগ করলে জানা যায় সময়।···

[$s=vt$ অতএব $t=\frac{s}{v}$] যে কোন দর্শক একটি আলোর পথে যা দেখে, তা সে দেখে তার গতিশীল ফ্রেমের আঙিনা থেকে, আলোর গতির সাপেক্ষে। সে যদি আলোর গতি নিয়ে যেতে পারে—তবে তার দেখার পথ আর আলোর পথ অভিন্ন। গতি যদি ভিন্ন হয় তবে সে যেন আলোর পথে ঝুঁকে দেখে। এই যে ঝুঁকে থাকা, এটি নির্ভর করে

তার নিজের গতির উপর। যেমন চলন্ত রেলগাড়ীর জানালায় বসে থাকা যাত্রীটি।—দূরের দৃশ্য সে তার জানলায় আরামে বসে দেখতে পারে। কিন্তু যদি ট্রেনের স্পিড বাড়ে, তবে দৃশ্যটি ভাল করে বুঝতে তাকে ঝুঁকে পিছন দিকে চেয়ে দেখতে হবে। দৃশ্যকে সুবিন্যস্তভাবে বুঝতে হলে তার ঝোঁকের ভঙ্গীটি ট্রেনের গতির সাপেক্ষে গড়ে ওঠে। মিনকোওস্কি বললেন, আলোর সাপেক্ষে গতিশীল দর্শকের দেখার জগতের পরিসীমাটি এই ঝুঁকে থাকা বোধটি নিয়ে গড়ে উঠবে। সময় ও দেশের মাত্রাগুলি আলোর পথে একটি নির্দিষ্ট ঢাল বা Slope—স্লোপ নিয়ে গড়ে উঠবে। আর আলোর পথটি এই দুই ঢালের মধ্যদিয়ে ছুটে যাবে।



নিউটনের ছক



আইনস্টাইনে—মিনকোওস্কির ছক

যে কোন দর্শকের কাছে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার অবস্থিতি ধরা পড়বে আলোর পথে। দর্শকের দেখার জগতের বাইরে ঘটনা ঘটতে পারে (যেমন, A, B)। তবে একটি আলোর সূত্রে সব ঘটনাকে বাঁধা যায় না। অন্যদিকে আলোর পথ ধরে ঘটনা প্রবাহ যায় অতীত থেকে ভবিষ্যতে।

আলোর পথের বাইরে A ও B অবস্থানে যেসব ঘটনা ঘটে, তার সময়ের ধারণা করা যায় না। অন্যদিকে P ঘটনাটি বর্তমানে যে ঘটছে, সেটি দর্শক জানে এবং জানা যায় Q ঘটনা ঘটে ভবিষ্যতে। মিনকোওস্কি স্পেস-টাইমের ঘটনার ছকে আইনস্টাইনের ইনভেরিয়েন্ট-গণিতটিকে টেনে আনলেন। স্পেস-টাইমের ছক জানা যায় $x^2+y^2+z^2-c^2t^2$ (অথবা সংক্ষেপে $x^2-c^2t^2$) গণিতের ছকে। এখানে x^2 যদি c^2t^2 এর সমান হয়, তবে সেটি আলোর পথ। x^2 যদি c^2t^2 এর চেয়ে বড় বা ছোট হয় তবে দর্শকের দৃষ্টির চৌহদ্দিতে স্পেস-টাইম থাকে অথবা থাকে না। এই ছক থেকে আইনস্টাইনের স্পেস টাইমের চতুর্মাত্রার ব্যাখ্যা দিলেন মিনকোওস্কি। যে কোন দূরত্বকে সোজাসুজি মাপা যাবে না—কারণ স্পেস-টাইমের ম্যাপে, এ দুটি কো-অর্ডিনেটের চেহারা সব দর্শকের কাছে এক হবে না! প্রতি দর্শকের কাছে আলোর গতিপথে এই দুটি কো-অর্ডিনেটের ঢাল বা স্লোপ ভিন্ন। সোজাসুজি বলা যায়, যদি দেশকালের ম্যাপে একটি ঘটনার অবস্থান রেখা আর সময় রেখা টানা যায়, তবে এই দুটি সেই

ঘটনা বিন্দুতে ছেদ করবে—ঘটনাটি অবস্থান ও সময়ে নির্দিষ্ট হবে। তবু বিভিন্ন দর্শকের অবস্থান ও সময়ের বিভিন্নতার জন্য অথবা সংক্ষেপে ভেলসিটির জন্য, এই দুই রেখার ঢাল আলাদা হতে পারে। একই ঘটনা বিন্দুতে বিভিন্ন দর্শকের সাপেক্ষে গড়ে তোলা অবস্থান ও সময় রেখাদ্বয় ছেদ করলেও তাদের ঢাল বা স্লোপ আলাদা। তিন মাত্রার স্লোপে কালের মাত্রার স্লোপও পরিবর্তনশীল—স্পেসের সঙ্গে মিল টেনে এটিরও ঢালের পরিবর্তন ঘটে। দর্শকের দেখার চৌহদ্দিটি স্পেস-টাইমের মাত্রা দিয়ে একাঙ্গী করে তোলা। স্পেস-টাইমের পরিসীমায় স্পেস ও টাইমের আলাদা কোন মর্যাদা নেই।

মিনকোওস্কি আইনস্টাইনের সময়ের মাত্রা $-c^2t^2$ কে বললেন এটি $+i^2c^2t^2$। এই অর্থে তিনি যে চারটি কো-অর্ডিনেট পেলেন তারা ict, x, y এবং z এবং এদের প্রত্যেকের চিহ্ন পজিটিভ। আইনস্টাইনের সমীকরণে যে কোন নির্দিষ্ট ইভেণ্টকে একটি অপরিবর্তনীয় রূপের সমীকরণে জানা যায়—দর্শকের দেখার জগৎ যেমনই হোক ইভেণ্ট বা ঘটনাটি অবস্থান ও সময়ের কো-অর্ডিনেটের ছেদ বিন্দুতে জানা যাবে। আর ঐ ইভেণ্ট ইণ্টারভেল যেটি স্থানিক গতির দিকের উপর নির্ভর করে সেটিকে জানানো হয় S চিহ্ন দিয়ে। অর্থাৎ $S=x^2+y^2+z^2-c^2t^2$।

একটি ছকে এই সমীকরণটিকে লেখা যায়

$$S=\begin{vmatrix} x^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & y^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0. & -c^2t^2 \end{vmatrix}$$

রাশিগুলির কো-এফিসিয়েণ্ট শুধু নিলে পাওয়া যায়

$$S=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0. & -1 \end{vmatrix}$$

আর মিনকোওস্কি জানালেন সমীকরণটি হলো $S=x^2+y^2+z^2+i^2c^2t^2$

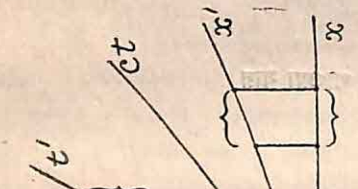
অর্থাৎ $$S=\begin{vmatrix} x^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & y^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i^2c^2t^2 \end{vmatrix}$$

অথবা $$S=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

শেষ ছকটি গণিতের চেনা ছক—এটিকে বলা হয় ইউনিট মেট্রিক্স—যেটি দিয়ে কোন মেট্রিক্সকে গুণ করলে সেই মেট্রিক্সটিকেই ফিরে পাওয়া যায়—যেমন যায় কোন রাশিকে এক দিয়ে গুণ করে সেই রাশিটিকে। অথচ এটি কোন মেট্রিক্স নয় বলে এই ছকটিকে বলা হয় সিউডো মেট্রিক্স বা লাইন এলিমেণ্ট। মিনকোওস্কির ছকে প্রতিটি কো-অর্ডিনেটের চিহ্ন এক। কাজেই এটি যেন পিথাগোরাসের সমীকরণটি জানায়—এখানে

x, y, z এবং ict কো-অর্ডিনেটগুলি পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষে লম্ব। আবার সময়ের মাত্রায় i নামক ইমাজিনারি চিহ্নটি থাকার কালের মাত্রাটি যা কিছু অবস্থান পেতে পারে—যে যেমন দেখে। স্পেসের কো-অর্ডিনেটের সঙ্গে সময়ের মাত্রা আছে সুতোর মত লম্ব হয়ে, কোথাও অনুভূমিক, কোথাও বা সমান্তর হয়ে স্পেসের মাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে আর আলাদা ভাবা যায় না। এই চিন্তার সূত্রে মিনকোওস্কির ছক থেকে আরেকটি ধারণার বোধ জাগে ঃ রীমানের জ্যামিতির মেনিফোল্ড বা প্রতিলিপির জ্যামিতিক গঠনের সঙ্গে স্পেসের সরল রৈখিক গঠনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

জ্যামিতিতে মেনিফোল্ড বলতে বোঝা যায় সেই স্পেস যা অবিচ্ছিন্ন ও নির্ধারিত কো-অর্ডিনেটের সাপেক্ষে জানা যাবে এবং নির্দিষ্ট মেনিফোল্ডের যে ক্ষুদ্রতম অংশে এই মেনিফোল্ডের চারিত্রিক ও স্বাভাবিক বিশেষত্বটুকু বজায় থাকে তাকে বলা হয় কোয়ান্টা। এই জ্যামিতির ছকে মিনকোওস্কি ঢেলে সাজালেন আইন্সটাইনের তত্ত্বটিকে। জানালেন, তত্ত্বটির কার্যকারণ সম্পর্ক। তাঁর উপপত্তির প্রথম ঘোষণাটি হলো, ইভেন্টের কারণটি সময়কে এড়িয়ে বা সময়ের পরে ঘটবে না। দ্বিতীয়টি হল,—স্পেস-টাইমের যে কোন বিন্দুতে প্রাকৃতিক প্রভাবের পরিচলনের গতির একটি নির্দিষ্ট বহিসীমা থাকে যার সাহায্যে কার্যকারণ সম্পর্কটি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। সব শেষে মিনকোওস্কি বললেন, এই গতির বহিসীমাটি একমাত্র আলোর স্থানিক পরিচলনের ভিত্তিতেই জানা যাবে।



মিনকোওস্কির ছক

তিনটি উপপত্তির সূত্রে মিনকোওস্কি স্পেস-টাইমের ম্যাপটিকে আঁকলেন। ইভেন্ট ঘটে আলোর পথে—অবস্থান ও সময়ের মাত্রার ছেদ বিন্দু জানায় ইভেন্ট। একটি দর্শকের দেখার পরিসীমাটি নির্দিষ্ট—এইখানে আইনস্টাইনের সমীকরণ $s = x^2 - c^2t^2$ জানায় পজিটিভ রাশি। এর বাইরেও থাকে স্পেস যেখানে c^2t^2 স্থানটি অনেক বড়, তবে তার বোধ দর্শকের থাকে না, কারণ সেই স্পেস অনেক বড় গতির সুতোর বুনোটে গড়ে তোলা। আলোর সুতোয় বোনা স্পেসের সবটা দর্শকের চোখে একটি কালে ধরা পড়ে না।

স্পেস-টাইমের চারটি মাত্রাই যেন স্পেসকে জানাচ্ছে। x, y, z কো-অর্ডিনেটগুলি নিশ্চয় স্পেসের কো-অর্ডিনেট ; অন্যদিকে আলোর ভেলসিটি নিয়ে গড়ে তোলা চতুর্থ কো-অর্ডিনেট ct, সেও জানাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠা দূরত্ববোধ, এটিও স্পেস। নিউটন দেশকালের ম্যাপে দেশ বা স্পেস ও কাল বা সময়কে দ্বিমাত্রিক ছকে, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের ছকে এঁকেছিলেন। মিনকোওস্কিও সেই ছক নিলেন। x ও t পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর যখন লম্ব হয়ে থাকে তখন যেন স্থির জগৎ উঁকি মারে—উঁকি মারে

নিউটনের ইনারশিয়া ফ্রেম। কিন্তু কোনো বস্তু যদি আলোর গতির মাপে যায় তবে আলোর সময়ে গড়া পথটিও এই ম্যাপে জানা যাবে। স্পেস ও সময়ে গড়া ভেলসিটিটি যদি আলোর গতি নিয়ে গড়ে ওঠে, তবে সেই অপরিবর্তনীয় গতির জগতে স্পেস-টাইমের আলাদা বা পৃথক কোন কো অর্ডিনেট থাকে না—স্পেস কো-অর্ডিনেট ও টাইম কো-অর্ডিনেট দুইটি ct কো-অর্ডিনেট তাই নিউটনীয় x—t কো-অর্ডিনেটের মাঝপথ ধরে চলে—এটি স্থির ফ্রেমের দুটি কো-অর্ডিনেটের সঙ্গে 45° কোণ করে থাকে। গতিশীল রেফারেন্স গতির পথে একই সৃষ্টি বিন্দু 0 থেকে একই সময়েই যাত্রা করলেও ঝুঁকে থাকে ঐ ct রেখার দিকে। ঐ ঝুঁকে থাকা ফ্রেমের সাপেক্ষে মিনকোওস্কি জ্যামিতিক রীতিতে দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন, সময়ের হ্রাস এ দুটিকে পেলেন ; —এই প্রাপ্তি স্বাভাবিক ; ঝুঁকে পড়া কো-অর্ডিনেটে গড়া স্পেস নিশ্চয় লম্ব রেখায় গড়া স্থির ফ্রেমের স্পেসের চেয়ে ছোট। স্পেস ছোট হচ্ছে—কাজেই সম গতিতে আলোর গতিতে সেই ছোট স্পেসে সময়ের হ্রাস হয়, অন্যদিকে সময়ের হ্রাস জানাবে, দূরত্বের ক্ষুদ্রতা! …জ্যামিতিক ছকে স্পেস-টাইমকে একীকৃত করেন মিনকোওস্কি। নিউটনের ত্রিমাত্রিক দাদরা ছন্দ আইনস্টাইন—মিনকোওস্কির হাতে রূপ পালটে ত্রিতাল ছন্দে রূপ নেয়।

1907-08 সালে মিনকোওস্কি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের জ্যামিতিক গণিতের ছকটি সাজিয়ে তুলতে থাকেন। তাঁর ছাত্র সেই মহাফাঁকিবাজ এলবার্ট কি এক অশ্চর্য তত্ত্ব জানিয়েছেন—কত তার সম্ভাবনা! তিনি শিল্পীর তুলির টানে আইনস্টাইনের হাতে গড়া প্রতিমার চালচিত্রটি অলঙ্কৃত করতে থাকেন। 1908 সালে জার্মান ন্যাচুরাল সায়েণ্টিস্ট এবং ফিজিসিস্টদের আশিতম সম্মেলনে, শোনা যায়, আবেগে মিনকোওস্কি বলে ওঠেন, "এখন থেকে স্বাধীন স্পেস ও স্বাধীন সময় দুটিই ছায়ান্ধকারে মিলিয়ে যাবে, একমাত্র স্বাধীনসত্তা হিসেবে বজায় থাকবে দেশকালের সমন্বয়ের আকৃতিটি।"—আর্ণস্ট সমারফেল্ড অবশ্য এই সময়েই মিনকোওস্কির বক্তব্যটির উপর মন্তব্য করে বলেন, "মিনকোওস্কির দেশকালের সমস্যার চিন্তার Epistomological বা জ্ঞানগত ব্যাখ্যা কি হবে সেটি একটি অন্য প্রশ্ন। তবে, আমার কাছে যা মনে হয়, এই প্রশ্নটি তাঁর নিজের বক্তব্যটিকে ছুঁতে পারছে না।"—আইনস্টাইন স্বয়ং মিনকোওস্কির গণিতের এই নীতিটিকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। শোনা যায়, প্রথম দিকে ইনি বলেছেন, গোটেনগেনের এঁরা যা করছেন, সেটা আমার বোধগম্য নয়। এ যেন গণিতের অবোধ্য কচকচানি—(isserex অথবা X-ing)। পরে নানা বিবেচনার পর ইতস্তত কাটিয়ে এই গণিতের ছকটি মেনে নেন, আর তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের স্পেস টাইমের কাঠামোটির জন্য হাত বাড়ান রীমানের গণিতে—জ্যামিতিক প্রকৃতিতে। খোঁজেন মিনকোওস্কির আঁকা দেশকালের বিধৃতিতে। এই সময়ে 1909 সালে ক্ষয়রোগে অসুস্থ মিনকোওস্কি মারা যান। দুঃখে, হতাশায়, মিনকোওস্কি মৃত্যুকালে বলেন, আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির কালে মরতে চলেছি—কি যে আফশোস!

গণিতবিদ মিনকোওস্কির মৃত্যু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির বাধা হয় নি। একক অদম্য ও অনন্য আইনস্টাইন সাধারণ তত্ত্বটি গড়ে তোলেন। তবু মনে হয়, এই সৃষ্টির কালে, মিনকোওস্কির সাহায্য, তত্ত্বটিকে আরো আগে, আরো সুন্দর করে

তুলতে কি পারতেন। সুন্দর তত্ত্বটি সুন্দরতর রূপে হয়তো ধরা দিত। গুরু শিষ্যের যুগলবন্দী সুরে রাগরূপের বন্দীশটি, কাঠামোটি আরো মহিমাময় হয়ে উঠতো! মিনকোওস্কি যা করে গেলেন, সেটি হলো স্পেস ও টাইমের একাঙ্কীকরণ। আর এরই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ দেশকালের জরাসন্ধ প্রাণময় রূপটি মেনে।

সাধারণে অসাধারণ

গতি বা ভেলসিটির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কাজের পর ত্বরণের উপর আপেক্ষিকতাবাদের ক্রিয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবে আইনস্টাইনের মনে জাগে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে থাকে সমগতি। তবে গতির পরিবর্তন ঘটে, ত্বরণ আসে, দেখা দেয় নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব। মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বক ফিল্ডে গড়ে ওঠা আলোর গতিকে আশ্রয় করে আইনস্টাইন সমগতির রাজ্যে বিশেষতত্ত্বটিকে আনলেন; আনলেন দেশকালের যুগপত্তার বোধটির আপেক্ষিক ধারণাটি আশ্রয় করে। সেই একই দেশকালের ফ্রেমে ত্বরণ আর মহাকর্ষকে বাঁধতে হবে; তাতে যে বিশাল সাম্রাজ্যটি গড়ে উঠবে তার একাংশে ঠাঁই পাবে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। অর্থাৎ আইনস্টাইন চাইলেন, গতিবিজ্ঞানের জগতে দেশকালের ফ্রেমে একটি সাধারণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে যা বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদ, ত্বরণ ও মহাকর্ষকে একটি রাগরূপের কাঠামোয় বাঁধবে—পরিবর্তন দেখা দিবে শুধু বন্দীশে আর লয়ে।

1916 সালে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত "The Foundation of Genral Relativity Theory" অথবা 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি' নামের পেপারটির ভূমিকায় আইনস্টাইন জানালেন, "রিলেটিভিটি তত্ত্বের সাধারণ বিস্তৃতি মিনকোওস্কির জানানো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের কাঠামোটি ধরে সহজেই করা গেছে; এই গণিত-বিদই দেশ ও কালের কোঅর্ডিনেটের সাদৃশ্যটি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন এবং পেরেছিলেন তত্ত্বটিকে তারই আলোকে প্রকাশ করতে।" সর্বগ্রাসী সাধারণ তত্ত্বটি দেশকালের চতুর্মাত্রার বিধৃতিতে প্রকাশ করতে হবে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর মতে, "সনাতনী মেকানিকসের আওতা থেকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ খুব দূরে সরে নেই। দূরত্ব ধরা দিয়েছে শুধু শূন্যে আলোর গতির অপরিবর্তনীয়তার ঘোষণায়।"—দেশকাল আর আলোর গতি—এই দুটিকে সাধারণ তত্ত্বে ব্যবহার করতে হবে—এই তাঁর স্বপ্ন, তাঁর কল্পনা, তাঁর চেষ্টা। এরই খোঁজে 1905 সাল থেকে 1915 সাল—এই দশ বছর ব্যাপী তাঁর নিরলস কাজ।

ভেলসিটি হলো নিউটনের গতিবিজ্ঞানের ভিত এবং আইনস্টাইনের বিশেষ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। নিউটনের মতে এই গতি জানা যায় ইনারশিয়াল ফ্রেমের সাপেক্ষে। নিউটনের ধারণায় সব গতিশীল পদ্ধতি মেকানিকেল পদ্ধতিতে একই ভাবে ধরা পড়ে; সুতরাং কয়েকটি মাত্র নিয়মের বন্ধনে এদের বাঁধা যাবে। শুধু ত্বরণ ব্যতিক্রম। এটি গতিশীল বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি; কারণ সমগতিই স্বাভাবিক। নিউটনের মতে গতিশীল প্রণালি বা সিস্টেমের উপর যে সব ফোর্স কাজ করতে পারে, যে গুলি বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তাদের এবং ত্বরণের কারণ কটি বাদ দিলে সমগতি থাকে। সুতরাং যাকে ইনারশিরাল ফ্রেম, অথবা আরো একটু বিস্তৃত ভাবে বললে, যাকে পরমস্থির ফ্রেম বলা হয়, সেটি পাওয়া তখনই সম্ভব যদি কোথাও কোনো ফোর্স না থাকে। বিশ্বজগতের সব পদার্থ সরিয়ে নিলেও যদি ঘূর্ণ্যমান গতিটি থাকে তবে সেণ্ট্রিফুগাল ফোর্স পাওয়া যাবে। এখানেও সমগতি পাওয়া সম্ভব।

রিলেশনিস্ট স্কুলের মতবাদীরা নিউটনের এ যুক্তি মানতে পারেন নি। নিউটনের স্পেস একটি বস্তু, অথচ এটি ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। আর নিউটনের ঘূর্ণ্যগতি বিশ্বজগতের সবপদার্থ সরিয়ে নিলেও থাকে—এটি একটি অসঙ্গতি। একটি মাত্র বিশ্বজগৎ; তার সব মেটারকে কোথায় সরানো হবে? আইনস্টাইনের শিক্ষক মাক অন্যদিকে একটি পেণ্ডুলামের দোলনের পরীক্ষায় প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে দূরের আকাশের তারার সাপেক্ষে যে কোনো মেকানিকেল পদ্ধতি যার কোন ইনারশিয়াল ফোর্স নেই—সেও ত্বরণহীন গতি, সমগতি পেতে পারে; কারণ ছায়াপথে তারকারা ঘূর্ণ্যমাণ। মাকের মতে ত্বরণ জাতীয় প্রণালির ফলে গড়ে ওঠা ইনারশিয়াল ফোর্স দূরের নক্ষত্ররাজির ক্রিয়াকলাপেই একমাত্র গড়ে ওঠে। এই সব ছায়াপথ গেলাক্সি ইত্যাদি কিছুই যদি না থাকে, তবে সেখানে ইনারশিয়ালফোর্স থাকে না। একটি পরিপূর্ণ শূন্যতার মধ্যে যে কোনো নাগরদোলা যত জোরেই ঘুরুক দোলকটির ভিতরের মানুষটি সেণ্ট্রিফুগাল ফোর্স অনুভব করতে পারবে না। মাক বললেন, এই শূন্য বিশ্বজগতে একটি মাত্র ঘূর্ণ্যমান গতির কল্পনা অর্থহীন এবং অবাস্তব। মাক অবশ্য তাঁর উপপত্তির বিশদ ব্যাখ্যা কোথাও দিলেন না; জানালেন না দূরের জগতের তারকাদের ক্রিয়া কি ভাবে ঘটে। তবু নিউটনের তত্ত্বের ত্রুটির দিকে তিনি তর্জনী নিক্ষেপ করলেন।…এই দূরের নক্ষত্র রাজির ক্রিয়াকলাপটিও সাধারণ তত্ত্বের জালে ধরতে চাইলেন আইনস্টাইন।

1905 সালে যে দুটি ফোর্সের কথা জানাছিল তারা মহাকর্ষ আর মেক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক শক্তি। চার্জের ধারা দুই ধরণের—পজিটিভ ও নেগেটিভ। তবে চার্জহীন নিউট্রাল পদার্থও পাওয়া যায়। চার্জহীন অবস্থা মানে মেক্সওয়েলের ফোর্সের অবলুপ্তি। সুতরাং নিউট্রাল পদার্থের সাপেক্ষে বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তির পরিমাপ পরিমাণ করা সম্ভব। মহাকর্ষে এধরণের সুযোগ নেই। মহাকর্ষে শুধু আকর্ষণ এবং দেখা গেছে সব পদার্থই মহাকর্ষে অংশ নেয়; এখানে এই বিশ্বলোকে, মহাকর্ষহীন কোনো পদার্থ নেই। গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়মে জানা যায় সব পদার্থ নিচে নামে, যত নিচে নামে মহাকর্ষের টান তত বেশি। এই যে গতির পরিবর্তন —এটিকে সর্বদা বোঝা কি যায়?

আইনস্টাইনের উত্তর নঞর্থক। একটি লিফট যখন নিচে নামে, তখন লিফটের ভিতরের মানুষটির মনে হয় সে যেন ওজন শূন্য অবস্থায় আছে। ওজন বা ওয়েট জানায় ভর এবং মহাকর্ষ ধ্রুবকের গুণফল। ওজন শূন্য অবস্থায় মহাকর্ষের টান অনুভব করা যায় না,—ত্বরণের বোধ জাগে না। এখন লিফট যদি উপরে ওঠে তখন ওজনের বোধ জাগে। যত উপরে ওঠে, ততই ভর যেন বেশি মনে হয়। এই ভার বোধ হবার কারণ লিফটের উপর একটি ফোর্স কাজ করে, যেটি মহাকর্ষের টানকে জব্দ করে লিফটটিকে উপরে তুলতে পারে। এখানে একটি গতি আছে যা মহাকর্ষের ফোর্সে পাওয়া ত্বরণকে হটিয়ে দেখা দেয়। এই গতি-যা একটি ত্বরণকে বিপর্যস্ত করে গড়ে ওঠে বলে নিজেও একটি ত্বরণ—সেটিই ভার বোধ জাগায়। লিফটের নির্বাধ পতনের (Free Fall) কালে অথবা অবাধ ওঠার সময় দুটি বোধ জাগে; এরা হলো পতনের

কালে মহাকর্ষের আকর্ষণ ধরা যায় না, আর উপরে ওঠার কালে ত্বরণটিকে মনে হয় আকর্ষণ।

এই বোধের রেশ মেনে আইনস্টাইন বললেন, স্পেসের নির্দিষ্ট চৌহদ্দিটুকুতে নির্বাধ পতনের কালে মহাকর্ষবোধ থাকে না এবং সীমিত স্থানে ত্বরণ ও মহাকর্ষের বোধ এক। নিউটন তাঁর গতি সূত্রে ত্বরণ ও মহাকর্ষকে আলাদা বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর মহাকর্ষ হরেদরে নিশ্চয় একটা ত্বরণ ; সে ঘূর্ণ্যমান গতি আনতে পারে ; গ্রহনক্ষত্র এরই টানে কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে নিজের নিজের কক্ষপথে ঘুরতে পারে। তবু মহাকর্ষ ত্বরণ হলেও এটি বিশিষ্ট ; তার আলাদা মানমর্যাদা আছে। আইনস্টাইন বললেন, এই মহিমান্বিত মহাকর্ষটি একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যে তার মর্যাদার আলাদা ঠাঁটবাঁট বজায় রাখতে পারবে না - ছোট্ট সীমার মধ্যে মহাকর্ষ আর ত্বরণের আচার ব্যবহার এক—দুটিই গতির পরিবর্তন আনে।

স্পেসে মহাশূন্যে মহাকর্ষ কাজ করে ; এর আকর্ষণ শক্তি দূরত্বের সীমায় কমে যায়। এই শক্তি যে কোনো দিকে কাজ করতে পারে, কারণ স্পেসে যে কোনো অবস্থানে অন্য বস্তুর উপস্থিতি থাকে। অতএব, নিউটনের ধারণা মত শুধু দুটি বস্তুর কেন্দ্র সংযোগী রেখাতেই এই শক্তির কাজ সীমাবদ্ধ যে থাকবে, তা নয় ; অনেক বস্তু, অনেক দিক, অনেক অঞ্চলের মহাকর্ষের টান একটি বস্তু যখন অনুভব করতে পারে, তখন মেক্স-ওয়েলের ফিল্ডের তুলনা টেনে আইনস্টাইন বললেন, মহাকর্ষও একটি ফিল্ডের বোধ জাগায়—যেটি মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী বস্তুর চারদিকে জ্যোতির্বলয়ের মত থাকে,—যত দূরে যাওয়া যায় টান কমে আসে। স্পেসে বহু মহাকর্ষ ফিল্ড কাজ করতে পারে ; তাদের আকর্ষণের যোগবিয়োগে সর্বত্র সমান ফিল্ড থাকে না ; কোথাও কোথাও টাইডেল ওয়েভের মত, জোয়ার ভাটার মত কিছুটা সমতার অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকে ; সেটুকুই অনুভব করা যায়। এই আকর্ষণের পরিবর্তনটুকু চোখে বোধে ধরা পড়ে। যেমন, পৃথিবীর বুকে চাঁদ সূর্যের টান সর্বদা সমান নয় ; সমান নয় বলে নদীতে জোয়ার আসে, ভাটা নামে,—এক ঘেয়েমির জগতে টাইডেল এফেক্ট আকর্ষণের টানে নতুন মাত্রা জোগায়।—বিশ্বজগতে সেই একই রীতি। তবু এই পরিবর্তনের ধারাটি লিফটের পতন-উত্থানে ধরা পড়ে না। কারণ এই অংশটুকু খুবই ছোট,—এখানে মহাকর্ষের বোধ জাগে না।—আইনস্টাইন এই ঘোষণার সামান্য পরিবর্তন করলেন ; বললেন, 'মহাকর্ষের বোধ এখানে জাগে না'—না বলে বলা হবে, 'মহাকর্ষের বোধ এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় জাগে না।'—কারণ এই বোধও জাগে।

ধরা যাক, লিফটের উপরের তাক থেকে সব বস্তুর পতন ঘটছে। দেখা যায় নামার দূরত্বটি যদি বেশি হয় তবে সব বস্তুই কেন্দ্রের দিকে কিছু বেঁকে, কিছু ঝুঁকে পড়েছে। পতনটি সোজাসুজি ঘটে না। অর্থাৎ, যতক্ষুদ্র অংশে হোক না কেন, পতনটির দূরত্ব পথটি বেশি বলে মহাকর্ষের পরিবর্তনের টান লিফটের মধ্যের বস্তুর উপর পড়ে ;—টাইডেল এফেক্ট বোঝা যায়। বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি যেমন পরীক্ষার ফলে যে কোনো বিন্দুতে বোঝা যেতে পারে - মহাকর্ষের পরিবর্তনটুকু মাত্র এখানে বোঝা যাবে।

স্থির ফ্রেমের চিন্তায় নিউটন ভেবেছিলেন, মহাশূন্যে কোনো এক জায়গায় ফোর্সযুক্ত

অঞ্চল থাকতে পারে যার সাপেক্ষে ইনারশিয়াল ফ্রেমটি গড়ে তোলা যায়। অতএব মহাশূন্যে সমগতিতে ছুটে চলা কোনো বস্তু যদি সেই ফোর্সমুক্ত অঞ্চলে যেতে পারে তবে তার উপর মহাকর্ষ সমেত যাবতীয় ত্বরণের কি ফলাফল ঘটে সেটি আমরা পৃথিবীর বুকে বসেই জানতে পারব। এরই সূত্র ধরে যার সমগতি আছে সেই আলোর সাহায্যে ইথারের গতি মাপার যেমন চেষ্টা হয়েছিল—সেই আলোর সাহায্যে ফোর্সমুক্ত অঞ্চলে মহাকর্ষের প্রভাব মাপার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবেন। আইনস্টাইন কিন্তু সুস্পষ্ট জানালেন, এটি সম্ভব নয়। কারণ তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি শক্তি ভরের রূপান্তরের রীতিটি জানিয়েছিলেন ঃ $E=mc^2$; অতএব আলো যার শক্তি আছে তার একটা ভর থাকবে। তাছাড়া ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট তিনি আলোকে কণা বলে জানিয়েছেন ;—আলো ফোটন কণা ; তার ভর আছে। ভর যখন আছে, মহাকর্ষের টান তার উপরে পড়বে। পতনের কালে দেখা যায় বস্তুর পতনের পথটি সোজা নয়, এটি মহাবস্তুর কেন্দ্রের দিকে হেলে যায়—পথ বাঁকে। পৃথিবীর বুকে সব বস্তুর পতনের পথটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, অভিমুখে বেঁকে যায়। একই কারণে মহাশূন্যে মহাকর্ষের টানের ফলে যে কোনো বস্তুর সরলরৈখিক পথ বেঁকে যাবে। অতএব আলোর সাহায্যে দূরে কোনো ইনারশিয়াল ফ্রেমের রেফারেন্স ঠিক করা যাবে না। তাছাড়া, তাঁর মতে মহাশূন্যের পটভূমিকায় সর্বত্র মহাকর্ষ থাকবে ; কারণ সব বস্তুর একটি মহাকর্ষ ফিল্ড আছে ; সেই কারণে পাওয়া যায় মহাকর্ষের পরিবর্তনের একটা না একটা টাইডেল এফেকট। এই পটভূমিতে যার নিজের চলাটি বেঁকে যাবে—সে কি করে ইনারশিয়াল ফ্রেমের প্রাথমিকতাকে বোঝাবে ? তার গতি বোঝাবে ?—মহাকর্ষে আলোয় পথ বাঁকে এটি আইনস্টাইনের স্থির প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টি প্রমাণিত হলো 1919 সালে স্যার এডিংটনের হাতে। বাঁকের মাপ আর আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্‌বক্তিতে কোনো বিশেষ ফারাক নেই।

আলোর বাঁকের চিন্তা আইনস্টাইন প্রথম প্রকাশ করেন 1907 সালে। তবে 1911 সালে প্রকাশিত 'On the effect of Gravitation on the Propagation of Light' নামের প্রবন্ধে এই আইডিয়াটিকে তাঁর নিজস্ব মহাকর্ষ ফিল্ডের সাপেক্ষে আরো বিষদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাছাড়া, এই পেপারেই তিনি আলোর বাঁক কি করে মাপা যাবে তার পরীক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ করেন ; এবং মহাকর্ষ তত্ত্বের সাপেক্ষে তাঁর সুবিখ্যাত $E=mc^2$ সমীকরণটির একটি নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। শক্তির সমীকরণে কাইনেটিক ও পোটেনশিয়াল এনার্জির কথা ভাবা হয়েছিল। আইনস্টাইন জানালেন, মহাকর্ষের ফিল্ডে মহাকর্ষজনিত ভরের যেন কিছু বৃদ্ধি ঘটে—সেই বৃদ্ধি হলো আপেক্ষিকতাবাদে প্রতিষ্ঠিত ইনারশিয়াল মাস। শক্তি যেন গতিশীল মাস ও রেস্ট বা স্থির মাসের রূপান্তরে প্রতিষ্ঠিত। এটি যেন কাইনেটিক ও পোটেনশিয়াল এনার্জিরই যোগফল। এই মাসের সাপেক্ষে তিনি আলোর গতি ও কালটিকে রিলেটিভিটির জগতে প্রতিষ্ঠা করলেন ; জানালেন আলোর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের কথা ; আলোর লালের দিকে সরে যাওয়া। এটি ডপলারের নিয়ম ছাড়াও ঘটবে। মহাকর্ষের টানে আলোর বর্ণালীর লালদিকে সরে যাওয়া এটিও একটি সত্য—কারণ সেই অবস্থাতেও আলোর সমগতির মানটি একই

থাকবে। গতির অপরিবর্তনীয়তা আলোর ক্ষেত্রে সত্য। তবু মহাকর্ষের টানে আলোর শক্তির হেরফের ঘটে, ঘটে সময়ের পরিবর্তন—যা ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের ছকে ধরা দেয়। এ সবই ধরা যাবে আলোর বর্ণালীর সরে যাওয়ার রীতিতে। এই যে ডপলার নীতি ছাড়াও সরে যাওয়া এটি 1897 সালে জেওয়েল (L. F. Jewell) দেখেছিলেন এবং 1909 সালে একই সরে যাওয়া দেখেন ফেব্রি (Fabry) এবং বোসোঁ (Bosson)। তাঁদের পরীক্ষায় পাওয়া বর্ণালীর সরে যাওয়ার মানটি আইনস্টাইনের তত্ত্বে জানানো মানের সঙ্গে মিল টানে। ফেব্রি আর বোসোঁ এই সরে যাবার কারণ ভেবেছিলেন উপরের স্তরের প্রেসারের পরিবর্তন। 1911 সালে আইনস্টাইন তাঁর পেপারে জানালেন আলোর এই ডপলার-অতিরিক্ত সরে যাওয়া মহাকর্ষের আকর্ষণে ঘটে থাকে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রের সঙ্গে আলোর গতির একটা সম্পর্ক আছে—এখানে গতিটির মান এক থাকলেও, অনেক-কিছু ভাঙচুর ভেতরে ভেতরে ঘটে যায় ;—আলোর পথ বাঁকে, তার ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন হয়।

1911 সালে আইনস্টাইন তাঁর পেপারটি প্রকাশ করলেন ; আর তারপর যেন আলোর বাঁক বা তার সরণ নিয়ে তাঁর আর কোনো দুর্ভাবনা নেই। তিনি তাঁর ঘোষণার ফলাফলে স্থির নিশ্চিত হয়ে বসে আছেন যেন। অন্যদিকে বিশেষ তত্ত্বের দেশকালের জরাসন্ধ রূপ যে ত্বরণের জগতেও খাটবে সেটি প্রমাণ করাই তাঁর ধ্যানধারনা। ফোর্সের ফলে গতিতে ত্বরণ জাগে ; কাজেই যা গতিতে প্রযোজ্য তাকে ত্বরণেও পাওয়া যাবে—এই বিশ্বাসটিকে সম্বন্ধ সম্পর্কের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সেই ভাষা গণিত।

সাধারণতত্ত্ব গঠনের কালে আইনস্টাইনের হাতে সামান্য কয়েকটি ক্লু মাত্র—যার একটি হলো মেক্সওয়েলের ফিল্ড—যাকে বিভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেমে একই ভাবে দেখা যায়। অথচ মহাকর্ষের ফিল্ডের ব্যাপার স্যাপার আলাদা। বিশেষ তত্ত্বে জানানো হয়েছে বস্তুর ভর—যা মহাকর্ষ সৃষ্টি করে গতির সঙ্গে তার পরিবর্তন ধরা পড়ে ; যত গতি বাড়ে, ভর বাড়ে। অতএব রেফারেন্স ফ্রেম দূরে কাছে হলে ভরের পরিবর্তনের জন্য মহাকর্ষের ফিল্ডের পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে মেক্সওয়েলের জানানো বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি একটি ভেকটর,—এটি চার্জের চারদিকে তিনমাত্রার স্পেসে কাজ করে। নিউটনের মহাকর্ষের ফোর্সের একটিমাত্র উপাদান ; এটি কাজ করে দুটি বস্তুর কেন্দ্র সংযোগী রেখার দিকে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ বা গ্রেভিটেশনের ফিল্ডটিও দিগ্‌নির্ভর ; তবে এটি কাজ করে দেশকালের চতুর্মাত্রার জগতে। মেক্সওয়েলের চার্জের থেকে অনেক বেশি নির্দেশনা এর। এটি কাজ করে মহাশূন্যের স্পেসে, কাজ করে সময় অনুসারে অথবা সময় অনুযায়ী। সূর্য না থাকলে পৃথিবী মহাশূন্যে ভেসে যাবে প্রায় আট মিনিট পরে ;—নিউটনের জানানো 'তৎক্ষণাৎ' নয়। কারণ সূর্য না থাকার খবরটি পৃথিবী জানে আট মিনিট পরে আলোর গতিবেগের সাপেক্ষে পৃথিবী সূর্যের দূরত্বের মাপ আট মিনিট। আলো হরকরা সূর্য না থাকার খবরটি, মহাকর্ষের আকর্ষণ ভেঙে যাবার সংবাদটি, পৃথিবীকে জানাতে পারে আট মিনিট পর। চতুর্মাত্রার জগতে আইনস্টাইনের ফিল্ড অনেক জটিল ; অনেক তার দিক রেখা ; তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধের

ধারাটিও জটিল। সেই ধারাটিকে গণিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—কারণ গণিত হলো সম্পর্ক-সম্বন্ধ খোঁজার ও বোঝার ভাষা।

তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে দুটি প্রত্যয়ের উপস্থিতির কথা আইনস্টাইন জানালেন—জানালেন সেই এক 1916 সালে। এরা হলো…(i) প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলো যে সব সমীকরণে জানানো যাবে, তারা সব রকম কো-অর্ডিনেট সিস্টেমে একই রূপে থাকবে ; অর্থাৎ তাদের যে ভাবেই রূপান্তরী ফ্রেমে আনা হোক না, রূপান্তরটি ধরা দেবে ফ্রেমের সঙ্গে সহযোগিতার পথে। সহ পরিবর্তনের কো-ভেরিয়েন্ট নিয়মটি শাশ্বত। (ii) ফিজিক্সের নিয়মগুলো এমন হবে যে এগুলো যে কোনো গতি বা মোশনের রেফারেন্স সিস্টেমে প্রযুক্ত হতে পারবে।—এদুটি সত্য বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে প্রমাণিত হয়েছিল। সাধারণ তত্ত্বেও এই দুটি তাদের নিত্যতা বজায় রাখবে। সাধারণ তত্ত্বের আঙিনায় ফিজিক্সের প্রচলিত প্রমাণিত নিয়মগুলি একই রূপে ধরা যাবে এটি তাঁর প্রত্যয়।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনের সময় মিনকোওস্কি দেখেছিলেন, দেশকালের ম্যাপে সমগতিকে সোজা রেখায় দেখানো যায়। যে কোনো দর্শক তাদের সোজাপথে চলা দেখবে। অথচ মহাকর্ষের টানে যে কোনো বস্তুর গতিপথ বাঁকবে বলে ইনারশিয়া ফ্রেম আঁকা যাবে না, আর বিশ্বরেখা, আলোর গতি পথের মত, মহাকর্ষের দিকে বাঁকে। যে কোনো বক্ররেখার ক্ষুদ্রতম অংশে সরলরেখা দেখা দেয়—এটি ইউক্লিডের বক্তব্য। এরই জের টেনে বলা যায়, একমাত্র অবাধ পতনের সীমিত জায়গায় বক্ররেখা যেন সরল কারণ এখানে নেই মহাকর্ষের বোধ। আবার দেশকালের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে একটা না একটা টাইডেল এফেক্ট জেগে ওঠে বলে ত্বরণ পাওয়া যায়। কাজেই অবাধ পতনের সীমিত অংশটুকুকে ঐ বিস্তৃত জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে, লিফটের ভিতরের মানুষটির যে বোধই জাগুক, ওখানেও মহাকর্ষের ত্বরণের প্রভাব কাজ করে চলেছে। এই প্রভাব থাকা মানে সরলরেখা বাঁকে। যত বিস্তৃত জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবাধ পতনের ফ্রেমটিকে দেখা যাবে, তত বেশি বক্রতা নজরে আসবে। এই বিচ্যুতি সব বস্তুতেই দেখা যাবে।—গালিলিও'র সাদৃশ্য নিয়মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আইনস্টাইন বললেন, ভর আর মহাকর্ষের চার্জের যেহেতু মিল আছে, সেহেতু, যে কোনো ভরের পদার্থ হোক না কেন,—পথের বক্রতা সব বস্তুতে সর্বত্র একই ধরণের। এই চিন্তার সূত্র ধরে আইনস্টাইন একটি সিদ্ধান্তে পেঁছোন—মহাকর্ষের ফলে বিশ্বরেখায় বক্রতা দেখা দেয়—এই বক্রতা দেশকালের একটি গুণ। একটি বিশেষত্ব ; এটি আরোপিত নয়। মেটারের উপস্থিতিতে মহাকর্ষের ফিল্ডের প্রভাবে দেশকালও ক্রিয়াশীল হবে।…

মেটারের ক্রিয়া যে দেশকালে হয় এই চিন্তা নিউটনের ধারণার পরিপন্থী—তবে এই চিন্তাতে আইনস্টাইন প্রথম নন। রীমানের তত্ত্ব অনুবাদের সময় অনুবাদক গণিতবিদ ক্লিফোর্ড একটি তত্ত্বের দ্বারে উপস্থিত হন। 1873 সালে তিনি রীমানের পেপারটির অনুবাদ প্রকাশ করেন, On the hypothesis which lie at the bases of Geometry নামে। এর ঠিক তিন বছর পর 1876 সালে তিনি প্রকাশ করেন On the space theory of matter নামে নিবন্ধ—যেখানে ক্লিফোর্ড চারটি উপপত্তির কথা জানালেন। এরা রীমানের তত্ত্বটি অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে। এগুলো হলো :—

(i) স্পেসের যে কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ যেন সমভূমিতে গড়ে ওঠা ঢিপি বা পাহাড়ের মত—যেখানে জ্যামিতির সাধারণ নিয়ম খাটে না।

(ii) সাগরের অসংখ্য ঢেউএর মত স্পেসের যে কোনো অংশের বক্রত্ব ক্রমাগত অন্য অংশে বিস্তৃত হয়।

(iii) স্পেসে বক্রতার সৃষ্টি বা পরিবর্তন বস্তুর গতির সাপেক্ষে গড়ে ওঠে—সে গতি ইথার নামের মাধ্যম অথবা যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটতে পারে।

(iv) এই প্রাকৃতিক জগতে—যেখানে অবিচ্ছিন্নতার নিয়ম প্রযোজ্য সেখানে এই পরিবর্তন ছাড়া অন্য আর কিছু ঘটা সম্ভব নয়!

—ক্লিফোর্ড বস্তুর ক্রিয়া যে স্পেসে হয় তাই জানালেন। অথচ নিউটনের স্পেসের উপর কোনো বস্তু প্রভাব খাটাতে পারে না। রীমানের জ্যামিতি নিউটনের উলটো কথাই জানাচ্ছে। রীমান ও ক্লিফোর্ড এঁরা গণিতবিদ। গণিতের সমাধান প্রাকৃতিক নিয়মটিকে সব সময় জানাতে পারে না—কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম যে সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধারায় গড়ে ওঠে—সে ধারাটি প্রকাশের ভাষা গণিত হলেও এখানে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বোধটি নিখুঁত করে চিনতে না পারলে গণিত শুদ্ধ হলেও গণিতে পাওয়া উত্তরে ভুল থাকতে পারে। আইনস্টাইন সম্পর্ক সম্বন্ধের নিয়ম কটিকে চিনতে চাইলেন।

সমতল পৃষ্ঠে পৃথিবীর ম্যাপ আঁকলে মাপজোঁকে খুঁত দেখা দেয়। গ্রীনল্যাণ্ড বা এণ্টারটিকার আয়তন বিরাট-বিশাল হয়ে হাজির হয় এখানে। এর কারণ হলো ভূপৃষ্ঠ গোলাকার। গোলাকার গ্লোবে ম্যাপটি আঁকলে এই ত্রুটি দেখা দেয় না। অন্যদিকে সমতল পৃষ্ঠে আঁকা সরলরেখা গ্লোবে বক্ররেখা বা বৃত্তাকারে দেখা দেয়। কাজেই যাকে বলা হচ্ছে সরলরেখার বিচ্যুতি সেটি হবার কারণ দেশকাল সমতল বা ফ্ল্যাট নয়—এটি বক্র।

সমতল পৃষ্ঠের উপর যে জ্যামিতি গড়ে উঠেছে—সেটি আমাদের চেনাজানা ইউক্লিডের জ্যামিতি। বক্র পৃষ্ঠের উপরেও জ্যামিতি গড়ে উঠেছে—এরা নন-ইউক্লিড জ্যামিতি। বাঁক দু'রকমের হতে পারে—গ্লোবের মত যার বাঁকটি ভিতরের দিকে অথবা ঘোরার জিন বা বাটির মত যার বাঁক বাইরের দিকে। ভিতরের বাঁক নিয়ে গড়ে উঠেছে রীমানের জ্যামিতি আর বাইরের বাঁক নিয়ে সৃষ্টি বোলাঈ-লোবোচিওস্কির জ্যামিতি। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল 180°—এই ত্রিভুজ সমতল পৃষ্ঠে আঁকা। অথচ বাঁকা পৃষ্ঠে আঁকা ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল 180° পাওয়া যায় না। রীমানের জগতে ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল সব সময় 180°-র বেশি আর বোলাঈ-লোবোচিওস্কি'র জগতে এই মাপ হলো 180°-র কম।

মিনকোওস্কি দেশকালের যে জ্যামিতিক গণিতের ছক দিয়েছিলেন সেখানে রীমানের বক্রতার ইঙ্গিত যেন উঁকি মারে। এই ইঙ্গিতটিকে দিশারী করে আইনস্টাইন রীমানের জ্যামিতির দ্বারে হাজির হন। 1907-08 সালে মিনকোওস্কি দেশকালের তত্ত্বটি প্রচার করেন, তিনি মারা যান 1909 সালে 45 বছর বয়সে। এই 1909 সালে আইনস্টাইন মিনকোওস্কি'র জরাসন্ধ রূপটি মেনে নেন। আর তারপরই, শোনা যায়, রীমানের জ্যামিতির চর্চাটি সিরিয়াসলি করতে থাকেন।

রীমানের জ্যামিতির জগতে সরলরেখা হলো বক্ররেখার অতি ক্ষুদ্রাংশ—নইলে সরলরেখা বলে কিছুই নেই, আছে বৃত্তরেখা। সরলরেখার সংজ্ঞা এখানে দুটি বিন্দুর ক্ষুদ্রতম সংযোগী রেখা। এই রেখা গ্লোবে আঁকলে এটি বৃত্তের অংশ—একটি বক্ররেখা। একই ধরনের চিন্তা বিশ্বলোকের আকার নিয়ে ভাবনার সময় পোআঁকার করেছিলেন। তবে তাঁর জ্যামিতি হলো বোলাঈ-লোবোচিওস্কির সৃষ্টি—যেখানে ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল দুই সমকোণের চেয়ে ছোট! আর তাঁর জগৎ কেন যে বক্র সে ধারণার ব্যাখ্যা নেই। তাঁর জগতে স্পেস ক্রিয়াহীন এবং কোনো মেটার বা বস্তু স্পেসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অথচ রীমানের পেপারে তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগে স্পেসের ক্রিয়ার চিন্তা থাকে। রীমান আশা করেন, এই চিন্তা বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যার শাখায় স্থান পেতে পারে। আর রীমানের উত্তরসূরী ক্লিফোর্ডের ধারণায় স্পেসের বক্রতার পরিবর্তন ঘটে **Motion of matter** অথবা বস্তুর গতির ক্রিয়ার। আরো একটি চিন্তার শুরু হয়। রীমানের গণিতে বহু দিগ্‌নির্দেশনা, বহু পরিমাণের ছক। এদের গাণিতিক ছক জানা—এখানে কাজ করে এবসল্যুট কেলকুলাস। আইনস্টাইনের কাছে 1909 সালে রীমানের জ্যামিতিটি বেছে নেয়া, মনে হয়, সহজ আর স্বাভাবিক!

এই সময়ে তিনি তাঁর তত্ত্বে রীমানীয় জ্যামিতির পরিমণ্ডলে মহাকর্ষের তথ্যগুলি সাজাতে বসেছিলেন। তাঁর চিন্তায় একটি ইঙ্গিত শুধু ছিল—মহাকর্ষের কাছে দেশকাল সমতল নয়, বক্র। অবাধ পতিত যে কোনো বস্তু এই বক্রতলে সোজাই নামবে; তবু দেশকালের বক্রতার জন্য এটির পথ বাঁকা। মহাকর্ষ নেই মানে দেশকালের বক্রতা নেই।

তাঁর গতিবিজ্ঞানে নিউটন ত্বরণের কারণ খুঁজতে চেয়েছিলেন; সমগতি তাঁর কাছে কোনো প্রশ্ন ছিল না। ঠিক সেই ভাবে ইনারশিয়াল গতি বা জাড্য ভাঙার গতিটিকে তিনি স্বাভাবিক ভাবে ধরেছিলেন—তার কোনো প্রমাণ বা ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এগুলি নিউটনের গতি বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধান্ত। আইনস্টাইন কিন্তু ভিন্ন চিন্তা করেন। মহাকর্ষ তাঁর কাছে কোনো সমস্যা নয়; অন্যদিকে পতনশীল বস্তুর গতিকে তিনি স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিলেন। আপেল পড়বে—কারণ দেশকালের বক্র পথে সে যাত্রা করেছে। প্রশ্ন উঠবে—পড়ার পর কি হবে? আপেল পড়লে একটি অমহাকর্ষ শক্তি দেশকালের স্বাভাবিকতা ভেঙে দিবে। যেমন স্থির জলে ঢিল ফেললে জলে আলোড়ন জাগে, তার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়,—তেমনি কোনো বস্তুর পতন ঘটলে দেশকালের স্বাভাবিক বক্রতা ভেঙে যায়।—পৃথিবী কক্ষ পথে ঘোরে কারণ সে সূর্যের চারদিকের দেশকালের বক্রপথে চলেছে; তার পথ সেজন্য বাঁকা—এটি সোজা নয়।

মহাকর্ষের পরিচয় তিনি জ্যামিতিতে জানালেন। সেই পরিচয়টিকে গণিতের সমাধানে বাঁধতে চাইলেন;—আর এই রূপটান দিবার সূক্ষ্মতম রেখাগুলির চিন্তাও তিনি মনে মনে ছকে নিলেন। তাঁর মহাকর্ষ গণিতে থাকবে ছোট মহাকর্ষ শক্তি, ছোট গতি—কারণ এগুলি নিউটনের উপপত্তি; এরা ছোট জগতে দিব্বি কাজ করে। তাছাড়া দুর্বল মহাকর্ষ শক্তিক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বিশেষতত্ত্ব ঠাঁই পাবে। বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ সমগতির তত্ত্ব—সেখানে দেশকালের বক্রতা স্পষ্ট নয়;—সেখানে মহাকর্ষ দুর্বল, অথবা নেই।

নিউটনের নিয়মে জানা যায় ভর থাকলে মহাকর্ষ জাগে। অন্যদিকে আইনস্টাইনের বিশেষ তত্ত্বে জানানো হয়েছে শক্তি ভরের সাদৃশ্যকল্পনা : $E=mc^2$ ॥ নিউটনের মোমেণ্টাম বা ভরবেগ গতির জগতে একটি যুগ্মবন্ধনের কল্পনা। এই ভরবেগ বা মোমেণ্টাম জানায় মেকানিকেল স্ট্রেস ও প্রেসার। সুতরাং আইনস্টাইনের গড়া সাধারণ তত্ত্বে দুর্বল মহাকর্ষ অংশে পাওয়া যাবে মোমেণ্টাম এবং তার উপস্থিতিতে গড়ে ওঠা মেকানিকেল স্ট্রেস আর প্রেসার। এককথায় আইনস্টাইনের তত্ত্বের একটি অংশে নিউটন তাঁর সনাতন বিজ্ঞানের সব গ্রহণযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে থাকবেন। সাধারণ তত্ত্বের আসন্ন ফল রূপে পাওয়া যাবে সনাতন বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নিউটনের গতিবিজ্ঞান ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। পুরনো জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আইনস্টাইন দেশকালের বক্রতার জ্যামিতিক ছকে ঢেলে সাজালেন—আর এই বক্রতা যেন চেনাজানা নিত্য প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গুণের উপর একই ভাবে নির্ভরশীল। নিউটনের জড়বিজ্ঞানে গড়া প্রাকৃতিক বা ফিজিকেল প্রবাহ আর তাঁর নিজস্ব জ্যামিতি-চিন্তাধারা – দুটিকে একই মঙ্গলঘটে নৈবেদ্যে নিবেদন করলেন—পাওয়া গেল তাঁর সুবিখ্যাত ফিল্ড ইকুয়েশনগুলি। এই সমীকরণগুলি থেকে জানা গেল স্ট্রেস, মোমেণ্টাম. প্রেসার ইত্যাদি তাদের প্রতিবেশী স্পেসের বুনোটের উপর কেমন করে ক্রিয়ার ছলে বিকৃতি আনে। এই তত্ত্ব—যাকে তিনি বললেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ—তা পাওয়া গেল 1915 সালে।

1916 সালে তাঁর লেখা নিবন্ধে এই তত্ত্বটির শৃংখলটিকে, ক্রমটিকে তিনি জানালেন।...

আইনস্টাইনের শিক্ষাগুরু আর্নস্টমাক নিউটনের সেণ্ট্রিফুগাল ফোর্সের কারণ হিসেবে বললেন, দূরের জগতের সব বস্তুর ক্রিয়ায় এটি ঘটে থাকে। এই ফোর্স—যা দূরের জগতের বস্তুর ক্রিয়ায় ঘটে—আইনস্টাইনের কাছে সেটি যেন মহাকর্ষের এক অন্যরূপ বলে মনে হয়। মহাকর্ষ হলো যে কোন বস্তুর দূরজগতে একমাত্র ক্রিয়া—যা মহাবিশ্বে ঘটে থাকে। গালিলিও তাঁর সাদৃশ্য নিয়মে ইনারশিয়াল মাস আর গ্রেভিটেশনাল চার্জে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। আইনস্টাইনের কাছে সেই সাদৃশ্যই ধরা পড়ে॥ সেণ্ট্রিফুগাল ফোর্সে গড়ে ওঠা ইনারশিয়াল মাস আর মহাকর্ষের মাসে মিল থাকে :

$\frac{mi}{mg}$ সর্বত্র সর্বদা একই মান জানাবে। 1890 সালে ব্যারণ রোল্যাণ্ড ইউটভুস একটি পরীক্ষার ফলে এ দুটি মাসের সদৃশতা প্রমাণ করেছিলেন। গালিলিওর সাদৃশ্যতত্ত্ব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মূলনীতি। আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্বের চিন্তাসোপানের প্রথমধাপে থাকে এই তত্ত্ব। যে কোনো পার্থিব বস্তুর মহাকর্ষ জনিত ফোর্স ($Fg=mg$) এবং ইনারশিয়াল ফোর্স ($Fi=m_1Rw^2 \cos\theta$:—যেখানে R হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, w এঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি এবং θ জানায় ল্যাটিটুড)—এক।

এই দুটি ফোর্সের সাদৃশ্য মেনে আইনস্টাইনের নিজস্ব সদৃশ চিন্তাটির ধারণা জাগে। পৃথিবীর বুকে ইনারশিয়া ও মহাকর্ষ ফোর্সদ্বয়ের অনুপাত জানায় মান 'এক'। একটি নির্দিষ্ট পরিসীমায় দুটি ফোর্স এক—যাদের একটি মহাকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে আর দ্বিতীয়টি ত্বরণের ছকে সাজানো ; এরই পরিপ্রেক্ষিতে 1911 সালে আইনস্টাইন

তাঁর নিজস্ব হাইপথিসিস বা উপপত্তিটি জানালেন—একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা বা চৌহদ্দিতে মহাকর্ষের এফেক্ট এবং একসিলারেটেড বা ত্বরণ সম্পর্কীয় ফ্রেমের ক্রিয়াকলাপে কোনো ভিন্ন ধারণার বোধ জাগে না,—এদের বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না,—এরা এক। এটিই হলো আইনস্টাইনের প্রিন্সিপ্‌ল অফ ইকুইভেলেন্স অথবা সাদৃশ্য নীতি। লিফটের চিন্তাসূত্রে তাঁর উপপত্তির ব্যাখ্যা জানানো হলো। তাঁর উপপত্তির ফলে জানা যায় মহাকর্ষভর আর ইনারশিয়াল ভর বস্তুর কাছে পরিমাণে এক—অথবা এই দুটি ভরের অনুপাতে জানা যায় যে রাশি সেটি 'এক'। এখন পর্যন্ত যত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তার ফলাফল থেকে এই ঘোষণার কোনো ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় ধরা পড়েনি।

দুটি ফোর্সের ফলাফল সীমিত অঞ্চলে এক; আপেক্ষিকতার জগতে এই দুই ফোর্সের সার্বিক মিল টানা যায়, দেখা যায়। ত্বরণের ফলে গতিপথের বক্রতা দেখা দেয়—এটি নিউটনের তত্ত্ব। মহাকর্ষের ফলেও বক্রতা দেখা দিবে। বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদে গতির ফলে সময়ের সঙ্কোচন বা হ্রাস ঘটে। মহাকর্ষের টানে বস্তুর গতিপথ যে শুধু বাঁকে তা নয়, তার গতির ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়। বহুদূর পথে আসার সময় শক্তি হ্রাসের জন্য আলোর তরঙ্গ ফ্রিকোয়েন্সি প্রভেদ ঘটে—এটি ঘটে ডপলারের নিয়ম মোতাবেক। এ ছাড়াও ফ্রিকোয়েন্সি কমবে—কমবে মহাকর্ষের টানে,—যে টান যে কোনো বস্তুর গতিপথকে বাঁকিয়ে দেয়,—গতি শক্তিকে কমিয়ে তোলে। এই হ্রাস খুবই কম; এটি $1/c^2$ রাশির উপর নির্ভর করে। তবু সময়ের এই হ্রাসটিকে তুচ্ছ করা যায় না। আলোর বর্ণালী রেখা লালের দিকে সরে যায়,—এই সরে যাওয়া ডপলারের নিয়মের অতিরিক্ত প্রাপ্তি। ডপলারের নিয়ম অনুযায়ী সরে যাওয়া অনেক বেশি—সেখানে আইনস্টাইনীয় খরচ কম। তবু সে যে থাকে রেবকা পাউন্ডের পরীক্ষাতে জানা যায়। জানা যায় $\triangle\nu exp/\triangle\nu theo = 0{\cdot}999 + {\cdot}0076$; অর্থাৎ পরীক্ষা-ভিত্তিক ফলাফল ও গণিতের ছকে জানানো প্রাগুক্তির তফাত নেই।

1911 সালে জানানো আলোর গতি পথের বাঁকার তত্ত্বটি ক্লাসিকেল সায়েন্সের চিন্তার বিপরীত। ফার্মেট জানিয়েছেন ইউক্লিডের জ্যামিতিক জগতে আলোর গতিপথ সোজা, সর্বদা সোজা। এই তত্ত্ব নিউটনের আলোর জ্যামিতি ভাবনায় আছে। অথচ আইনস্টাইনের তত্ত্বে আলোর মহিমা খর্ব হয়। মহাপ্রতাপান্বিত মর্যাদাবান আলো তার সিধে পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যায়। এই পথের বক্রতা খুবই অল্প। একটি উপরে ওঠা লিফটের সাপেক্ষে আলোর গতি পথে যে বাঁকটুকু দেখা যায় গণিতের ছকে তাকে $\Delta\nu\frac{ax^2}{2c^2}$; যেখানে $\triangle\nu$ জানায় গতি পথের বাঁক, x ও a হলো যথাক্রমে লিফটের প্রস্থ ও একসিলারেশন আর c হলো আলোর গতি। যদি ধরা হয় এই ত্বরণ আর পার্থিব মহাকর্ষের মান এক আর x যদি হয় 1000 মিটার তবে আলোর গতিপথের বক্রতা বা ডিফ্লেকশনটুকু হলো মাত্র 10^{-10} মিটার বা এক আঙ্গস্টর্ম ইউনিট। বক্রতার এই মানটি ছোট হলেও, মহাবিশ্বলোকে, বড় বড় নক্ষত্রের জগতে আলোর পথের বক্রতাকে আর তুচ্ছ করা যায় না।

আলোর পথের চিন্তায় জাগে স্পেসের চিন্তা—যে স্পেসে গতি নিয়ে আলো যায়। মহাকর্ষের টানে স্পেসে আলোর গতিপথ বাঁকে—এটি অন্যভাবে বলা যায়। কনভেক্স বা কনকেভ মিরারে একটি বস্তুর প্রতিবিম্ব বিকৃত দেখা দেয়; বস্তুটির আকৃতির বিকৃতির কারণ মিরারের গঠনের অস্বাভাবিকতা। সেই ভাবে বলা যায়, মহাকর্ষের টানে আলোর পথ বাঁকা—তার কারণ মহাকর্ষের ফলে স্পেসে বক্রীভাব জেগে ওঠে; সেই বক্রী স্পেসে আলো সরলরেখায় গেলেও তার পথকে বাঁকা বলে মনে হবে। এক কথায়, মহাকর্ষের কাছে স্পেসের ইউক্লিডিয় রূপ পালটায়; যা ধরা পড়ে তা স্পেসের নন ইউক্লিডিয় আকৃতি।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে লরেন্সীয় রূপান্তরী ফ্রেমের যে চেহারা মিনকোওস্কি জানিয়েছিলেন তা হলো $ds^2 = dx_1{}^2 + dx_2{}^2 + dx_3{}^2 + dx_4{}^2 = \alpha_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$: যেখানে $\mu, \nu = 1, 2, 3, 4$ এবং এরই ব্যাপ্তি ঘটিয়ে জানালেন :

$$g_{\mu\nu} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

মিনকোওস্কির স্পেস ইভেন্ট নিয়ে গড়ে ওঠে—এখানে যে কোনো স্পেসিয় বিন্দু জানাবে ইভেন্ট। তাছাড়া মিনকোওস্কির গণিতে একটা নতুন নীতি জানা যায়—তার স্পেসে দুটি বিন্দুর সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখাটি সরলরেখা নয়—এটি বৃহত্তম রেখা।

এই বৃহত্তম রেখা—যাকে বলা হয় বিশ্বরেখা বা জিওডেসিক্স (Geodesics) তার সঙ্গে আলোর গতি পথের একটি সম্পর্ক আছে। ফার্মেট গ্রেট সার্কল বা মহাবৃত্ত রেখার সংজ্ঞায় জানিয়েছিলেন—গ্রেট সার্কল হলো সেই বৃত্ত যার কেন্দ্রটি স্ফিয়ারের কেন্দ্রে সংহত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফার্মেটের সংজ্ঞার বিস্তৃতি ঘটিয়ে জানানো হয় প্রতিবেশী গতি পথের সাপেক্ষে একটি ইভেন্ট থেকে আরেকটি ইভেন্টে যে আলো রেখা যায় তার যাত্রাকালটি বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, অথবা পরিবর্তনহীন কিংবা শূন্য হতে পারে। আইনস্টাইন এই উপপত্তির উদ্ধৃতি দিয়ে জানালেন সব জিওডেসিক্স আলোর রেখা নয়, তবে আলোর পথ রেখা সব সময়েই জিওডেসিক্স। এক কথায় মহাবিশ্বে আলোর পথরেখা বক্রী।

চেনা জানা নন ইউক্লিডিয় কার্ভ বা বক্রী স্পেস হলো স্ফিয়ারের দ্বিমাত্রিক সার্ফেস —যেখানে আমরা বাস করি। এই সার্ফেসের দুটি বিন্দুর সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম রেখাটি হলো গ্রেট সার্কলের আর্ক (Arc)। দ্বিমাত্রিক সমতল স্পেসে গড়ে তোলা ত্রিভুজের সন্নিহিত কোণের পরিমাণ হলো π বা 180°। অন্যদিকে গ্রেট সার্কলে গড়ে ওঠা ত্রিভুজের সন্নিহিত কোণের পরিমাণ হলো π এর চেয়ে বড় কিন্তু $\frac{3}{2}\pi$ এর চেয়ে ছোট। জ্যামিতির যে রীতিতে এ জাতীয় ননইউক্লিডিয় স্পেস পাওয়া যায় তা রীমানের সৃষ্টি—এরই ইঙ্গিত মিনকোওস্কির গণিতে। স্বাভাবিক ভাবে রীমানের দ্বারে হাজির হন আইনস্টাইন।

ম্যাক্সওয়েলের ফিল্ড থেকে তাঁর মহাকর্ষ ফিল্ড অনেক জটিল। অনেক তার উপকরণ—

অনেক গতি, অনেক ত্বরণ, অনেক দিক নির্দেশনা। এই কারণে তাঁর গণিতে টেনসারের নানা শাখা উপশাখার প্রয়োগ করলেন। ক্রিস্টোফেলের গণিতের ছকের ব্যবহার তিনি শুরু করেন 1909 সালে। তারপর প্রাচুর চর্চা করেন রিক্কি (Ricki) ও লিভি-সিভিটার (Levi-civitar) এবসল্যুট কেলকুলাস। গণিতের নানা শাখা উপশাখা আত্মস্থ করে তিনি তাঁর ফিল্ড ইক্যুয়েশনগুলির সমাধান করলেন। 1916 সালে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত পেপারটিতে তিনি এইসব পদ্ধতি প্রণালীর ব্যাখ্যা করলেন, পরিবেশন করলেন—যার ফলে গণিতের এই শাখাগুলি সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়। তবু তাঁর ফিল্ড ইক্যুয়েশন যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার সমাধান পদ্ধতি। সৃষ্টির প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও এগুলির সহজ সরল সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং পাওয়া যায়নি সবকটি সমাধানের বিকল্প সুষ্ঠু ও সঠিক পদ্ধতি।

অথচ 1916 সালে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের থিসিসটি প্রকাশের অব্যবহিত পরে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সুয়াৎর্সচিল্ড (Schuarzcchild) আইনস্টাইনের ফিল্ডের একটি বিশেষ অবস্থার সমাধান খুব সহজেই পেলেন। একটি স্ফেরিকেল বস্তুর চারদিকে শূন্য স্পেস—এই কল্পনাটি সৌর জগতের মডেলে বেশ খাটে। এই মডেলের কেন্দ্রে থাকে সূর্য এবং কাছাকাছি শূন্য স্পেসে থাকে গ্রহ উপগ্রহ এবং তাদের পথপরিক্রমা। এইসব গ্রহদের মহাকর্ষের প্রভাব সামান্য তুচ্ছ বলে সুয়াৎর্সচিল্ড তাঁর সমীকরণ থেকে এদের বাদ দিলেন।

আইনস্টাইনের সাধারণ সমীকরণটি হলো : $R_{\mu v}-\frac{1}{2}g_{\mu v}R+\wedge g_{\mu v}=\frac{8\mu G}{C^4}T_{\mu v}=KT_{\mu v}$ ‖ এখানে G জানায় মহাকর্ষের ধ্রুবক যার মান হলো $6{\cdot}67\times10^{-11}Nm^2Kg^{-2}$; $\wedge$ বা ল্যামডা হলো কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট। নিউটন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বে এই জাতীয় কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট-এর কথা ভেবেছিলেন যাতে তাঁর গড়া স্পেসটি স্থির থাকে। এই $\wedge$ নামক ব্রেকটি মহাকর্ষের ফলে স্পেসে বস্তুদের দ্রুতধাবমানতাটিকে থামিয়ে রাখে। আইনস্টাইনের তত্ত্বেও এই $\wedge$ এল ; তার কারণ, সেকালীন মহাকাশ গবেষণায় জানা গেছে গেলাক্সির জগৎ স্থির। g= জানায় কার্ভেচার বা বক্রী পৃষ্ঠের টেনসারটিকে। তাঁর সমীকরণের K হলো একটি ধ্রুব রাশি যার মান $\frac{8\pi G}{C^4}$ এবং সমীকরণটির বাঁদিকের রাশি $KT_{\mu v}$ জানায় নিউটনের স্ট্রেস-এনার্জি মোমেন্টামের ক্রিয়াকলাপ আর বাঁদিকের রাশি জানায় জ্যামিতিক ফোর্স যা গ্রেভিটেশনের জন্য স্পেসে বক্রতা বোঝাবে।

সুয়াৎর্সচিল্ড বিশেষ অবস্থানের জন্য যে সমীকরণটি পেলেন, সেটি হলো ;
$ds^2=Tdt^2-r^2\ (\ d\theta+Sin^2\theta d\theta\ )-\frac{dr^2}{T}$ যেখানে T জানায় $\left[1-\frac{2\,GM}{C^2r}\right]$ সুয়াৎর্সচিল্ডের সমীকরণে আইনস্টাইনের স্পেসের সমীকরণের কো-এফিসিয়েন্ট চিহ্নগুলি থাকে ; সেই −1, 1, 1, 1 অথবা +1, −1, −1, −1 চিহ্নেরা। তাঁর গণিতে M হলো মাস, r জানায় দূরত্ব। এই M যখন শূন্য তখন পাওয়া যায় মিনকোওস্কির স্পেস।

এই গণিতের ছক থেকে জানা গেল বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের কক্ষের আকার। এমনকি একই গণিতের প্রয়োগে জানা যায় মার্কারি গ্রহের অনুসুর গতির গোলমালের কারণ।

গ্রহদের কক্ষ উপবৃত্তাকার—এটি কেপলেরের চিন্তা। নিউটন তাঁর গতিবিজ্ঞানের সমাধানে এই উপবৃত্তাকার কক্ষটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আইনস্টাইন-সুয়াৎসচিল্ডের গণিতে জানা যায় গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার ঠিকই, তবে সেই উপবৃত্ত পথ নিজের অবস্থানে ধীরে ধীরে ঘুরপাক খায়। ফলে আদি পথে গ্রহটির ফিরে আসতে বহু সময় লাগে। মার্কারি গ্রহ সূর্যের একেবারে নিকটতম বলে মহাকর্ষের টানে এটির কক্ষপথে ঘুরপাক দিবার বেগটি বেশি—প্রতি একশ বছরে আর্কের মাপে 43 সেকেন্ড। আইন-স্টাইন-সুয়াৎসচিল্ডের গণিতে এই মানটি খুঁজে পাবার পর মার্কারি গ্রহের অনুসুর গতির গোলমাল, যেটি জানিয়েছিল 43 সেকেন্ড, সেই গোলমাল আর সমস্যা হয়ে রইল না।

অন্যদিকে এই সমাধানটি আইনস্টাইনের একটি প্রচেষ্টা বা ইচ্ছাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মাকের ঘূর্ণ্যমান গতির তত্ত্বটি সাধারণ তত্ত্বে বাঁধতে চেয়েছিলেন আইন-স্টাইন। তাঁর ধারণা ছিল তাঁর তত্ত্বটি মাকের উপপত্তির একটি সুবোধ্য প্রমাণ দিতে পারবে। অথচ সুয়াৎসচিল্ডের সমাধানে জানা যায় গ্রহদের কক্ষপথটিও ঘূর্ণ্যমান—আর এই সমাধান দূরের নক্ষত্রের রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষেও জানা যায়; ঐ তারকার কোনো প্রভাব কিন্তু গণিতের ছকে নেই। এই গোলমেলে ধারণাটি আইনস্টাইনের চিন্তায় ছিল না। সুতরাং আইনস্টাইনের হাতে আরো একটি কাজ জুটে গেল—সাধারণ তত্ত্বের কাঠামোয় মাকের তত্ত্বটির ঠাঁই খোঁজা। এই কাজে পরবর্তীকালে তাঁর সারাজীবন কেটে গেল। মাকের ঠাঁই তবু মিলল না!

আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে সুয়াৎসচিল্ড আরো একটি উপপত্তি জানালেন। একটি আলোর ফোটন কণার মেকানিকেল ফ্রিকোয়েন্সি তার এনার্জি E'র আনুপাতিক হারে জানা যায়—প্লাঙ্ক আইনস্টাইনের তত্ত্বে এটি $E=h\nu$ অথবা $E=h\frac{c}{\lambda}$, আবার আইনস্টাইনের তত্ত্বে এই E এনার্জির একটি সহযোগী ভর থাকবে, কারণ $E=mc^2$; বড় কোনো ভর বা মাস M এর কাছে এই ফোটন কণা এলে তার উপর যে ফোর্স কাজ করে তা নিউটনের মহাকর্ষ গণিত থেকে জানা যায় $F=\frac{GMm}{r^2}$। এই ফোটন কণা যদি r দূরত্ব থেকে অনেক দূরে এই বড় বস্তুর মহাকর্ষের বন্ধন ছেড়ে চলে যেতে চায় তবে তার শক্তি হ্রাস হবে; এই শক্তি হ্রাসের হার $\frac{GMm}{r}$। এটি এনার্জি ক্ষয়ের ভগ্নাংশের হার। অতএব ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষয়ের হার হবে $\frac{GM}{rc^2}$। আলোর ফ্রিকোয়েন্সিকে আইনস্টাইন সময়ের প্রতিনিধি অথবা বিস্তারিত অর্থে প্রতিরূপ জানিয়েছেন; এটি সময়ের ঘড়ি। যদি ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায় ঘড়ি স্লো যাবে। অর্থাৎ মহাকর্ষের টানে সময় ধীরে যাবে। দৃশ্যবর্ণালীর ফ্রিকোয়েন্সি ডপলারের নিয়ম মত মহাকর্ষের টানে

সরে লালের দিকে যায়। এখন ঐ r এর মান যদি GM/c^2 এর কাছাকাছি হয় তবে ঐ হ্রাস এত বেড়ে যায় যে ভগ্নাংশটি তখন সম্পূর্ণ সংখ্যা জানায়।

স্যুয়াৎর্সচিল্ডের গণিতে আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী এই r এর মান GM/c^2 নয়, এটি $\frac{2GM}{c^2}$ । অর্থাৎ এটি দ্বিগুণ। ঠিক একইভাবে মহাকর্ষের টানে আলোর গতি পথের বাঁকের যে হিসেব স্যুয়াৎর্সচিল্ডের গণিত থেকে পাওয়া যায় সেটিও সনাতনী রীতি থেকে আলাদা। নিউটনের তত্ত্বের সাপেক্ষে আলোর গতিপথের বাঁকের একটি ইঙ্গিত লাপ্লাসের ব্যাখ্যায় ছিল। স্যুয়াৎর্সচিল্ডের হিসেব মত আলোর বাঁকের মানটি লাপ্লাসের সমীকরণ থেকে পাওয়া মানের দ্বিগুণ।

r এর মানটি আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী স্থির করে স্যুয়াৎর্সচিল্ড জানালেন যে ঐ r যখন $\frac{2GM}{c^2}$ এর সমান হয় তখন সময়ের হ্রাস বা ফ্রিকোয়েন্সির হ্রাস সবচেয়ে বেশি হবে। হ্রাস এত বেশি হবে যে মনে হবে ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষয় পেয়ে লোপ পেয়ে গেছে। মনে হবে আলোর গতি নেই, আলো গতি হারা! এই ব্যাসার্ধ r টিকে বলা হয় স্যুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধ আর আপেক্ষিকতাবাদের গণিতে একে জানানো হয় r_s হিসেবে। —স্যুয়াৎর্সচিল্ড একটি ব্যাসার্ধ জানালেন। সেই ব্যাসার্ধে গড়ে ওঠা স্ফেরিকেল বস্তুর মাস যা হবে তার আকর্ষণ শক্তি এত বেশি যে আলোর ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, অতি ভরের বস্তু, যেমন সূর্য, তার কাছ দিয়ে যাবার সময় আলোর পথ বাঁকে—যে বাঁকার পথটি মেপেছিলেন এডিংটন। এই বাঁক বেশ কম, কারণ সূর্য আমাদের জগতে প্রবল প্রতিপাত্তিত হলেও তারকার রাজ্যে সে খুবই ছোট মাপের। তার আকার ছোট, ভরও কম। মহাবিশ্বে যদি কোনো তারা থাকে, যার ভর সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি তবে তার কাছাকাছি আলোর পথের বাঁক বেশি হবে; তাকে ছেড়ে যাবার কালে আলোর ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে। ভারি ভরের আকর্ষণ ছেড়ে যেতে গেলে শক্তি ক্ষয় হয়, ফ্রিকোয়েন্সি কমে, পথ বাঁকে। এ যেন একজন দ্রুত দৌড়বাজকে হঠাৎ টান দিয়ে আটকাবার চেষ্টা। টান ছাড়িয়ে দৌড়বাজটি যাবার কালে কিছুটা বাড়তি শক্তি ক্ষয় করে, দৌড়টা তত দ্রুত তখন থাকেনা আর তার পায়ের ছন্দে তফাত ঘটে এবং হয়তো বা সে তার সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়।—অন্য ভাবে দেখা যায় ভারি ভরের তারকার আকার, সাধারণত বড়। এখন তাদের আকারটি ছোট করে, ব্যাসার্ধটি কমাতে কমাতে যদি স্যুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধে নামানো যায় তবে কি ঘটতে পারে? সমস্ত ভর ঐ ছোট $\frac{2GM}{c^2}$ ব্যাসার্ধে জমা হবে। আগের আর পরের তারকার ভর এক, অথচ আকারে তফাত। স্যুয়াৎর্সচিল্ড বললেন এই অবস্থায় ঐ মহাভর ছোট তারকার কাছাকাছি জায়গায় দেশকালের বক্রতা অনেক বেড়ে যাবে। ছোট আকারে বেশি ভর জমা হবার জন্য আকর্ষণের টান অনেক বেশি হবে।—কোয়ান্টা রীতি বা নিউটনীয় গণিতে এই মান আরো ছোট এটি $\frac{GM}{c^2}$;—এই মান 1796 সালে গণিতবিদ পিয়ের লাপ্লাস পেয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, এটি হলো এমন দূরত্বের

অর্ধেক যেখানে, যে কোনো ভরের সাপেক্ষে, নিউটনীয় মুক্তগতি (Escape velocity) আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে আইনস্টাইন জানিয়েছেন আলোর চেয়ে বেশি গতি কারো থাকতে পারেনা। অতএব এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই আকারের ভারি ভরের কাছে আলোর বাঁক এত বেশি হতে পারে যে আলো তার গতি বেগ হারাতে পারে ; মহাকর্ষের প্রচণ্ডতম টানটি পার হয়ে সে ছুটে যেতে পারবে না।

সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধ $\frac{2GM}{C^2}$ —এ কোনো একটি রাশি বসিয়ে দেখা যায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দাঁড়ায় কয়েক সেন্টিমিটার, সূর্যের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় এক কিলোমিটার। এই ছোট আকারের ভারি ভরের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকর্ষ অনেক বেড়ে যায়।

1796 সালে নিউটনের মহাকর্ষবাদ অনুসরণ করে লাপ্লাস জানিয়েছিলেন যে মহাবিশ্বে এমন কিছু ভারি ভরের অথবা মহাভরের বস্তু থাকতে পারে যাদের আকর্ষণে কোনো আলো তার টান ছেড়ে যেতে পারবে না। তরঙ্গের বিস্তৃতি এইসব ঘন সন্নিবদ্ধ মহাভরে আকর্ষণের অঞ্চলের কাছে অসীম হয়ে দাঁড়ায়—যেন বিচি বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গ হঠাৎ তুষারে জমে আছে। আলোর তরঙ্গ নেই বলে বস্তু কালো দেখাবে। লাপ্লাস এই সব বস্তুর নাম দিয়েছিলেন ফ্রোজেন বা তুষার ঘনীভূত তারকা। অন্যদিকে সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধে যদি কোনো মোটামুটি বড়সর ভরের তারা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, তবে সেখানেও ফলাফল এক ; কোনো আলো সেই তারকা থেকে বেড়িয়ে আসে না, কোনো আলো দেখা যায় না, কোনো ঘটনা ঘটার সংবাদ জানা যায় না। তারকাটি কালো দেখায়—এদের বলা হলো ব্ল্যাক হোল। লা প্লাসের ফ্রোজেন তারা শীতল বলে কালো ; আর ব্ল্যাক হোল আলো হীন বলে কালো।

1911 সাল নাগাদ আইনস্টাইন জানিয়েছিলেন যে আলোর পথ মহাকর্ষের টানে বাঁকে। ধরা যাক কোনো বড় ভরের তারা সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধে সঙ্কুচিত হয়ে আছে। দূর থেকে আলো যখন এই সঙ্কুচিত তারকার কাছে আসে তখন সে আসে তার তরঙ্গভঙ্গীটি বজায় রেখে। যতই সে তারকাটির কাছে আসে ততই যেন তারকাটির কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়ে পড়ে। সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্যাসার্ধের মাপের গোলাকার বস্তুটির পরিসীমার কাছে আলো যদি কোনো ক্রমে কষ্টে সৃষ্টে তার তরঙ্গরূপটি বজায় রাখে, তবু আকর্ষণের টান প্রচণ্ড হওয়ায়, আলো কেন্দ্রের কাছে না যেতে পারলেও সে গতিহারা হয়ে ছবির মত সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কোনো দর্শকের কাছে সেই আলো আর দৃশ্য হবে না। পরিসীমার ভিতরে যদি কোনো আলো থাকে তারও সেই অবস্থা ; সে বেড়িয়ে আসতে চাইবে, তবু প্রচণ্ড টানে আটকা থাকে ; তার তরঙ্গের উচ্চাবচ অবস্থাটি কেন্দ্রের প্রচণ্ড টানে বিকৃত হয়ে দাঁড়ায় ; কোনো আলো বেড়িয়ে আসে না। কালো গর্তের মত আকাশে ব্ল্যাক হোল দেখা দেয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ একটি মৌলিক তত্ত্ব। এর ভবিষ্যদুক্তি সৌর জগতে প্রমাণিত হয়েছে। এই তত্ত্ব জানায় ব্ল্যাক হোলের আবির্ভাব। তত্ত্বটি কতটা বিস্তৃত বিস্তারিত সে তথ্য প্রমাণ আজকের বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। তবু এই তত্ত্বটি সুন্দর বলে পদার্থবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য। তার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, তবু সে যে

কোথায়, তা জানা যায় না। এটি একটি বিস্ময়ের তত্ত্ব—যার আবির্ভাবে বিশ্বজগৎ হঠাৎ বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। আর জানা যায় মহাকাশের নানা বস্তুর কথা—যারা সেদিন শুধু অধরা ছিল না—ছিল অজানাও।

শাকিং (Schucking) সে কথা ভেবে বিস্ময়ে বললেন, 'সেদিনের সেই অবস্থা ভেবে দেখুন,…চুম্বক ধর্ম মানুষ দেখেনি,…ভোল্টাস, এম্পিয়ার, ফেরাডে, গালভানি তাঁদের পরীক্ষায় নামেনি; শুধু আছে কুলম্বের $1/r^2$ এর নিয়ম। আর সেদিন মানুষকে মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। সাধারণ তত্ত্ব আমাদের সেই অবস্থায় ফেলেছে।"…

এই বিস্ময়ের পটভূমিতে তাঁর সাধারণ তত্ত্বটিকে আরোও সাধারণ করার ভাবনা জাগে। সেই ভাবনার অনুরণন তুলে স্টিফেন হকিং বলেন, "নিউটনের পরম তত্ত্ব সম্পর্কে রিলেশনিস্ট স্কুলের সমালোচনা বহুদিন ধরেই উচ্চারিত হয়েছে। সার্থক সমালোচনাটি তোলেন বিশপ বার্কলে। নিউটনের স্পেসের একটা নিজস্ব স্ট্রাকচার আছে। অন্যদিকে পরমস্থিরকে নিশ্চিত সংজ্ঞায় বলা যায় না, কেননা সব সরল রৈখিক সমগতি সমান। অথচ থাকে পরম শূন্য (এখানে কোনো ফোর্স কাজ করে না) ৷ এবং পরম শূন্য ঘূর্ণায়মান গতি (যেখানে কোনো কেন্দ্রাতিগ ফোর্স নেই)। মহাবিশ্বে কোনো মেটার না থাকলেও স্পেসের স্ট্রাকচারটি থাকে। বার্কলে বললেন, এইসব স্পেসিয় পরমগুণকে মেটাফিসিকেল আখ্যায় ভূষিত করা যায়, মহাবিশ্বে একটি বস্তুর সাপেক্ষে অন্য বস্তুর আপেক্ষিক গতি মাপার চেষ্টাই হলো বিজ্ঞান সম্মত!…বার্কলের আইডিয়াটি মাকের হাতে পড়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাকের এই আইডিয়ার পোষক ছিলেন এলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর ধারণায় মাকের আইডিয়াটি তাঁর সাধারণ তত্ত্বে ঠাঁই পেয়েছে। বাস্তবিক অর্থে এটি কিন্তু ঠিক নয়। আইনস্টাইনের সমীকরণের অনেক সমাধান; সেখানে ধরা পড়ে মেটার শূন্য মিনকোওস্কির সমতলিক মেট্রিকের ছক। সার্থক অর্থে আইনস্টাইন এই মেট্রিক বা জ্যামিতিক রীতিটিকে গতিময় ক্ষেত্রে রূপান্তরীত করে মেটার ও মেট্রিক, অথবা বস্তু ও জ্যামিতিক রীতির পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে স্পেস টাইমের স্ট্রাকচারটি ফুটিয়ে তুললেন। আধুনিক চিন্তা ভাবনায়, মেট্রিক বা জ্যামিতিক উত্তেজনা আলোড়নে গড়ে তোলা গ্রেভিটন যেন একটি সাধারণ মৌলকণা—যার তুলনা ফোটন অথবা ইলেকট্রন জাতীয় বস্তুকণা বা মেটার কোয়ান্টামের সঙ্গে করা যায়।"

1916 সালে একটি তত্ত্ব প্রকাশ হলো,—যার ফলে ধারণা জাগে মহাবিশ্বের আকৃতি অথবা জন্ম মৃত্যুর; মহাকাশ বস্তুদের ঘরোয়া খবরের রিপোর্ট পাওয়া যায়। ধারণা হয় বিপরীত বিশ্বের। আর আকাঙ্ক্ষা জাগে সব ফোর্সকে মিলিয়ে সাধারণতত্ত্বকে আরো সাধারণ করে তোলার।

সব আলোচনার শুরু 1916 সালে।

———

কী-পাইনির হিসেব নিকেশ

1979 সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী-অনুষ্ঠিত হলো ; সে বছর দেশকাল আর আপেক্ষিকতার হিসেব নিকেশ, সালতামামি টানা হলো। জানা যায়, সিগনাস $\times - 1$ নক্ষত্রদ্বয়ের অদৃশ্যটি যে ব্ল্যাক হোল হবেই তার নিশ্চয়তা নেই। তাত্ত্বিক রীতিতে ভাবা যেতে পারে এটি একটি নিউট্রন তারকা পালসার ; যার চারপাশে আছে প্রবল চুম্বক ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটি আবর্তনে আছে। আর এই আবর্তনের পথে কোনো মেটার পড়লে যে বিকিরণ সৃষ্টি হয়—তা পরীক্ষায় যে বিকিরণ পাওয়া গেছে তারই সঙ্গে মিলটানে। আরেকটি তত্ত্বে ভাবা হয় সিগনাস নক্ষত্র দুটি নয়, তিনটি তারকায় গাঁথা। প্রাথমিক আর দ্বিতীয় তারকা ছাড়া, দ্বিতীয় তারকার চারপাশে উপগ্রহের মতো পাক খায় অন্য একটি তৃতীয় নক্ষত্র। আর প্রথম ও দ্বিতীয় তারকা দুটি তো পরস্পর পরস্পরকে পাক দিয়ে চলেছে। তিনটি তারকার ঘুরপাক খাবার পথে, যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, তারই ফলে পাওয়া যায় বিকিরণ। গণিতের সাহায্যে গড়ে তোলা এই বিকিরণ আর পরীক্ষায় পাওয়া বিকিরণে মিল আছে।—তবু সিগনাস নক্ষত্রের দ্বিতীয় তারকাটি অদৃশ্য, তৃতীয়টিতো অদৃশ্য তারকাকে স্পষ্ট জানা যায় না। এখানে কি ব্ল্যাক হোল আছে ?—উত্তর জানা নেই।

প্রফেসার ওয়েবারের মহাকর্ষ তরঙ্গের পরীক্ষা অন্যত্র ঘটে গেছে। তবু ওয়েবারের তরঙ্গ আর ধরা যায় নি। যন্ত্রকে আরো নিপুণ আরো কুশলী করা হয়েছে। মহাকর্ষ তরঙ্গ তবু ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আছে। এটিকে খুঁজে পেতে জালে ধরতে হবে। তবে রিলেটিভিটি আর কোয়ান্টাম তত্ত্বকে কাছে টেনে এনে নেয়া যায়। এই অপরাধীটি কবে ধরা দেবে ?—উত্তর জানা নেই।

1974 সালে স্টিফেন হকিং জানালেন, ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হোরাইজন বা ঘটমান দিগন্ত অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিপরীত কণার সৃষ্টি সম্ভব। আর কণা বিপরীত কণার সংঘর্ষে ব্ল্যাক হোল ধ্বংস হতে পারে। যাকে মনে করা হয় শেষ, সে আবার সেই শেষটিকে ধ্বংস করে সৃষ্টির জগতে দৃশ্য হতে পারে। সে নিজেই নিজের মৃত্যুবান তৈরি করে চলেছে ; কারণ সে মেটার এনার্জির আলো ঘেরা জগতে হাজির হতে চায়। বড় ব্ল্যাক হোলের মৃত্যুক্ষণ অনেক বিলম্বে আসতে পারে। তবু ছোটখাট ব্ল্যাক হোল এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে উবে যেতে পারে।—এর ঘটমান দিগন্ত অঞ্চলে কণা সৃষ্টির কাজ কারবার চলতে পারে ; তবে কেন্দ্রে যে কী ঘটে তা জানা বোঝার সম্ভাবনা নেই। এই 1974 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কোয়ান্টাম-গ্রেভিটির আলোচনা সভায় প্রফেসার জন হুইলার—যাঁকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল তত্ত্বের জনক,—তিনি বললেন, 'প্রচলিত মহাকর্ষতত্ত্বকে খুঁতো বলে মনে হচ্ছে ; কারণ আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাঁটছড়া বাঁধা যাচ্ছে না। তত্ত্বের পরিবর্তন দরকার।'—ঠিক তিন বছর পর স্টিফেন হকিং এর হাতে মহাকর্ষ আর কোয়ান্টাতত্ত্বের গিঁট বাঁধা

হয়। পলকা, আলগা ঢিলে গিঁট। তবু তো গিঁট বাঁধা যায়! আইনস্টাইনের তত্ত্বকে নাকচ করার সময় এখনো বুঝি আসেনি!

মাকের তত্ত্ব দিয়ে চিন্তা ভাবনার কালে গণিতের এক নতুন ধারার দিকে বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি দেন। হারনানডেজ (W. C. Hernandez) ও গডফ্রে (B. B. Godfrey) বিজ্ঞানের গবেষণায় কার (Kerr) মেট্রিক রীতির প্রয়োগ ঘটালেন। ভারতীয় জন্মভূত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর গণিতের এই ধারার প্রয়োগে বিপুল মহাকর্ষ ধারায় কাছাকাছি মেটারের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার রীতিটির আঙিনায় পা ফেললেন। কোয়ান্টাতত্ত্ব আর মহাকর্ষবাদের বাঁধন আবার ধরা পড়ে। এই বাঁধনের গিঁটটি পাওয়া গেল 1981-82 সালে! কোয়ান্টা-গ্রেভিটি তত্ত্বের অভিনয়কাল আসেনি হয়তো। তবে সাজঘরে তার হাজিরা দেখা যায়।

বিপুল শক্তিশালী মহাকর্ষক্ষেত্রটি অন্য আরেকটি সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয়। প্রকৃতির চারটি ইন্টার একশনের একীকরণ এই পথের কোনো অঞ্চলে ঘটতে পারে। ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী বা একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ব্ল্যাক হোলের সাহায্যে হতে পারে। তবু ব্ল্যাক হোলের কত কাছে থিয়োরী নিয়ে পাওয়া যায়? এখানে ধরা দেয় অনিশ্চয়তা আর অসম্ভাবনা! বিপুল মহাকর্ষক্ষেত্র, যা আছে বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে—সেও বুঝি অনিশ্চয়তার ঘেরাটপে মোড়া!

জন হুইলার বললেন, যা জানা গেছে তা এত সামান্য! আর এই সামান্যটুকু অজানার অন্ধকার আরো গভীর করে তুলছে। বললেন, "এই জগৎ যে বোঝার, তার স্বীকৃতি আছে ফলাফলের পথে। এই জগৎকে মনে হয় বিচিত্র, অদ্ভুত। জগৎ নয়; যারা খোঁজে তারা প্রকৃতির জানানো কথাটি আজো ঠিকমত পড়তে পারেনি, তারাই অদ্ভুত! হয়তো একদিন পড়তে পারা যাবে। সেদিন জানা যাবে একটি সরল সাদা-সিধে কথা। সে কথাটি বুঝে অভিভূত হয়ে বলব, কী সুন্দর; অথচ এতদিন কেন বুঝিনি!"—এতদিন—কতদিন?

সহজ কথা সহজে বলা যায় না, সহজ কথা সহজে বোঝা যায় না। অবোধ্য প্রকৃতিকে বুঝতে যারা চায় তারাই অদ্ভুত; তারা বিচিত্র!—তারা বিজ্ঞানী তারা মানুষ!

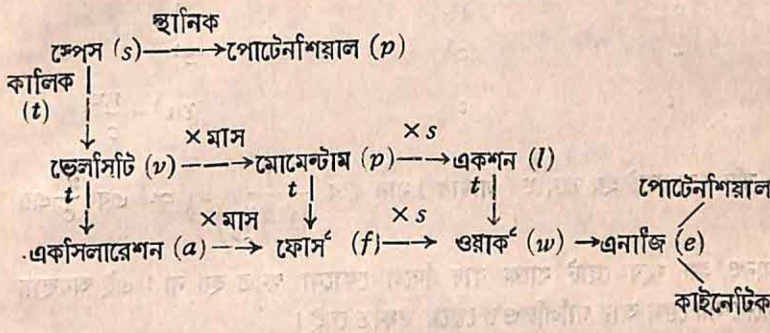
তথ্য চিন্তার পথে তত্ত্বের দ্বারে যাবার প্রচেষ্টা মানুষের!

সেই অনুসন্ধানের পথে যাত্রা শুরু হোক!

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

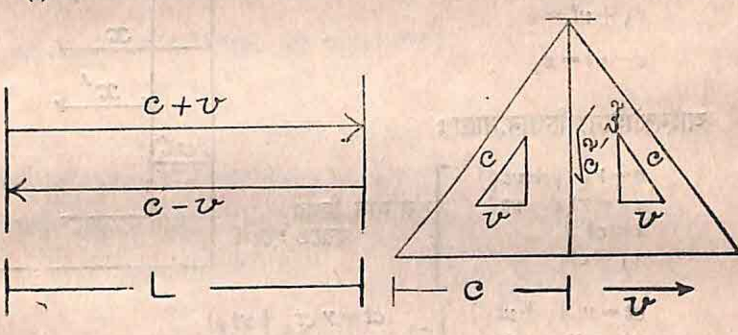
বিন্যাস

(a) **নিউটনের গতিসূত্র :**



(b) **লরেন্সের ফ্রেম :**

(i)



$$\Delta t_{11} = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2l}{c}\left(\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}\right) \cdots = \frac{2l}{c}\left(\frac{1}{1-\beta^2}\right) \left[\frac{v}{c} = \beta \text{ ধরে}\right]$$

$$\Delta t_{\perp} = \frac{2l}{c}\left[\frac{1}{(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}}\right]$$

$$\Delta t_{11} = \Delta t_0(1+\beta^2+\ldots)$$

$$\Delta t_{\perp} = \Delta t_0(1+\tfrac{1}{2}\beta^2+\cdots)$$

এবং $L_{11} = L_0(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}$

$\Delta t_{11} = \Delta t_{\perp}$ হলে : $\frac{2Lo}{c}\left[\frac{1}{(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}}\right] = \frac{2Lo}{c}\gamma\ldots$

$\left[\ (1-\frac{v^2}{c^2})^{-\frac{1}{2}}\right.$ অথবা $(1-\beta^2)^{-\frac{1}{2}} = \gamma$ ধরে $\left.\right]$

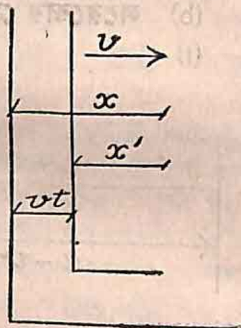
(c) রূপান্তরী ফ্রেম :

মূল ফ্রেম	গালিলিও ফ্রেম	লরেন্স ফ্রেম
x	x^1+vt^1	$\gamma(x^1+vt^1)$
y	y^1	y^1
z	z^1	z^1
t	t^1	$\gamma(t^1+\frac{vx}{c^2})$

v যদি খুব ছোট হয় তবে γ (গামার) মান হবে $\frac{1}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}} \simeq 1$ এবং $\frac{vx}{c^2}$এর মানও হয় খুব ছোট যাকে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হয় না। এই অবস্থায় লরেন্সের ফ্রেম আর গালিলিও'র ফ্রেমে তফাত নেই।

(*d*) গালিলিওর ছকে

$$x_1+vt=x$$
$$x-vt=x_1$$



আইনস্টাইনের চিন্তানুসারে :

$$\left.\begin{array}{l} x=\gamma(x_1+vt_1) \\ x_1=\gamma(x-vt) \\ x=ct \\ x_1=ct_1 \end{array}\right] \gamma\text{'র মান স্থির করতে হবে।}$$

$$\left.\begin{array}{l} ct=\gamma(x_1+vt_1) \\ ct_1=\gamma(x-vt) \end{array}\right] \rightarrow \begin{array}{l} ct=\gamma(ct_1+vt_1) \\ ct_1=\gamma(ct-vt) \end{array}$$

$$\text{or} \quad \left.\begin{array}{l} ct=\gamma t_1(c+v) \\ ct_1=\gamma t(c-v) \end{array}\right] \rightarrow \begin{array}{l} \frac{t}{t_1}=\frac{c+v}{c}\gamma \\ \frac{t_1}{t}=\frac{c-v}{c}\gamma \end{array}$$

$$\text{or} \quad \frac{c+v}{c}\gamma=\frac{c}{c-v}\cdot\frac{1}{\gamma}$$

$$\text{or} \quad \gamma^2=\frac{c^2}{c^2-v^2}=\left(\frac{1}{\frac{1-v^2}{c^2}}\right)$$

$$\text{or} \quad \gamma=\frac{1}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \text{ or } \frac{1}{(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}}$$

(e) নিউটনের ফোর্স $F=ma=m\frac{dv}{dt}$ অথবা $\frac{dp}{dt}$

$$\text{ওয়ার্ক } dw=Fds=m\cdot\frac{dv}{dt}\cdot vdt=m(dv)v$$

$$w=\int dw=m\int vdv=\frac{mv^2}{2}=\frac{1}{2}mv^2=\text{কাইনেটিক এনার্জি।}$$

আইনস্টাইনের সমীকরণে—

$F=\frac{dp}{dt}=\frac{d\,m\gamma v}{dt}$ (কারণ গতিপথে m-এর পরিবর্তন হবে)

$$w=\int_o^s Fds=\int_o^s\frac{d\,m\gamma v}{dt}vdt=\int\left[_o^v m\gamma.(dv).v+(d\gamma)\,mv\cdot v\right]$$

$$\text{এখন } d\gamma=d\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}=\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}v\cdot dvc^{-2}$$

$$\frac{v\cdot dv}{c^2}=\frac{1}{2}d\left(\frac{v^2}{c^2}\right)$$

এই মান বসিয়ে ও সমাধান করে পাওয়া যায় :—

$$w=m\gamma c^2-mc^2$$

mc^2 অংশটিতে γ বা v অংশটি নেই বলে একে বলা হয় Rest energy। কাজেই মেটার যখন গতি নিয়ে যায় তখন $E=m\gamma c^2$।

$$\text{কাইনেটিক এনার্জি}=T=E-mc^2=m\gamma c^2-mc^2=mc^2(\gamma-1)$$

$$=mc^2\left[\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}-1\right]=mc^2\left[1+\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}+\cdots-1\right]$$

$$=mc^2\times\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}=\frac{1}{2}mv^2\text{—এটি নিউটনের মান।}$$

(f) এনার্জি ও মোমেন্টামের সম্পর্ক :

$E=m\gamma c^2$ এবং $p=m\gamma v$

$$E^2-p^2c^2=m^2\gamma^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=m^2\gamma^2c^4\times\frac{1}{\gamma^2}=m^2c^4$$

$$E^2=p^2c^2+m^2c^4.$$

(A) ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের যে কোন কো-অর্ডিনেটে দেখা হোক না কেন, একটি রেখার অংশ বা লাইন সেগমেন্ট একই রূপে দেখা দিবে। সনাতন বিজ্ঞানে গণিতে একে জানানো হয় $S^2=\triangle xi.\ \triangle xi=\triangle x'i\ \ \triangle x'i$; যেখানে $i=1, 2, 3$; আইনস্টাইন এক

নতুন যোগের রীতি আনলেন, যাকে বলা হয় আইনস্টাইনের Summation Convertion। এই রীতি অনুসারে পুরনো সমীকরণটিকে জানানো হবে।

$$S^2=(\Delta x_1)^2+(\Delta x_2)^2+(\Delta x_3)^2=(\Delta x_1'^2+\Delta x_2'^2+\Delta x_3'^2)$$

অর্থাৎ এখানেও রেখার দৈর্ঘ্যটি ইনভেরিয়েন্ট বা অপরিবর্তনীয়।

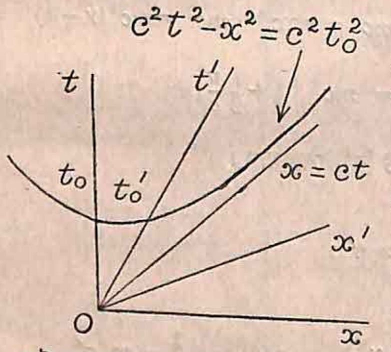
মিনকোওস্কির স্পেস কিন্তু কিছু আলাদা। এখানে রেখার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে আবর্তন আর সমগতি v এর উপর। একটি রিজিড বডি (Rigid body) বা সুকঠিন বস্তুর ধারণা এখানে থাকে না—কারণ গতির দিকে সব বস্তুর সঙ্কোচন ঘটে। মিনকোওস্কির স্পেসে একটি ইনভেরিয়েন্ট আছে—সেটি হলো সব দর্শকের কাছে আলোর গতি এক। এই ইনভেরিয়েন্টটিকে লেখা যাবে :—

$$inv=(\Delta x_1)^2+(\Delta x_2)^2+\Delta x_3)^2 - c^2(\Delta t)^2$$

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের জ্যামিতিকরণের ভিত্তিভূমিতে আছে এই ইনভেরিয়েন্টটি যেটি জানায় স্পেসের ইন্টারভেল অথবা তফাত। আগের রীতির পুনরাবৃত্তিতে এখানে জানানো হবে :

$S^2=\Delta x_\mu \, \Delta x_\mu = \Delta x'_\mu \, \Delta x'_\mu$ যেখানে $\mu=1, 2, 3,$, এবং $x_1=x$, $x_2=y$, $x_3=z$ এবং $x_4=ict$; শেষ কোঅর্ডিনেটটি একটি জটিল কমপ্লেক্স রাশি জানাচ্ছে।

এই যে স্পেসের ইন্টারভেল এটি যে ইনভেরিয়েন্ট তা জানা গেল একটি জ্যামিতিক ছকে।



স্পেসটাইমের ম্যাপে একটি হাইপারবোলা আঁকা হলো ; যেখানে জানানো হলো $c^2t^2-x^2=inv=c^2t_0^2$। এই হাইপারবোলার বিশেষত্ব হলো, স্পেস ইন্টারভেলের ইনভেরিয়েন্টত্বের জন্য একই যাত্রাবিন্দু O থেকে যাত্রা করে যে কোন দর্শক তাদের গতি নিয়ে একই সময়ে ঐ হাইপারবোলার যে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে হাজির হবে।

হাইপারবোলার সমীকরণটি জানানো হয়েছে $c^2t^2-x^2=c^2t_0^2$। এখন গতিশীল ফ্রেমের গতি যদি হয় v, তবে $x=vt$। অতএব সমীকরণটি দাঁড়ায় $c^2t^2-v^2t^2=c^2t_0^2$।

এই সমীকরণের সমাধানে পাওয়া যায় :— $t=\dfrac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=t_0\gamma$

সময়ের হ্রাসটিকে ভরতুকি দিয়ে মিটিয়ে দিতে হলে দেখা যায়, সর্বত্র $t_0'=t_0 = t/\gamma$; হাইপারবোলাটির পথ ইনভেরিয়েন্ট। এখানে স্পেসের ইন্টারভেল বা সময়ের ইন্টারভেল ইনভেরিয়েন্ট নয়। আলোর গতির অপরিবর্তনীয়তার জন্য সব দর্শকের কাছে ধরা পড়ে স্পেসটাইমের একত্রে ইনভেরিয়েন্ট হবার সম্ভাবনা।

(B) আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টিতে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হলো, যা সনাতন বিজ্ঞান থেকে আলাদা। সংক্ষেপে এই বিভিন্নতাটি জানানো হলো !

সনাতন বিজ্ঞান	আইনস্টাইনের বিজ্ঞান
(i) স্পেস ও টাইম পরম ও স্বাধীন। দুটিই আলাদা।	স্পেসটাইম আপেক্ষিক ও অভিন্ন। স্পেসটাইম একসূত্রে গাঁথা।
(ii) প্রাকৃতিক জগৎ ত্রিমাত্রিক।	প্রাকৃতিক জগৎ চতুর্মাত্রিক।
(iii) দেশকালের যুগপত্তার বোধ আছে।	দেশকালের যুগপত্তার বোধ নেই। সবকিছু ইভেন্ট দিয়ে জানা যায়।
(iv) দর্শকেরা পরম ও মর্যাদাবান। দর্শকে দর্শকে অধিকার ভেদ থাকে।	সবদর্শক সমান মর্যাদার অধিকারী।
(v) স্পেস ইথারে ভরা।	স্পেসেই ইথার আছে। তার আলাদা সত্তা ভাবা যাবে না।
(vi) ইথার নামক মাধ্যমের প্রয়োজন আছে।	ইথারের প্রয়োজন নেই।
(vii) ভেক্টর গণিতের যোগফলের রীতিতে আলোর গতি যা কিছু হতে পারে।	জড় জগতে আলোর গতি শেষ কথা। এ গতি অনতিক্রম্য ও এক।
(ix) উৎসের সাপেক্ষে আলোর গতি এক।	আলোর গতি উৎস নিরপেক্ষ ও দর্শক নিরপেক্ষ।
(x) স্থির ফ্রেমের ধারণা থাকে।	যে কোন গতির সাপেক্ষে আলোর একটিমাত্র গতিই জানা যাবে এবং সেই গতি আপেক্ষিক। কাজেই স্থিরফ্রেম বোঝা যাবে না।

(C) (*i*) ডপলারের শিফটের সমীকরণটি হলো $\nu^1 = \nu\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$

আইনস্টাইনের শিফটে জানা যায় $\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{gl}{c^2}$

(ii) স্বয়াৎর্সচিল্ডের সমীকরণটি হলো

$$ds^2 = Tdt^2 - r^2(d\theta + sin^2\theta d\phi) - \frac{dr^2}{T} \cdots \left[\text{যেখানে } T = 1 - \frac{2GM}{C^2 r}\right]$$

এখানে যেসব কো-অর্ডিনেট ব্যবহার করা হলো তারা পোলার কোঅর্ডিনেট।

এই সমীকরণে $\theta = \frac{\pi}{2}$ হলে যে সমীকরণ পাওয়া যায় তা জানায়

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h^2} + \frac{3GMu^2}{c^2} \quad [\, u = \frac{1}{r} \text{ এবং } h = GM \,]$$

নিউটনের গ্রহদের গতির সমীকরণটি হলো : $\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h^2}$

অর্থাৎ $3GM \frac{u^2}{c^2}$ অংশটুকু আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে বেশি প্রাপ্তি – যেটি অনুসূর গতির গোলমাল জানায়।

আবার $h = o$ হলে সমীকরণটি জানায়

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{3GMu^2}{c^2} \text{ অথবা } d\phi = \frac{4GM}{c^2 r}$$

আলোর সমীকরণটি জানায় $\frac{(2GM)}{(c^2 r)}$ গণিতে অথবা $1 - T$ এর সূত্রে।

যদি r-এর মান হয় $\frac{2GM}{c^2}$ তবে Tএর মান শূন্য। এই অবস্থায় স্বয়াৎর্সচিল্ডের সমীকরণের প্রথম রাশি Tdt^2 = শূন্য এবং $\frac{dr^2}{T}$ জানাবে অসীম রাশি। এটি গণিতের সমীকরণের একটি আশ্চর্য নিদর্শন। এই জাতীয় সমীকরণের একটি সমীকরণের একটি সমাধান জানাবে $r = \frac{2GM}{c^2}$.

(i) **কয়েকটি ধ্রুব রাশি।**

c = আলোর গতি (Velocity of light)…3×10^{10} cm sec^{-1}

h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Plank cons.)…$6{\cdot}625 \times 10^{-34}$ joule sec or $6{\cdot}625 \times 10^{-27}$ erg sec.

$\bar{h}$ = প্লাঙ্ক-ডিরাক ধ্রুবক (Plank-Dirac const) ‥$h/2\pi = 1{\cdot}5 \times 10^{-27}$ erg sec.

e = প্রোটন/ইলেকট্রনের চার্জ…$4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ $erg^{\frac{1}{2}} cm^{\frac{1}{2}}$ or $1{\cdot}602 \times 10^{-9}$ coulomb.

me = ইলেকট্রনের মাস…$9{\cdot}1 \times 10^{-28} g$

mp = প্রোটনের মাস ··· $1{\cdot}7 \times 10^{-24} g$ অথবা $1836{\cdot}62 Me$

G = মহাকর্ষ ধ্রুবক (Newtonian gravitation)...
$6{\cdot}7 \times 10^{-8}$ erg $cmg^{-2} = 6{\cdot}7 \times 10^{-11}$ Newton $met^2 kgm^2$

H = হাবলের ধ্রুবক Hubble const for the expansion of universe)...$1{\cdot}6 \times 10^{18} sec^{-1}$/53km/secMpc or $5{\cdot}42 \times 10^{-11} yr^{-1}$

$T = 1/H$ ...$18{\cdot}5 \times 10^9 yr$

ρ = মহাজগতের গড় ডেনসিটি ··· $4 \times 10^{-31} gcm^{-1}$

Q/Ce = কুলম্বের কনস্ট্যান্ট ··· 9×10^9 Newton $met^2/Coulomb^2$

(ii) বড় রাশি / চেনা রাশি

মহাকর্ষের সংযোজন ধ্রুবক (Gravitational Coupling Constant) =

$$\frac{Gm\rho}{\bar{h}c} = 5 \times 10^{-39}$$

ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট (Fine Structure Constant) =

$$\frac{e^2}{\bar{h}c} = 7{\cdot}3 \times 10^{-3} \text{ or } (137)^{-1}$$

ইলেকট্রন প্রোটন মাসের রেসিও = $\frac{Me}{mp} = 0{\cdot}54 \times 10^{-3} \simeq \frac{1}{1836{\cdot}26}$

হাইড্রোজেন এটমে ইলেকট্রিক ফোর্স ও মহাকর্ষ ফোর্সের রেসিও =

$$\frac{e^2}{Gm_p m_e} = 2{\cdot}3 \times 10^{-39}$$

দৃশ্য মহাজগতে পার্টিকলের সংখ্যা = $\frac{8}{3} \frac{\pi \rho c^3}{m_p h} = 1{\cdot}2 \times 10^{78}$

$\frac{\text{মহাজগতের মাস}}{\text{প্রোটনের মাস}} = \frac{8}{3}\pi\rho \frac{c^3}{H^3} \cdot \frac{1}{m_p} \simeq 10^{79}$

এটমিক ইউনিট অনুযায়ী মহাজগতের বয়স =

$$\frac{me}{c^2} \cdot \frac{c^3}{H} \simeq \frac{mec^2 T}{\bar{h}} \simeq 10^{39}$$

$\frac{\text{ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ (ক্লাসিকেল)}}{\text{বর্তমান মহাজগতের ব্যাসার্ধ}} = N = \frac{\pi e^2}{Gm_e m_p} \simeq 10^{79}$

(iii) এডিংটন মহাজগতে প্রোটনের সংখ্যা আইনস্টাইনের গণিতের ভিত্তিতে হিসেব করেছিলেন। সাধারণত লাজুক প্রকৃতির এডিংটন এই বিশাল রাশিটি দুঃসাহসে জানালেন।

15, 747, 724, 136, 275, 002, 577, 605, 653, 961, 181, 555, 468, 044, 717, 914, 527, 116, 709, 366, 231, 4:5, 076, 185, 631, 031, 296 $\simeq 1{\cdot}5 \times 10^{79}$

প্রথমদিনের সূর্য

মহাকাশ বলতে মহাশূন্যের ধারণা জাগে। অথচ বিজ্ঞান জানায়, এই শূন্যে আছে অনেক বিকিরণ, অনেক পরমাণু ধূলি ; আর এই বিকিরণ-ধূলিকণায় ভরা বিরাট স্পেস আছে মহাজাগতিক বস্তুদের মাঝখানে। উজ্জ্বল মহাজাগতিক বস্তুরা বেশীর ভাগই নক্ষত্র, যেমন সূর্য এই সূর্যরা, নক্ষত্ররা, আকারে, আয়তনে গঠনে এমনকি উপকরণের বণ্টনহারে অথবা বর্ণে-সৃষ্টিতে ভিন্ন হতে পারে। এরা দল বেঁধে থাকে। আর এদের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ধূলিকণা-গ্যাস অথবা অন্যকিছু। এই বিরাট নক্ষত্রদলকে বলে গেলাক্সি। সূর্য যে গেলাক্সির সভ্য, সেখানে আছে 100 বিলিয়ন নক্ষত্র ; আর এই গেলাক্সিটার আয়তন আড়াআড়ি ভাবে 50,000 আলোক বর্ষ ! আমাদের জ্ঞানে এটি একটি বিরাট আকার ; অথচ মহাজগতে এটি একটি তুচ্ছ জায়গা। মহাকাশে আছে অনেক গেলাক্সি-এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই গেলাক্সিরাও যেন নিজেরা দল গড়ে থাকে ; গেলাক্সির এই দলকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন কসমিক এটম বা মহাজাগতিক এটম। মহাজগতের সবকিছু পরিমাপের স্কেল হলো এই এটম ; এই এটমের উপকরণ, অথবা এককেকটি গেলাক্সির নিজস্ব চিন্তাভাবনা রোমাঞ্চকর হতে পারে ; তবু কসমোলজি বা মহাকাশ তত্ত্বে এদের আলাদা কোন ঠাঁই নেই। আর এই এটমের একটি গেলাক্সির ছায়াপথের একটেরে সূর্য নক্ষত্র তার গ্রহ পরিবার নিয়ে ঘরকন্না করছেন। এই পরিবারের হেঁসেলের খবর কিছু কিছু আমরা জানি ; কারণ সৌরলোকে পৃথিবী একটি গ্রহ। হয়তো ছায়াপথের অন্য কোন নক্ষত্রেরাও ঘরসংসার সাজিয়ে বসে থাকতে পারে ; তবু কোন দূরবীন দিয়ে সূর্য ছাড়া কোন নক্ষত্রকেও ভাল করে জানা বা দেখা যায় না ; তার পরিবারের সংবাদ তো হনুজ দূর-অস্ত—এখনো অনেক দূর।

দূরবীক্ষণের সাহায্যে কোন কোন গেলাক্সি দেখা যায়। তাদের মাঝে যে কৃষ্ণ কালো স্পেস—সেখানে আছে কিছু বস্তুকণা, নানা বিকিরণ ; তারা মহাকর্ষ জনিত বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় হতে পারে, হতে পারে মহাজাগতিক বা নিউট্রিনো কণার। জাগতিক সব বস্তুদের মধ্যে পাওয়া যায় 92টি মৌল এটম। এই মৌল বা এলিমেন্টরা তৈরি করে মলিক্যুল বা অণু। এদের ক্রিয়াকলাপ বোঝা যায় রসায়নের পথে। এলিমেণ্টদের মধ্যে প্রাথমিকটি হলো হাইড্রোজেন, যার আছে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন। দ্বিতীয়টি হলো হিলিয়াম, যার আছে দুটি ইলেকট্রন, দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। আর সবার বড় ইউরেনিয়ামে আছে 92টি ইলেকট্রন, 92টি প্রোটন এবং 146টি নিউট্রন।

মৌল এটমদের তফাত ঘটে ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যায়। পৃথিবীতে মৌল এলিমেন্টদের মধ্যে লোহা যেমন বেশ পাওয়া যায়, তেমনি প্রায় পাওয়া যায় না

টেকনেটিয়াম নামক এলিমেন্টটি। আর সূর্য নামক নক্ষত্রটিতে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। পৃথিবীর সব মৌল এলিমেন্টগুলি পাওয়া যায় না সূর্যে অথবা অন্য কোন নক্ষত্রে। সেখানে যেন শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের অবস্থান ঘোষণা। বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে মহাজাগতিক বস্তুর শতকরা 90% এটমের অংশ হলো হাইড্রোজেন। অবশিষ্টের বেশীভাগ হলো হিলিয়াম। আর পৃথিবীতে যেসব মৌল পাওয়া যায় তাদের কিছু কিছু একটি সামান্যতম ভগ্নাংশ নিয়ে হাজির থাকে।

প্রাথমিক এলিমেন্ট হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের এই বলিষ্ঠ উপস্থিতি একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি নিয়ে যায়। সেটি হলো মহা জগতের সৃষ্টির আদিরূপে ছিল সরল এটমের দল ; আর এই সরল এটম থেকে বন্ধনের কোন এক সূত্র পথে পাওয়া যায় অন্যান্য এটমদের। সেই সূত্রটি কি সে নিয়ে আলোচনা ওঠে।...ইতিমধ্যে পরীক্ষায় একটি তথ্য ধরা পড়ে—সমতা বা ইউনিফর্মিটির ধারণা। পার্থিব মৌল এটমদের মহাজগতে দেখা যায় ; তাদের আচার-ব্যবহার, বর্ণালী বিশ্লেষণ, চার্জ ইত্যাদি গুণ – এসবই সর্বত্র এক ধরনের, একরীতির ; সুতরাং দূর নক্ষত্র জগতেও পার্থিব ফিজিক্সের নিয়ম খাটতে পারে। আরেকটি ধারণা হলো, মহাজগতে মেটারের উপস্থিতি। গেলাক্সিরা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে একটি গেলাক্সি গুচ্ছ তৈরি করছে এই গুচ্ছগুলির সভ্য উপকরণদের সেজে দাঁড়ানোর মধ্যে কিছুটা যেন এলোমেলোমি, কিছু ঢিলেমি কিছু অগোছাল ছন্দ নজরে পড়ে। গুচ্ছ-গুলিও কি এলোমেলো হয়ে দাঁড়ায়, না তাদের সাজানো গোছানোতে কিছু ছিরিছাঁদ থাকে ? এথানে দুটো মত। একদল বলেন, গুচ্ছগুলোও এলোমেলো হয়ে দাঁড়ায়। আর দ্বিতীয় দল বলেন, যা দেখা যায়, তাতে মনে হয়, গুচ্ছ-গুলোর আপাত এলোমেলো ভাব সঠিক নির্দেশনা জানাছে না। বরং মনে হয়, এরা যেন সুনিশ্চিত সুশৃংখল বোধ নিয়ে আছে। এই মেটারের বা গেলাক্সি গুচ্ছের ছড়ানোর ধরনটি যেন হোমোজিনাস ও আইসোট্রোপিক,—সমস্থানিক ও সমমাত্রিক। মহাজগতের বিরাট বিশাল বন্দীশে এই আকৃতিটি শুধু যে সরল, তা নয়, এটি সুবিধারও। এখানে গণিতের ছক সহজে, অর্থাৎ কম জটিলতায়, খাটানো যায়। এবং এই ছকে কোন গ্রহ-নক্ষত্র-গেলাক্সি অথবা গেলাক্সি গুচ্ছ বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে না। সৌর লোক আমাদের নিকট আত্মীয়, আপনজন হতে পারে। এটি অন্যদিকে মহাজগতে একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংসার। যেমন, বিশাল মানব সমাজের সাপেক্ষে একটি ছোট পরিবার সুখী পরিবার হলেও সে একটি নগন্য তুচ্ছ অংশ মাত্র। বিরাট পরিমাপের সাপেক্ষে মহাজগৎ যেন ইউনিফর্ম বা সমান। এই সাম্যের ধারণা নিয়ে সৃষ্টি হয় কসমোলজিকেল প্রিন্সিপল - মহাজাগতিক নিয়ম। মনে হয়, যে কোন অবস্থান থেকে যে কোন সময়ে মহাজগৎকে দেখা হোল না কেন, এটি যেন একটি বস্তু বা জিনিসকে বারবার দেখা !

এই চিন্তার পটভূমিতে কিছু অসঙ্গতি—গোলমাল দেখা দিতে পারে। যেমন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেমরিখ ওলবার্স (Hemrich Olbers, 1758-1840) একটি সমস্যা তোলেন। মহাজগৎ যখন অসীম এবং অপরিবর্তনীয়, তখন রাত্রির আকাশ কেন অন্ধকারে ভরা? যদি উত্তপ্ত তারকা থেকে অসীম কাল ধরে স্পেসে তাপ ঢালা হতে থাকে, তবে মহাজগৎ কেন গরম নয়? তাপগতি-বিজ্ঞানের সূত্রে জানা যায়, যা শীতল, তাই কালো। এই মহাকাশ কালো বলেই শীতল। অথচ এতদিনে তার তো বেশ গরম-সরম হবার কথা!

আবার স্পেসে যদি সর্বত্র নক্ষত্র থাকে; তবে মহাকাশের সব অঞ্চলে কোনো না কোনো নক্ষত্রের আলো ধরা দিবে। কাজেই যেদিকে তাকানো যাক না কেন, কাছে বা দূরে, কোনো না কোনো নক্ষত্র ধরা যাবে। হয়তো অনেক দূরে বলে ক্ষীণ, অস্পষ্ট; হয়তো তাদের মনে হবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম; তবু এই তারকারাও তাদের চারদিকের স্পেসটুকু আলোয় ভরিয়ে তুলবে। কাজেই দূরত্ব কোন বাধা হবে না। দূরেও তারকা আছে, তাদের আলো আছে; তারা তাদের চারপাশের পথ আলোয় ঘিরবে; তবু কেন মহাকাশ অন্ধকারে ভরা?

ওলবার্সের প্যারাডক্স বা সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সমাধান খোঁজা হয়েছে। একটি সমাধান হলো মহাকাশকে সসীম ভাবা। এখানেও কিন্তু গোলমাল! সসীম মহাবিশ্ব মানে যার সীমানা আছে আর সেই সীমানার নক্ষত্ররা, অতএব বিশিষ্ট। এটি কোপার্নিকাস-উত্তর ধারনার বিরোধী। কোনো নক্ষত্র বিশেষ নয়, বিশিষ্ট নয়। তারা একটি মহাজাগতিক গোষ্ঠীর সভ্য মাত্র। অন্যদিকে নিউটনের মতানুযায়ী সসীম বিশ্বলোকের একটি কেন্দ্র থাকবে। আর এই কেন্দ্রের টানে সব মেটার সেখানে ধীরে ধীরে একত্র হয়ে জমাট বেঁধে থাকবে। নিউটন এর নাম দিয়েছিলেন ব্লব—বা ফুটকি। এখানে মহাজগৎ বলে কিছু থাকে না। এই ফুটকিতে মহাজগতের ধ্বংস বা কোলাপ্স ঘটে। অতএব, নিউটন এই বিশ্বলোককে অসীম ভাবলেন, যেখানে সব নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে; তারা কেউ বিশিষ্ট নয়। তারা আছে তাদের আকর্ষণটি নিয়ে।

ওলবার্সের সমস্যার একটি উত্তর জোগালেন তাপগতিবিজ্ঞানী বোলৎসমান। তিনি পোআঁকারের একটি আইডিয়ার উদ্ধৃতি দিলেন। পোআঁকার জানিয়েছিলেন যে ঘটনা এখন ঘটছে তার আবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। ঘটনাটি যেখানে ঘটছে সেখানে যত ইলেকট্রন আছে 10 এর বর্গে তত বছর পর সেই ঘটনা ঘটতে পারে। মহাবিশ্বে ধূলিকণার সংখ্যা বা প্রোটনের সংখ্যা সেকালীন বিজ্ঞানীদের মতে 10^{80}টি। এই সূত্রানুযায়ী বোলৎসমান বললেন একটি বিরাট সময়ের আন্দোলন ঘটে গেছে মহাবিশ্বে $10^{10^{80}}$ বছর আগে। তখন তারকারা সব তাপ ঢেলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর তারপর থেকে $10^{10^{80}}$ বছর ধরে সব ঢেলে দেয়া তাপ আবার নিজের নিজের উৎস তারকাতে হাজির হবে। তারকারা উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে উত্তপ্ততমের দিকে যাত্রা করবে। মহাকাশ অন্ধকারে ভরা, কারণ সব তাপ

সুশৃংখল ভঙ্গীতে নক্ষত্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে যাত্রা করেছে।…বোলৎসমান পোআঁকারের ধ্যানে অন্ধকার মহাকাশের একটি আধাদার্শনিক আধা কাব্যিক সমাধান পাওয়া গেল—তবু এই সমাধানটি বোলৎসমানের নিজস্ব তাপ বিজ্ঞানের এনট্রোপি তত্ত্বের উলটোমুখী, বলগাছাড়া রূপ। পৃথিবীতে, সৌরলোকে, যেখানে তাপের প্রবাহ গরম থেকে ঠাণ্ডায় যায়, প্রবাহটি একমুখী সেখানে মহাকাশের তাপ কেন উলটোমুখে মহাকাশের স্পেস থেকে অনেক অনেক উত্তপ্ত নক্ষত্রে ফিরে আসবে? ওলবার্সের সমস্যার সমাধানটি কি পাওয়া গেল?

সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল এই সেদিন, 1929 সালে, মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবলের সংগৃহীত তথ্য থেকে। হাবল দেখলেন, দূরের নক্ষত্র লোকের বর্ণালী ক্ষেত্রের লালের দিকে সরে যাওয়া বা রেড শিফটটি যেন ডপলারের নিয়ম মেনে চলেছে। ডপলারের নিয়ম মানে দূরত্বের নিয়ম। অর্থাৎ, দূরের গেলাক্সি গুচ্ছ আরো দূরে সরে যায়। হাবলের তথ্য জানায় এই বিশ্বলোক বর্ধমান। বর্ধমান যখন, তখন এই বিশ্বলোকের একটি পূর্ণ ইতিহাস থাকবে। তার বৃদ্ধি যখন পাওয়া যায়, তখন তার শৈশব আছে, জন্ম আছে এবং হয়তো থাকে মৃত্যু। আর বিশ্বলোক যখন বর্ধমান, তখন ওলবার্সের সমস্যাটির আর কোন বাস্তব রূপ থাকতে পরে না ;- বর্ধমান বিশ্বলোকে তাপগতির সাম্যভাব কিভাবে বজায় থাকবে?—তবে আরেকটি সমস্যা হাজির হয় ; বিশ্বলোক যখন নড়ছে চলছে,- তখন তার গতিটিও কি নিউটনের গতিসূত্রটি মানবে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাজগতের যে ছকটি আঁকলেন, সেখানে তাঁরা জাগতিক গতিসূত্রের নকশাটি ব্যবহার করলেন। যা গাড়ির গতিতে খাটে, সেই একই সূত্র খাটে গাড়ির চাকায়, তার উপকরণের চলনে বলনে। যা পৃথিবীতে খাটে, তা খাটে সৌরলোকে, গেলাক্সিতে এবং মহাকাশে। মহাজাগতিক গতি সূত্রের রূপটি জাগতিক গতিরূপের ছন্দে ঢেলে সাজানো!

এর পরে চিন্তা গতিটিতে কোন ফোর্স কাজ করে। দূরের জগতে কাজ করতে পারে দুটি মাত্র শক্তি একটি মহাকর্ষ আর দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ চুম্বকশক্তি। বড় ভরে বিদ্যুৎ চুম্বকশক্তির পরিমাণ অতি তুচ্ছ ; এখানে কাজ করে একটিমাত্র শক্তি, যা মহাকর্ষ, গ্রেভিটেশন, যে শক্তি জাগায় আকর্ষণ। মহাজগতের গতি সূত্রটি অতএব মহাকর্ষ দিয়ে ঘেরা থাকে। আর হাবলের কালে 1929 সালে যে মহাকর্ষ তত্ত্বটি সেদিন বিজ্ঞান সমাজের হাতের কাছে ছিল, সেটি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। বিজ্ঞানীরা সেই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক তত্ত্বের গণিতের সাহায্যে বিশ্বলোকের মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন।

আর আশ্চর্য, সেই মডেলটি আইনস্টাইনের গড়া মহাজাগতিক তত্ত্বের মধ্যে যেন লুকিয়ে ছিল। 1917 সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর মহাজাগতিক তত্ত্ব—যার ভিত্তিতে আছে তাঁর নিজস্ব সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, তাঁর মহাকর্ষ

তত্ত্ব, অথবা সাধারণ তত্ত্ব। এইখানে ধরা পড়ে বর্ধমান বা ক্ষীয়মান বিশ্ব-লোকের ছবি ; বিশ্বলোকের হয় আছে বৃদ্ধি, নয় আছে সংকোচনের ধারা ; মনে হয়, বিশ্বলোক যেন স্পন্দনশীল। অথচ সে যুগের বিশ্বলোক স্থির, সেখানে গতি নেই। দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় বিশ্বলোকের ছোটখাট আকার — নক্ষত্রলোক দূরবিস্তৃত হলেও সুদূর বিস্তৃত নয়। সুতরাং সেকালীন তথ্যের ভিত্তিতে নিজের গড়া বিশ্বলোকের ছকটি আইনস্টাইন পাল্টালেন। তাঁর নিজের মহাকর্ষ তত্ত্বের সাপেক্ষে গড়ে ওঠা গতিমান মহাবিশ্বলোকে আনলেন নতুন একটি শক্তি— বিকর্ষণ শক্তি। ছিটকে ছুটে চলা বিশ্বলোকটিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের ধারায় আঁট করে বাঁধলেন। — তবুও আইনস্টাইনের মডেলটি পূর্বসূরী নিউটন ইত্যাদি বিজ্ঞানীদের হাতেগড়া মডেলটি থেকে অনেক আলাদা। এই বিশ্বলোক সসীম ; অথচ সর্বত্র সবদিকে সমান। এটির একটি দিগন্ত আছে অথচ কোন সীমানা নেই। এটি বর্তুলাকার, যেন স্ফিয়ার। এই মডেলে সব গেলাক্সিরা মেটার নিয়ে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে ; মহাজাগতিক নিয়ম, কসমোলজিকেল প্রিন্সিপলটি বজায় থাকে। এই মহাজগতে কোন বহিসীমা নেই, নেই অন্তসীমা অথবা কোন সীমারেখা। সব বিন্দুই পরস্পরের সাপেক্ষে সমান বিশিষ্ট অথবা সমান গুণান্বিত। কোনো কিছুই নেই কেন্দ্রে অথবা সীমারেখার কাছে ; কারণ কেন্দ্র বা সীমারেখা বলে কিছুই নেই। শুধু গণিতের ছকে জানা এই মডেল বিশ্বলোকটি হয় বর্ধমান নয় সংকোচন মুখী হবে। একে আইনস্টাইন জোর করে স্থির করে রাখলেন ; গতিটিকে বিকর্ষণ ধারার ব্রেক দিয়ে থামিয়ে দিলেন !

প্রাকআইনস্টাইনীয় মহাবিশ্বের মডেল, যাকে বলা যেতে পারে নিউটন-লাপ্লাসের মডেল, সেখানে স্পেস সমতলিক—ইউক্লিডিও ; তারকার সংখ্যা অগণ্য অনন্ত আর আলোর গতি অসীম হতে পারে। এই অবস্থায় মহাজগতের সমতা বজায় থাকে না ; কারণ একটি হোমোজিনাস স্ফিয়ারের উপরের তলের মহাকর্ষ তার ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়ে অসীমে চলে যেতে পারে। একমাত্র আইসোট্রোপিক ও হোমোজিনাস—সর্বদিকে সর্বত্র সমান বৃদ্ধির চিন্তাতে এই গোলমালের কাটান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অথবা যদি ধরা যায়, এই বৃদ্ধির বিপরীতে কোন এক বিকর্ষণ শক্তি কাজ করে, তবে বৃদ্ধির একটি অবস্থার পর স্থিতাবস্থা দেখা দেয় ; স্থিতাবস্থা ধরা দেয় ; বিশ্বজগতের সাম্যভাব বজায় থাকে। নিউটনীয় মহাবিশ্বে এই জাতীয় চিন্তার আভাস ছিল তাঁর বিশ্ব-জগৎ যে রব বা ফুটকিতে নিঃশেষ হচ্ছে না,তার কারণ হিসেবে সেকালে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন একটি কসমোলজিকেল রিপালশন অথবা মহাজাগতিক বিকর্ষণের সম্ভাবনা, যার বৃদ্ধি ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাবে। এই একই চিন্তা আইনস্টাইনের। বর্তুল বিশ্বলোকের কল্পনাতে তিনি কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট λ (ল্যামডা) নামক রাশিটির ঠাঁই দিলেন। ল্যামডা আছে বলেই

তাঁর বর্তুল বিশ্বলোক স্থির।...অবশ্য আইনস্টাইন যখন তাঁর বিশ্বলোকের কল্পনা করেন, তখন হাবলের পরীক্ষা শুরু হয়নি, বর্ধমান বিশ্বলোকের তথ্যভিত্তিক সংবাদ জানা ছিল না। এবং জানা ছিল না মহাবিশ্বের অপার বিস্তৃতির কথা। তাঁর থিয়োরিতে কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্টটি দেখা দিল, যার মান খুবই ছোট মাত্র $10^{-49}m^{-2}$; তবু এডিংটন ও লামেটার দেখলেন যে, আইনস্টাইনের বিশ্বলোকের সমীকরণটি যেন অস্থির চঞ্চল সমাধানটিই জানাচ্ছে ; সামান্য পরিবর্তনের আঘাতে এই বিশ্বলোক বৃদ্ধির পথে যাত্রা করে। এই দুই বিজ্ঞানীর হাতে আইনস্টাইনের সমীকরণের রূপান্তর ঘটে। তাঁরা দেখেন λ কে শূন্য ধরলে তিনটি সম্ভাবনা পাওয়া যায় ; একটি অসীমবৃদ্ধি, অন্যটিতে বৃদ্ধির হারে যেন স্থিরতা দেখা দেয় আর তৃতীয়টিতে সংকোচন বর্ধমান এই আন্দোলনের দোলা ! ডিসিটার অন্যদিকে λকে শূন্য ধরে এবং ভর ও বক্রতার গাউসীয় মানকে শূন্য ধরে পেলেন চির বর্ধমান বিশ্বলোক, বৃদ্ধির হারে দ্রুততা ক্রমশ বেড়ে চলে। বৃদ্ধির হার এখানে এক্সপোনেনশিয়াল।

1920 সালে মাউন্ট উইলসন অবজার্ভেটরিতে মহাকাশের রহস্য খুজতে গিয়ে হাবল দেখলেন এন্ড্রোমিডা M_3 ! ছায়াপথে কিছু কিছু নক্ষত্র আছে যারা আছে আটলক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। এরা আছে সূর্যলোক আশ্রয়দাত্রী ছায়াপথ থেকে অনেক অনেক দূরে। পরে জানা যায় বিলিয়ান আলোকবর্ষ দূরেও তারকারা থাকে ; সৌর পরিমণ্ডল মহাকাশের একটি নগণ্যতম, সামান্যতম অংশমাত্র। এন্ড্রোমিডা ছায়াপথের সংবাদ শুনে একজন বেলজিয়াম মঙ্ক, লামেটার, 192৲ সালে একটি পেপার প্রকাশ করলেন। পেপারটিতে তিনি দেখালেন আইনস্টাইনের আপাত স্থির জগৎ তাঁর নিজের গণিতের ভিত্তিতেই স্বভাবত অস্থির! আইনস্টাইনের উপপত্তি থেকেই এই জগতের ক্রমবর্ধমান রূপটি জানা যায়। এবং সেই সময়ে, আইনস্টাইনের কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্টটি লা মেটার ছাড়া বিজ্ঞানী ডিসিটার মানতে পারলেন না। ডিসিটার অবশ্য আইনস্টাইনের জানানো মহাবিশ্বের বর্তুলাকৃতি মেনে নিচ্ছেন। মানছেন না তার স্থির স্থায়িত্ব। তার জগৎ ক্রমবর্ধমান, স্পেস প্রতি মুহূর্তে বর্তুলাকৃতি থেকে সমতলাকৃতি পেতে চলেছে, চলেছে নন ইউক্লিডিও জগৎ থেকে চেনাজানা পরিচিত ইউক্লিডিও জগতের দিকে। অন্যদিকে লামেটারের তত্ত্বে জানা গেল, এই বিশ্বের সৃষ্টি একটি আদিম এটম বা ব্রহ্মাণ্ড বা কসমিক এগ থেকে। এই প্রকাণ্ড আদিম এটমে মহাবিশ্বের সব পদার্থ ঘনীভূত ছিল। স্পেসটাইমের সূচনায় এটমটি ফেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকে। আমাদের চেনা বিশ্বলোক, এমন কি আইনস্টাইনের বিশ্বলোকও এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ক্রমবর্ধমান বিশ্বলোকের একটি পর্যায়মাত্র। লামেটার তাঁর সমীকরণে ছায়াপথের অপসরণের হারের ভিত্তিতে একটি মাস বা ভরের কথা জানিয়েছিলেন। হাবল সেইখানে একটি রাশি বসিয়ে আইনস্টাইনের গড়া জগতের একটি ব্যাসার্ধ পেলেন। আইনস্টাইনের

জগৎ মুছে ফেলার নয়; এটি হয়তো একটি ধাপ, সম্ভাবনার একটি পর্যায়।

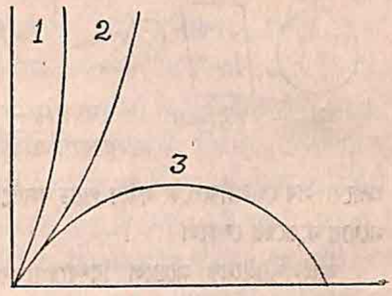
বর্ধমান বিশ্বলোকের আইনস্টাইনীয় গণিত ভিত্তিক ধাপটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন রুশ বিজ্ঞানী আলেকসান্ডার ফ্রীডমান, 1922 সালে। সেই সময়ে তাঁর থিসিসটি প্রায় অবজ্ঞাত হয়ে থাকে। ফ্রীডমানের থিসিসের বিশেষত্ব হলো, তিনি মহাজাগতিক সব বস্তুর সব মেটারের স্পেসে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকার কথা ভাবলেন। আর এই ধারণার সাপেক্ষে আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্বের সমীকরণটির সমাধান করলেন। মেটারের সমানত্ব থাকার জন্য তিনি পেলেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকারের পরিবর্তনের একটি স্কেল। বর্ধমান বা সঙ্কোচনশীল বিশ্বলোকটির পরিবর্তনের রীতিটি সর্বত্র সমান—পরিবর্তন শুধু স্কেলের। যেন একটি ছবি আঁকা বেলুনকে ফুলিয়ে তোলা—যখন বেলুনটি আকারে বাড়ে এবং সেই হারে বাড়ে ছবিটা; তফাত শুধু স্কেলে!

ফ্রীডমানের গণিতের ছকে থাকে একটি শাশ্বত চিন্তা, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা। কাইনেটিক আর পোটেনশিয়াল এনার্জির যোগফলে যে শক্তি পাওয়া যাবে সেটি কনস্ট্যান্ট। ফ্রীডমান তাঁর গণিতে এই কনস্ট্যান্টের তিনটি বিকল্প পেলেন, পেলেন তিনটি বিভিন্ন ধারণার সাপেক্ষে। শক্তিটি যদি পজিটিভ হয়, তবে ফ্রীডমানের তত্ত্ব জানায় বিশ্বলোক দ্রুতবর্ধমান। যদি শক্তিটির মান হয় শূন্য, তবে তখনো বিশ্বলোক বাড়ে ঠিকই, তবে এই বৃদ্ধির হার অনেক ধীর। আর গণিতের সমাধানে শক্তিটি যদি জানায় নেগেটিভ মান, তবে বিশ্বলোক প্রথমদিকে বেড়ে চলে, আর তারপর কোন একসময়ে এই বৃদ্ধির ধারা কমে যায়, আসে সঙ্কোচনের পালা। তিনটি ধারাতেই কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বিশ্বলোকের বৃদ্ধি শুরু হয়; প্রথম আর দ্বিতীয় মডেলে এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকে; শুধু তৃতীয় ধারায় বর্ধমান বিশ্বলোক সঙ্কোচনের ক্রিয়ায় আবার যেন যাত্রাবিন্দুতে ফিরে আসে। তৃতীয় ধারা যেন রামধনুর বাঁকা পথে রাঙানো বিশ্বলোকের পরিভ্রমণের পথটি ঘোষণা করছে।

ফ্রীডমান তিনটি বিকল্পের কথা জানালেন—তিনটিই জানা গেল আইনস্টাইনের গণিত সূত্রটি ধরে। কোন বিকল্পটি সঠিক? সব কটি বিকল্প জানায় বিশ্বলোকের বর্ধমানত্বের একটি জন্মক্ষণ, একটি জন্মবিন্দু আছে। এটুকু শুধু মিল। আর বর্তমানে হাবলের পরীক্ষায় জানা যায় বিশ্বলোকটি এখনো বর্ধমান। সেটিতো তিনটি মডেলের প্রাথমিক অংশেই ঘোষণা করা আছে। কোন পথে বিশ্বলোক চলেছে?

সেই চলার পথের ম্যাপ নকশা তৈরির আগের চিন্তাভাবনা সময় নিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বলোক বাড়ে অথবা কমে। এ'ট কোন সময়? ফ্রীডমানের মডেলে বিশ্বলোকের সর্বত্র মেটার একভাবে ছিটিয়ে আছে; বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বত্র এক। যে কোন গেলাক্সি গুচ্ছ বা মহাজগতের এটমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বলোকের দিকে তাকালে সব সময়ে একই দৃশ্য দেখা যাবে, কারণ বৃদ্ধির ফ্রেমটি

আইসোট্রোপিক, সর্বত্র সমান। সুতরাং সময়ের ঘড়ির যদি পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনটিও সর্বত্র এক হবে। যা পৃথিবীর সময়, সেই সময়টিকে সব অবস্থায় সবদিকে প্রযুক্ত করা যাবে। বিশ্ব-জগতের সময়, যাকে কসমিক টাইম বলা হয়, সেটি পার্থিব সময়ের সঙ্গে মিল টানে। অতএব পার্থিব সময়ের হিসেবে বিশ্ব-জগতের সময়টি হিসেব করা যাবে!



ফ্রীডমানের মডেল

ফ্রীডমানের মডেলে অথবা গণিতে, মহাবিশ্বের সব পদার্থ যে চাপ বা প্রেসার সৃষ্টি করে সেটি তিনি বাদ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে এই প্রেসার কিন্তু আইনস্টাইনের মতে, মহাকর্ষের উৎস হতে পারে। ফ্রীডমান দেখেছিলেন যে মহাজাগতিক বস্তুদের ভর এই প্রেসার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী—কারণ এই প্রেসার প্রধানত বিকিরণের ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। আরো একটি বিশেষত্ব ফ্রীডমানের গণিতের সমাধানে লক্ষ্য করা গেল;—সবকটি বিকল্পে বৃদ্ধির হারটি উলটো পথে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন কমে আসে। হয়তো অতীতে কোনো একসময়ে যখন বৃদ্ধির সূচনা হয়, তখন সব গেলাক্সিপুঞ্জ একত্রে যেন জোট বেঁধে ছিল।

ফ্রীডমানের তিনটি মডেলের দুটিতে থাকে ক্রমবর্ধমান বিশ্বলোকের ছবি। তৃতীয়টি জানায় বৃদ্ধি সংকোচনের দোলনার দোলা। প্রথম মডেলে, বিশ্বলোকের মহাজাগতিক বস্তুর ডেনসিটি অথবা ঘনত্ব কম ধরা হয় বলে এখানে মহাকর্ষের টান কম। গেলাক্সিরা তাই পারস্পরিক আকর্ষণ ছিন্ন করে দ্রুত সরে যেতে পারে। দ্বিতীয় মডেলে ডেনসিটি কিছু বেশী বলে বৃদ্ধির ধারা কমে আসে, তবু মহাকর্ষের টান এত বেশী নয় যে বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিতে পারে। তৃতীয় মডেলে ডেনসিটি বেশী, যথেষ্ট বেশী—তাই বৃদ্ধি শুধু যে থামে, তা নয়; এটি যেন বৃদ্ধিটিকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে টেনে নীচে নামিয়ে আনে—শেষ হয় নিউটনের কথিত ব্লব-এ যেখানে সব মেটার একটি বিন্দুতে সংহত-সংবদ্ধ হয়ে থাকে।

বিকল্প তিনটি যেন জ্যামিতির তিনটি ধারার কথা জানায়: রীমান, ইউক্লিড ও বোলাঈ লোবোচিওস্কির জ্যামিতি। x অক্ষরেখা থেকে দেখলে দেখা যায় রীমানের জ্যামিতিতে স্পেস বাঁকে ভিতরের দিকে; ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কোন বাঁক নেই; আর বোলাঈ লোবোচিওস্কির জ্যামিতিতে বাঁক বাইরের দিকে। প্রথম মডেলে যেখানে বৃদ্ধির ফলে স্পেস দ্রুতধাবমান, সেখানে যেন বাইরের বাঁকের নকশা—এটি বোলাঈ-লোবোচিওস্কির ছক। দ্বিতীয় মডেলেও বিশ্বলোক বর্ধমান, তবে বৃদ্ধির হার ধীর, এটি ইউক্লিডের ছক। দুটি মডেলেই বৃদ্ধি

আছে ; বিশ্বলোক যেন অসীম অপারে ছুটে চলে যায়। তৃতীয় মডেলে রীমানের ছক ; এখানে মেটারের ডেনসিটি খুব বেশী হলে এটি জানাবে আইনস্টাইনের স্থির বিশ্বলোক, যা সসীম। অন্যদিকে ফ্রীডমানের উপপত্তিতে এটি যেন আন্দোলন, যা বৃদ্ধি থেকে সঙ্কোচনের দোলায় চেপে চলে। যেখানে স্পেসের বৃদ্ধির জগতে সব গেলাক্সিপুঞ্জ ফাঁদে পড়ে আটকে আছে। পরিবর্তন ঘটে শুধু তাদের মধ্যের দূরত্বের স্কেলে।



আইনস্টাইনের মডেলে বিশ্বলোকের মেটারের ডেনসিটি বেশ বেশী ; স্যার আর্থার এডিংটনের এখানে আপত্তি। হাবলের পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যে জানা যায় বিশ্বলোক বর্ধমান। তবে একি চির বর্ধমান – যা ডাচ বিজ্ঞানী উইলেম ডিসিটারের (1872-1934) মডেল ; যেখানে শুধু স্পেস বেড়ে যায়— যে স্পেসের কোন মেটার নেই। অথবা এটি কি এডিংটন-লামেটারের মডেল—যে মডেলে মহাজাগতিক বিকর্ষণ ক্রিয়াকলাপে নামে ; যেখানে পাওয়া যেতে পারে অসীমবৃদ্ধি অথবা কোন এক ক্ষণে, যখন আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পরস্পরের সমান, তখন পাওয়া যায় স্থির বিশ্বলোক। এই অবস্থাটিকে বলা হয় সমুদ্রসীমানা (Coasting) ;— বিশ্বলোক অসীম সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার আগে যেন স্থির হয়ে আছে ; কারণ সামান্য পরিবর্তনে বিশ্বলোক স্থির অবস্থা থেকে ঝাঁপ দিতে পারে বৃদ্ধির দিকে ! এই স্থিরত্বের সময়টি কি হবে তার ধারণা নেই। বিকর্ষণের মানটিকে যদি আইনস্টাইনের মান ধরা যায় তবে এই স্থিরত্ব চিরকালের। অর্থাৎ এডিংটন-লামেটারের মডেলে যেখানে বর্ধমান বিশ্বলোকের ছবি থাকে,সেখানে,যেকোনো একটি অবস্থায়, মহাবিশ্ব স্থিরত্ব পেতে পারে। এই সব মডেলের বিশ্বলোক বর্ধমান। এবং এই বর্ধমান বিশ্বলোকের একটি জন্মলগ্ন থাকবে, থাকবে যাত্রাবিন্দু।

এই যাত্রাবিন্দু কি ? বর্ধমান বিশ্বলোকের ছবি যদি আঁকা হয় তবে দেখা যায় এই বৃদ্ধির পথের সূচনাটি সত্যি যেন এক বিন্দু – যেখানে বিশ্বলোকের সব মেটার পুঞ্জীভুত হয়ে জমাট বেঁধে আছে। অর্থাৎ সব গেলাক্সির সব মেটার একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। আর এই বিন্দুমাত্রিক স্থানে মেটারের পদার্থের ডেনসিটি হবে অসীম। রিলেটিভিটি তত্ত্বে এই অবস্থাকে বলা হয় সিংগুলারিটি। নক্ষত্রের কোলাপ্সে, ব্ল্যাকহোলের শেষ পর্যায়ে সিংগুলারিটি আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সুব্রাহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরের ব্ল্যাক হোলে মেটারেরা সৃষ্টির শেষ অবস্থায় সিংগুলারিটি অবস্থা পেতে চলে – সেটি মৃত্যুক্ষণ। আর জন্মক্ষণেও ধরা পড়ে সিংগুলারিটি। জন্ম-মৃত্যুক্ষণ সিংগুলারিটির উদাসীন বন্ধনে বাধা পড়ে থাকে। ফ্রীডমানের মডেলে সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায় এই সিঙ্গুলারিটি ; —যেটি ফ্রীডমান শিষ্য জর্জ গেমো জানিয়েছেন।

সিঙ্গুলারিটিতে বাঁধা মেটারের ঘনত্ব অসীম, ভর অসীম। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-গণিত বা ফিল্ড ইক্যুয়েশন এই অবস্থার বর্ণনা দিতে পারে না ; দেশকালতত্ত্ব এখানে ভেঙে পড়ে। বাস্তবে সিঙ্গুলারিটি অবস্থার অনেক আগে সাধারণতত্ত্ব খেই হারিয়ে ফেলে। সেই সময়ে ভাবা হয় মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব হয়তো এই ছোট দৈর্ঘ্যে ছোট আকারে খাটবে। কিন্তু কোয়ান্টা তত্ত্বেরও একটা নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে —সেটি একটি হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস। এই ছোট জগতের চৌহদ্দিতে কোয়ান্টাম-মহাকর্ষ তত্ত্ব খাটে। কিন্তু যেটি জ্যামিতিক বিন্দু, যা সিঙ্গুলারিটি, সেখানে এই তত্ত্ব দিশেহারা। দেশকালের বোধ এখানে নেই ; এই ধারণা তখনই ফিরে আসে যখন সিংগুলারিটির পর বর্ধমান বিশ্বলোকের সূচনা দেখা দেয়— মেটারকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এককথায়, বৃদ্ধির শুরু মানে সেই মহাজগতের সৃষ্টি যে জগৎটিকে আমরা ফিজিক্স দিয়ে চিনতে পারি। সিঙ্গুলারিটি অবস্থায় ফিজিক্স, যুক্তি, স্থায়িত্ব—কোন কিছু খাটে না। কারণ সেই অবস্থায় দৃশ্যমান জগতের কোন ছাপ নেই। সিংগুলারিটির সীমারেখা দিয়ে ঘেরা অচেনা অজানা সৃষ্টির রহস্য,—যার নিয়ম জানার বা বোঝার উপায় এখন পর্যন্ত মানুষের হাতে নেই।

ফ্রীডমানের মডেলে গণিতের ছকে প্রেসারকে বাদ দেয়া হয়েছিল। অথচ যখন সব বস্তু সংকুচিত হয়ে সিংগুলারিটি অবস্থা পেতে চলে, সেখানে সঙ্কোচনের বিপরীত মুখে এই প্রেসার কাজ করে ; সম্পূর্ণ সঙ্কোচন হয়তো ঘটে না। এই অবস্থাটিকে সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্ল্যাক হোল মডেলে দেখা গেছে। হয়তো এই কারণে R_s ব্যাসার্ধটি শূন্য অবস্থা নাও পেতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এটি কিন্তু নাও ঘটতে পারে। আইনস্টাইন জানিয়েছেন প্রেসারটি মহাকর্ষের উৎস হতে পারে। এই প্রেসার, যা বিকিরণের ফলে উদ্ভুত, এটি মেটারের ডেনসিটির চেয়ে প্রথম অবস্থায় বেশ ক্রিয়াশীল, আর সেই কারণে মহাকর্ষের আকর্ষণে সঙ্কোচনের ধারাটি থামানো যায় না ; $R_s = 0$ অবস্থা পাওয়া যায়। ফ্রীডমানের মডেলে, যেভাবে দেখা হোক না কেন, সিঙ্গুলারিটির দেখা পাওয়া যায় ; একে ঠেকানো যায় না। অন্যদিকে তাঁদের তত্ত্ব থেকে এই সিংগুলারিটির আচার-ব্যবহারের কোন বার্তা পাওয়া যায় না। এই সিংগুলারিটি থেকে বৃদ্ধির পথে দেশকালের মেটারের উদ্ভব। এটি যেন ব্ল্যাক হোলের উলটো ধারা ; যেখানে সময় বিপরীতমুখী ; যেখানে ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টির শুরু। এই বিস্ফোরণ হলো বিগ ব্যাঙ (Big Bang)।

যে কোন পার্থিব বস্তুর মত সংকুচিত অবস্থায় মহাজগৎ প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল। আর যখন সে বৃদ্ধির পথে যাত্রা করে তখন শীতল হয়ে ওঠে। তাপ বিজ্ঞানের এই রীতি মহাজগতেও প্রযোজ্য। হাবলের দেখা বর্ণালীর লালের দিকে সরে যাওয়ায় আরো একটি কারণ বৃদ্ধির জন্য আলোর শীতল অবস্থা পাওয়া। এই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ধরা হয়, সঙ্কোচনের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় যে উত্তাপ

ছিল বিগ ব্যাঙ বিস্ফোরণের পরও সেই সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র অবস্থায় উত্তাপ বজায় ছিল ; —মহাজগতের উপকরণরা প্রচণ্ড উত্তাপের উথাল-পাথাল ঢেউয়ে কী অবস্থাতে ছিল তার কল্পনাও বুঝি সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে বলে Primeval Fireball বা প্রাথমিক অগ্নিগোলক যুগ। এই যুগ সম্পর্কে কোন সংবাদ, কোন তথ্য জানার উপায় বর্তমান ফিজিক্সে নেই। যা মনে করা হয় তা হলো বিগ ব্যাঙ এর 10^{-43} sec এর পর মহাজগৎ এমন একটা আকার পায় (10^{-35}m দৈর্ঘ্য) যেখানে কোয়ান্টাম গ্রেভিটি হয়তো প্রয়োগ করা যাবে ; এর নীচে আরো ছোট দৈর্ঘ্যে কি ঘটছে, ঘটতে পারে সেটি জানার কোন হাতিয়ার বর্তমানে নেই। আর এই বৃদ্ধির শুরু হবার 10^{-6} sec পর টেম্পারেচার দাঁড়ায় কয়েক বিলিয়ন ডিগ্রীতে। ছোটকণার জগতে 10^{-6} অনেকটা সময়। এই সময়ের পরিমাপে যদি মহাজগৎকে দেখা যায়, তবে ভাবা যেতে পারে প্রাথমিক অবস্থার কয়েক মাইক্রো সেকেন্ড পর প্রচণ্ড তাপ ও চাপে সব উপকরণ ভেঙে চুরে পড়ে থাকে ; এদের মধ্যে ক্রিয়া করে ইন্টারএকশন বা অন্তর্ক্রিয়া, আর বজায় থাকে তাপঘটিত সাম্য অবস্থা। এই সব উপকরণদের এলোমেলো ক্রিয়াকলাপের কথা, ইতিবৃত্ত, এখনো বিজ্ঞানের অজানা। কণা পদার্থবিদ্যা অথবা পার্টিকল ফিজিক্সের ধারণাতেও এই অবস্থা বিচার করার ক্ষমতা নেই ; এবং নেই জাগতিক কোন লেবরেটরিতে এই অবস্থা সৃষ্টি করার মত যন্ত্র। হয়তো সময়ের সেই ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশকালে চেনা কণারা হাজিরা দিতে পারে, অথবা আসতে পারে নতুন একদল কণা যারা কোনদিন আর ফিরে দেখা দেয় না !··বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচার দ্রুত কমতে থাকে। টেম্পারেচার যখন দাঁড়ায় 10^{12} ^{0}k তখন ফায়ারবলে লেপটন যুগের শুরু। এই অবস্থায় পাওয়া যায় প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, মিউঅন, নিউট্রিনো আর নানা ধরনের একত্রে ফোটন জাতীয় বিদ্যুৎ চুম্বক বিকিরণ। এই বিকিরণের তাপ এতই বেশী যে এখান থেকে ইলেকট্রন পজিট্রনের যমক তৈরি হতে পারে। টেম্পারেচার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে মিউঅন অদৃশ্য হয়। দশ সেকেন্ড পর তাপ দাঁড়ায় মাত্র কয়েক বিলিয়ন ডিগ্রী টেম্পারেচারে ;—আর তখনই প্রোটন-ইলেকট্রন এবং নিউট্রনের খেলা শুরু হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় প্লাজমা অবস্থা। এই আপাত শীতল অবস্থায় প্রোটন নিউট্রন-ইলেকট্রনরা জোট বাঁধতে পারে ; হাইড্রোজেন, হিলিয়াম বা অন্যান্য কয়েকটি হাল্কা প্রাথমিক মৌল বা এটমের সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিসেব নিকেশ করে জানা যায় সম্ভাব্য সব অংশী প্রোটনের এক-চতুর্থাংশ মত অংশ হিলিয়াম আর সামান্য ডিউটেরিয়াম বা লিথিয়াম তৈরি করে, আর এই অংশ হলো ফায়ারবলের উপকরণের শতকরা 10 ভাগ মাত্র। বাকি সবই হাইড্রোজেন। মহাজগতে নক্ষত্রলোকের উপকরণে যা পাওয়া যায়, তা এই হিসেবটিকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

ফ্রীডমানের নকশায় আঁকা ফায়ারবলের সম্ভাবনাটিকে নাকচ করা যাচ্ছে

না। অন্যদিকে প্লাজমা যুগের পরিমাণ হলো প্রায় 700,000 বছর ; তারপর টেম্পারেচার কমে দাঁড়ায় প্রায় 4000°k-এ যা কিনা সূর্যের বাইরের তাপের চেয়ে কিছু কম। এই সময়ে সৃষ্টি হতে থাকে অন্যান্য মৌল ; ধরা পড়ে মহাকর্ষের আকর্ষণ। গ্যাসের কুণ্ডলি পাক খেতে খেতে তৈরি করে গেলাক্সি, তারকা অথবা গ্রহ। ফায়ারবলের তাপ মহাজাগতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে। বিস্ফোরণের প্রায় বিশ বিলিয়ন বছর পরে এই তাপ এখন মাত্র 3°k,—তরলবায়ুর চেয়েও তাপ কম। এই ফায়ারবলের শ্রুতি নেই, তবু স্মৃতি কিছু পাওয়া গেছে। দুজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) এবং রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) 1965 সালে প্রাথমিক ফায়ারবলের বিচ্ছুরণের কিছু ফসিল বিকিরণকে ধরতে পারলেন। এদের বলা হয় মহাজাগতিক পটভূমির বিকিরণ অথবা কসমিক ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন। সৃষ্টির আদি প্রভাত থেকে এই বিকিরণ প্রায় বিশ বিলিয়ন বছর ধরে চারদিক থেকে পৃথিবীকে আঘাত করে যাচ্ছে ; জানিয়ে যাচ্ছে যে প্রায় বিশ বিলিয়ন বছর আগে মহাজগৎ এক অতি ঘন বিস্ফোরক অবস্থার কাছাকাছি ছিল।

ফ্রীডম্যান শিষ্য জর্জ গেমো 1948 সালে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। ফ্রীডম্যানের মডেলের যাত্রাবিন্দুর তত্ত্বতালাশ খোঁজ খবর চেনা জানা ফিজিক্সে নেই। অথচ বিস্ফোরণের $\frac{1}{100}$ সেকেন্ড পর, গোলমেলে সিঙ্গুলারিটি থেকে সরে গিয়ে বিশ্বলোক যখন অসীম ঘন অবস্থায় হাজির হয়, যখন প্লাজমা যুগের সূচনা, তখন সেই আদিম বিশ্বলোকের প্রোটন-ইলেকট্রন-নিউট্রনের এক চতুর্থাংশ তৈরি করবে হিলিয়াম আর সামান্য কিছু ডিউটোরিয়াম। গণিতের ভাষায় গেমো যা জানালেন, বর্তমান বিশ্বলোকের সংবাদপত্রে সেই একই খবর ছাপা। আবার গেমো আর তাঁর সহযোগীরা জানালেন যে ঐ বিস্ফোরণের কালে যে তাপ সেদিন পাওয়া গিয়েছিল সময় ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তাপ কমে গিয়ে বর্তমানে দাঁড়াবে প্রায় 6°k তাপাঙ্কে ! বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মহাবিশ্বের বর্তমান তাপাঙ্ক হলো 2.7°k। কাজেই পেনজিয়াস ও উইলসনের পাওয়া বিকিরণটিকে সেই আদিম বিস্ফোরণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। অন্য কারণও অবশ্য ছিল। যে শব্দপ্রবাহ তাঁদের যন্ত্রে ধরা পড়েছিল, পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল সেই শব্দ তরঙ্গের উৎস সৌরলোক বা গেলাক্সি নয়। এটি কসমিক—মহাজাগতিক। 1965 সালে ডিক (Dicke) এবং তাঁর সহযোগীরা অন্য একটি পদ্ধতিতে গেমোর পাওয়া উত্তরটিকে পেলেন। তাঁরা বললেন মহাজাগতিক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্য মান হবে 3 cm বা তার কাছাকাছি। সেই বছরেই পেনজিয়াস উইলসন পেলেন 7.3 cm দৈর্ঘ্যের বিকিরণ। এই বিকিরণটির পরিচয় ডিক এবং তাঁর সহযোগীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাঁরাই জানালেন বিগ ব্যাঙ তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই তরঙ্গ সেদিনের বিস্ফোরণের স্মৃতি ! বিগ ব্যাঙ বা সে জাতীয় বিস্ফোরণ হয়তো কোনদিন ঘটেছিল।

সিঙ্গুলারিটির যে অবস্থা থেকে বিগ ব্যাঙ এর সৃষ্টি, সেটিকে কোন চেনাজানা তত্ত্বে জানা যায় না। সিঙ্গুলারিটির এনাটমি প্যাথোলজিটি বোঝা যাচ্ছে না। হকিং এবং এলিস তাঁদের তত্ত্বে সিঙ্গুলারিটির নিশ্চিত আবির্ভাবটি পেলেন। তবু সেই একই তত্ত্বে জানা গেল, সব বস্তু হয়তো সংকোচনের ফলে সিঙ্গুলারিটি অবস্থায় নাও যেতে পারে। যেমন, যাত্রীরা ট্রাম-বাস-ট্রেন-প্লেন মিস করে, বস্তুরাও তেমনি সেই অন্তিম বিন্দুতে যাত্রাটি মিস করতে পারে। দেশকালের তীক্ষ্ন বন্ধনীতে গড়া সিঙ্গুলারিটিতে হয়তো সব বস্তু থেঁতো হয়ে জমা পড়তে নাও পারে। তার আগেই বস্তুরা ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। এখানেও ফায়ারবল বা অগ্নিগোলকের অবস্থা থাকে; তবে সৃষ্টি একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে শুরু না হয়ে, ছোটখাট 'আমি আসছি হে' আওয়াজটি দিয়ে শুরু হতে পারে। হকিং-এলিসের এই তত্ত্বটিকে বলা হলো আর্তনাদ বা হুইমপার তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বিশ্বের সব পদার্থ জমাট বেঁধে একটি অসীম ঘনত্ব বা ডেনসিটির একটিমাত্র সিঙ্গুলারিটির সম্ভাবনাটি নাকচ করছে; তবু এখানেও সৃষ্টির একটি জন্মকাল থাকছে।

ফ্রীডমান বা অন্য সব মডেলের সৃষ্টি আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্র গণিতটিকে ভিত্তি করে। এদিকে আইনস্টাইনের নিজের মডেলে সৃষ্টির কোন জন্মলগ্ন নেই; এই মহাজগৎ স্থির। অথচ পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য জানায় মহাজগতের একটি সৃষ্টিকাল আছে এবং বর্তমান মহাজগৎ বর্ধমান। অতএব স্থির বিশ্বটি পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পাসমার্ক পাচ্ছে না; এই আইডিয়াটিকে সঠিক বলে ভাবা যায় না। আইনস্টাইন স্বয়ং পরবর্তীকালে নিজের ভুলটি স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, স্থির বিশ্বের চিন্তা তাঁর জীবনের বিরাটতম ভুল। তবু এই স্থির বিশ্বের গঠন কল্পনাটি বিজ্ঞানীদের চিন্তাজগতে বারবার হানা দিয়েছে। এখনো দেয়!

বিশ্বজগতের অন্যান্য মডেল পাওয়া গেল বিজ্ঞানীদের হাতে। এটি দুভাবে গড়ে ওঠে। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র গণিতের পরিবর্তন এনে অথবা গ্রেভিটেশন বা মহাকর্ষ ধ্রুব নয়, এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে এই আইডিয়াটিকে প্রকাশ করে।

সেকালীন চিন্তা ও তথ্যের সাপেক্ষে তাঁর ক্ষেত্র গণিতের ছকটি পরিবর্তন করে কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট এর প্রয়োগ করে আইনস্টাইন মহাজগতের স্থিরত্বটি ঘোষণা করেছিলেন। নতুন টার্মটি মহাজগতের অনেক রহস্যকে বরবাদ করে দিয়েছিল। নতুন টার্মটি হলো তাঁর ল্যামডা, যেটি জানায় মহাজগতের প্রতি অংশে একটি 'সর্বস্পেসিয়' বিকিরণ শক্তি কাজ করবে। মহাকর্ষের আকর্ষণ আর মহাজগতের বিকর্ষণ—এ দুটিতে সাম্যভাব এনে আইনস্টাইন বিশ্বলোকের স্থিরত্বটি জানালেন। তবু এই সাম্যসমতার ভাব যেন একটি সুতোর উপর ব্যালেন্সের খেলা; সামান্য এদিক ওদিক হলে পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ

সংকোচের ফলে কোলাপ্স বা ধ্বংস, অথবা অসীম বৃদ্ধি। আইনস্টাইনের মহাজগৎটি দুর্গম পথে ক্ষুরের তীক্ষ্ণতার উপরে বসানো। তবুও এই স্থির মডেলটি বড় সুন্দর। এটিকে বাদ দিতে বিজ্ঞানীদের মন চায় না।

1946 সালে দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হার্মান বন্ডি (Hermann Bondi) এবং টমাস গোল্ড (Thomas Gold) একটি উপপত্তির ঘোষণা করলেন। বিশ্বজগৎ তার বৃদ্ধিটি নিয়েও সর্বত্র সবদিকে যেন এক;পরিবর্তন শুধু স্কেলের। স্পেসের সাপেক্ষে যেমন বৃদ্ধিটি একই ধরনের, স্কেলের তফাতে বোঝা যায় সময়ের সাপেক্ষেও এটি একরকম থাকবে। স্কেলের পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে। এই অবস্থা যদি ঘটে, তবে দেশকালের রীতিতে বিশ্বজগতের পরিবর্তনের ধারণাটি ভিন্ন ভাবে বুঝতে হবে। মহাজগতের সার্বিক পরিবর্তনটি বোঝা যায় না ; এটি হয়তো বাড়ছে ; বাড়ার হার সর্বত্র সমান, সবসময়ে সমান। সাধারণ অবস্থায় এই বৃদ্ধি আনবে ঘনত্ব-ডেনসিটির অবলোপ অথবা ক্ষয় ; যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিটি তার স্থির হার বজায় রাখে না ; কারণ ডেনসিটি কমে যাওয়া মানে মহাকর্ষের আকর্ষণে ঘাটতি দেখা দেওয়া ; বস্তুদের নিজস্ব টানটি কমে যায় ; পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে ; দূরত্ব বেড়ে চলে। স্থির বিশ্বলোকের সবদিকে সর্বত্র সবসময়ে বৃদ্ধি বিশ্বলোকের নির্দিষ্ট বর্তুল আকারটি বজায় রাখতে সাহায্য করে না। আইনস্টাইনের গণিতের ছকে এই গোলমেলে ঘটনার স্বীকৃতি আছে, আছে এডিংটন-লামেটারের অভিযোজনায়। বন্ডি ও গোল্ড এই গোলমালের একটি কাটান খুঁজলেন। তাঁদের তত্ত্বের গাণিতিক ছকে তাঁরা দেখালেন যে গেলাক্সির মধ্যে যে ক্রমাগত বর্ধমান শূন্যতা দেখা দেয়, শূন্যতার সেই ফাঁক ফোকর গুলোর নতুন নতুন গেলাক্সির সৃষ্টির ফলে ভরাট হয়ে ওঠে, মহাজগতের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি হয়ে চলে। এই তত্ত্বে মহাজগতের বৃদ্ধিটিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। মানা হচ্ছে তার আকৃতির বর্তুলরূপটি। তত্ত্বে নেই মহাজগতের জন্মলগ্ন ; নেই বিগ ব্যাঙ জাতীয় সৃষ্টিক্ষণ। নবনব বস্তুর সৃষ্টি প্রতিমুহূর্তে ঘটে যায়। গতির সাপেক্ষে মহাজগৎ স্থির নয় ; কিন্তু অবস্থানের সাপেক্ষে যেন স্থির। কারণ গেলাক্সি-নক্ষত্রজগৎ তাদের জন্মমৃত্যু বৃদ্ধি নিয়ে থাকলেও, নতুন নতুন সৃষ্টির ফলে বর্ধমান জগৎটি একই ভাবে বস্তুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই স্থিরাবস্থা বা স্টেডিস্টেটে মহাজগতের বৃদ্ধি থাকে ; তার জন্মলগ্ন থাকলেও থাকতে পারে ; তবে তার কোন মৃত্যু নেই ! এবং জন্মলগ্নে সংশয় থাকে। এই মডেল যেন সহসা তার বর্তুলাকারটি নিয়ে গড়ে উঠেছে ; পূর্ণযৌবনা উর্বশী যেন !

এখানে প্রশ্ন ওঠে, নতুন নতুন বস্তু কি করে সৃষ্টি হবে। এর উত্তরে এক চমৎকার অথচ বিচিত্র তত্ত্ব জানালেন ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এবং জয়ন্ত্-নার্লিকার (Jayant Narlikar)। তাঁরা বললেন, মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে কোয়ান্টায়িত কণার উদ্ভব সম্ভব। এই সৃষ্টি সামান্য, তুচ্ছ। তবুও মহাকর্ষ

ক্ষেত্রের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাটি তাঁরা গণিতের একটি ভাষারূপে বর্ণনা দিলেন। হয়েল এক নতুন ক্ষেত্রের কথা ভাবলেন। সৃষ্টির ক্ষেত্র, ক্রিয়েশন ফিল্ড বা C ফিল্ড। এই ফিল্ডে থাকে নেগেটিভ শক্তি। যে কোনো কণার সৃষ্টি হলে এই নেগেটিভ শক্তি বেড়ে যায়—ফলে শক্তির ক্ষমতা বজায় থাকে। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র গণিতের কোনো ওলোটপালট ঘটে না। অবশ্য পার্টিকল ফিজিক্সের ক্ষমতার সব নিয়ম-কানুন এক্ষেত্রে বজায় থাকছে না। যা হোক এত সত্ত্বেও সৃষ্টির পরিমাণটি খুবই সামান্য। একটি মোটামুটি এক কিউবিক কিলোমিটার জমির সমান জায়গায় সৃষ্টি হবে বছরে একটি মাত্র হাইড্রোজেন এটম। এমনিতে এই সৃষ্টি কিছুই নয়; তবু স্পেসের বিরাটত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এটি হরেদরে দাঁড়ায় বিরাট একটা কিছু। এটিই ঘনত্বের ক্ষয়টিকে রোধ করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। বৃদ্ধি ঘটে, তা শুধু স্কেলের পরিবর্তনে ধরা যায়। ঘনত্বের অবক্ষয় বা অবলোপ ঘটছে না। হয়েল-নার্লিকারের এই থিসিসটি বেশ পপুলারিটি পায়। কিন্তু ব্যাগগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের আবিষ্কার ই তত্ত্বটিতে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এটিকে এখন একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

1937 সালে পল ডিরাক একটি আইডিয়ার ঘোষণা করেন। এডিংটনের চোখে একটি মজার জিনিস ধরা পড়েছিল—মহাবিশ্বে সর্বত্র যেন একটি বিরাট সংখ্যার আবির্ভাব হচ্ছে। মহাজগতের আকার ইলেকট্রনের আকারের চেয়ে 10^{39} গুণ বড়। কণার জগতে বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি মহাকর্ষের চেয়ে 10^{39} গুণ বেশী শক্তিশালী। এটমিক ইউনিট অনুযায়ী মহাবিশ্বের বয়স 10^{39} ইত্যাদি। অবশ্য এই যে রাশিগুলি পাওয়া যায়, এটি জানাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি বা অবস্থান ও সময়কে ভিত্তি মেনে নিয়ে। কারণ মহাজগৎ ক্রমবর্ধমান। ডিরাক বললেন, এই যে অনুপাত, এই অনুপাত সব সময়ে এক রাশি জানাবে। মহাজগৎ যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কমে আসে মহাকর্ষের মান, দুইটি সময়ের উপর নির্ভর করবে। মহাকর্ষের বৃদ্ধির ধারা হাবলের ধ্রুবকে জানা যায়। ডিরাক বললেন, সময়নির্ভর এই বৃদ্ধি আর সময় বাড়লে মহাকর্ষের মান কমে যাবে; $G \propto \frac{1}{t}$। এই আইডিয়ার ভিত্তিতে ডিরাক গণিতের ছকে মহাজগতের যে মডেল পেলেন সেটি ফ্রীডমানের মডেলের সঙ্গে মিল টেনে আসে; শুধু জন্মক্ষণে তফাত। ডিরাকের বিশ্বলোকের বয়স মেরেকেটে মাত্র দশ বিলিয়ন বছর। অন্যদিকে জানা গেছে শুধু গেলাক্সিদের বয়সই দশ বিলিয়ন বছর। মহাজগতের বয়স নিশ্চিত দশ বিলিয়নের বেশী—এটি দশ থেকে বিশ বিলিয়নের মধ্যে। চেনা-জানা তথ্যের ভিত্তিতে বছরের হিসেব কষে ডিরাকের তত্ত্বটিতে ভুল পাওয়া যায়। তবু পাসকয়েল জোর্ডান (Pascual Jordan), কার্ল ব্রানস (Carl Brans) এবং রবার্ট ডিক (Robert Dicke) ডিরাকের আইডিয়ার একটি নতুন আকার দিয়ে, মহাকর্ষ শক্তির মান সময় অনুসারে কমে এটিকে ভিত্তি করে একটি নতুন

তত্ত্ব প্রকাশ করলেন—এটিই আইনস্টাইনের তত্ত্বের সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বী। এই তত্ত্বে সময়ের স্কেলের সমস্যাটি খুব একটা ভয়াবহ কিছু নয়।

হয়েল এবং নার্লিকারও সময়ের উপর নির্ভরশীল গ্রেভিটেশনের ধ্রুবকের পরিবর্তন মেনে নিয়ে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। মাকের অনুমানটিকে ভিত্তি করে এঁরা দেখলেন, দূরের জগতে বিভিন্ন বস্তুদের নিজেদের উপর অন্তর্ক্রিয়ার ফলে G এর পরিবর্তন হয়। এছাড়া 1977 সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে তাঁর তত্ত্বের একটি পরিবর্তিত রূপ প্রকাশ করলেন ডিরাক। সবকিছু এখন নির্ভর করছে G এর মানটির উপর;—সে নিত্য, ধ্রুব, না সে পরিবর্তনশীল!

1976 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্লানডের্ন (T. V. Flandern) অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন মহাজগতের সময়ের সাপেক্ষে মহাকর্ষ ধ্রুবক G এর মান কমে আসে। G একটি কনস্ট্যান্ট নয়। ফ্লানডের্ন যে তথ্যের ভিত্তিতে এই ঘোষণাটি করলেন, সেই পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্বটির পরিবর্তন দরকার ; কারণ তাঁর তত্ত্বে G কে তিনি একটি 'ঈশ্বর দত্ত' (God given) অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক বলে জানিয়েছেন। অথবা অন্য কোন মৌলিক ধ্রুবকের পরিবর্তনের কথা ভাবা হবে, যেটি মহাজাগতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে।

1975 সালে শাপিরো (Shapiro) জানালেন 10^{10} বছরে G এর মান যে এক অংশমাত্র কমে আসে সেই তথ্য পরীক্ষায় পাওয়া সম্ভব। আগামী দশ বছরের মধ্যে এই প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবু 1983 সালে এই সমস্যাটি এখনো যেন সমাধান থেকে দূরেই থেকে যাচ্ছে।

মহাজগতের সৃষ্টি যদি থাকে, তার শেষও থাকবে। শেষটা কি? বর্ধমান বিশ্বলোক মানে কোনো এক যাত্রাবিন্দু থেকে মহাবিশ্ব দৌড় শুরু করে দেশকাল ক্রমাগত বেড়ে চলে। যদি এটি কোনো একসময়ে সঙ্কোচনের পথে আসে, তবে এটি ফিরে যায় একটি যাত্রা শেষ বিন্দুতে—যেখানে দেশকাল বা মেটার সব কিছু কোলাপ্স বা ধ্বংসের পথে গিয়ে আকার সত্তা হারিয়ে ফেলে ; যেখানে চেনাজানা ফিজিক্সের শেষ ; যেখানে মহাজগতের ধ্বংস!

অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বিশ্বলোকের শেষ এক সম্পূর্ণ ভগ্নস্তুপ জঞ্জালের তুষারে। মহাজগৎ যদি বেড়ে যায়, তবে তাপগতি বিজ্ঞানের সাম্যবোধ টেঁকে না। দুটি গেলাক্সির মাঝখানের ফাঁকটি বেড়ে যায়। যত তাপই গেলাক্সি বা নক্ষত্র ঢালুক, সেই তাপটি ঐ বিরাট স্পেসটাইমের জগৎটির উত্তপ্ততাটি চিরকাল স্থির করে রাখতে পারবে না। নক্ষত্র তার তাপ সৃষ্টির উপকরণ হারিয়ে সাদা তারা, নিউট্রন তারা হয়ে ফুরিয়ে গিয়ে সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্ল্যাক হোলে শেষ হয়। কোনো কোনো অংশের জীবন্ত জ্বলন্ত ছোট তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিত গতিতে সেই ব্ল্যাক হোলে পড়ে হারিয়ে যেতে পারে। হয়তো সেই ব্ল্যাক হোল থেকে সুপার

নোভা বিস্ফোরণের মত কোন এক বিস্ফোরণের ক্রিয়ায় নতুন তারা জন্ম নিতে পারে ; তবু হিমশীতল স্পেসে দু-একটি জোনাকির মত আলোর স্পন্দন নিয়ে কয়েকটি তারা ইতস্তত থাকতে পারে। সেই অন্ধকার ভরা শূন্যতার সাম্রাজ্যে ঘটনা বা ইভেন্ট যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। হয়তো দুএকটি মৃত তারকার কলিশন-ধাক্কায় হঠাৎ মহাকর্ষ তরঙ্গ জেগে উঠতে পারে ; তবে সে হয়তো অবরে সবরে, কখনো সখনো। নইলে সেই শীতলতায়,—অন্ধকারের নিঃসীমতায়, সব কিছুর শেষ !

ধীরে ধীরে মহাজগতের হারিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। এই অবস্থাটি কি মেনে নেওয়া যায় ? স্টেডিস্টেট মডেলে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই ; সেখানে সৃষ্টির অফুরন্ত প্রবাহে বৃদ্ধি থাকে, থাকে তাপের ক্ষমতা। এই মডেলটি ভালোলাগার, ভালোবাসার। এটি সব শেষের নৃশংসতা জানায় না। অথবা ফ্রীডমানের তৃতীয় মডেলটি ; যেটি রীমানের ছকে আঁকা ; যেটি এক বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে অন্য যাত্রা বিন্দুতে শেষ হবার কাহিনী শোনায় ; সেটি যদি ঘটে তবে ? তবু সেও যে মৃত্যু ঘোষণা করে ; সব কিছু থেঁতো করে জমাট করে কীচক বধের পালা শোনায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, না ; এই যে মৃত্যু, এটি সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। কোয়ান্টা গণিতে জানা গেছে ক্রিয়েশন-এনিহিলেশন, সৃষ্টিলয় দুটি রূপান্তরিত অবস্থা, একটি আরেকটির রূপান্তর। যাকে মনে হয় সৃষ্টি, সে আরেকটি অবস্থার বিলোপ ; আর যাকে মনে হয় লোপ, সেই অবস্থায় একটি সৃষ্টির উপক্রমণিকা জাগে। সৃষ্টি লয় চিরপ্রবহমান। এ সত্য বিশ্বলোকের পটভূমিতে আছে।

1054 সালে চীন দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখেন—যেটি ভেনাস অথবা শুকতারার চেয়ে অনেক অনেক গুণ উজ্জ্বল। এই নক্ষত্রটি কয়েকদিনের মধ্যে তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে হঠাৎ যেন আড়ালে যায় ; পিছনে যা পড়ে থাকে সেটি আকাশের একটি কোণে একটি ধোঁয়াটে কুণ্ডলী, যার নাম দেয়া হলো ক্র্যাব নেবুলা (Crab Nabula) ; যেখানে সব বস্তু যেন গ্যাসে গড়া ; যে গ্যাস তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অতিবেগে মহাকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে ; আর কেন্দ্র বিন্দুটি, মনে হয়, যেন একটি নিউট্রন তারা। একটি নক্ষত্র তার সব উপকরণ জ্বালিয়ে পোড়ো চেহারাটি নিয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে বিস্ফোরক অবস্থার দ্বারে এসে হাজির হয়ে ফেটে পড়ে ;—সেই সময়ে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায় তা তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার চেয়ে অনেক বেশী। এটিই তো সুপার নোভা অবস্থা, যার শেষে আছে নেবুলা, থাকে নিউট্রনতারা ; যা অন্য একটি প্রজন্মের কাহিনী।

ফ্রীডমানের তৃতীয় মডেলের শেষ যাত্রাবিন্দুর কাছে যদি এমনতর ঘটে ! যদি বিস্ফোরণ হয় ! যে বিগ ব্যাঙ বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টির শুরু, আবার যদি তার পুনরাবৃত্তি ঘটে ! তবে জমাট বাঁধা সব কিছু আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে

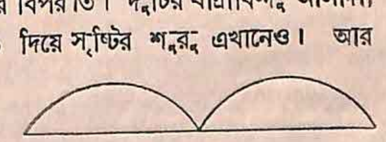
সৃষ্টি করবে তারকা, গেলাক্সি; সৃষ্টি হবে বর্ধমান দেশকাল। পুরনো মহাজগতের ছবিটি নতুন পটে হয়তো আবার আঁকা হবে! যা ছিল শেষ, সেই আবার হবে আরম্ভের সূচনা!

এই কল্পনাতে হয়তো তাপগতি বিজ্ঞানের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে, কারণ এই বিন্দুতে যে চেনাজানা ফিজিক্সের ক্রিয়াকলাপ নেই। জন্ম বিন্দু আর শেষ বিন্দুর মাঝামাঝি জায়গায়, কিছু দূরত্ব বাদ দিয়ে, ফিজিক্সের কাজকারবার। বিন্দু দুটির কাছাকাছি জায়গায় সব নিয়ম, সব ধ্রুবক দিশেহারা। সেখানে, সেই বিন্দু দুটির কাছে থাকতে পারে অন্য একদল ধ্রুবক, অন্য কোনো নিয়ম; যারা আরো দূরে আর থাকেনা, হারিয়ে যায়; তার স্মৃতি চিহ্নও থাকেনা। যেমন পাখির ডিম, ব্যাঙাচির ল্যাজ, প্রজাপতির শূককীট গুটি পোকা। সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় পূর্ণতার চিহ্ন থাকে না, থাকে তার স্বপ্ন। যাত্রাশুরু ও শেষের বিন্দুদুটিতে যদি সেই আলপনার নকশা আঁকা থাকে?

সেই নকশা বা মোতিফ কোনো লেবরেটরিতে ধরা পড়েনা। তবু গোল্ড এবং জন হুইলার (John Wheeler) ও রিচার্ড ফেনমান (Richard Feynman) এক অখণ্ড মহাজগতের প্রবাহের কথা ভাবেন; যে জগতের মৃত্যু মানে সৃষ্টির আরম্ভ। আর যে আরম্ভ একদিন শেষ হবে মৃত্যুতে, আবার নতুন জন্মের সূচনা নিয়ে।

শীতের গাছ যেমন পাতা ঝরিয়ে অপেক্ষা করে বসন্তের, নতুন পাতায় নতুন আবরণের আভরণে সেজে ওঠার জন্য, মহাজগৎ মৃত্যুবিন্দুতে অপেক্ষা করে সৃষ্টির সুখোল্লাসের আকাঙ্ক্ষাটি মনে নিয়ে।

আরো একটি বর্ণনা গণিতের ভাষায় পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বিশ্বজগতের মহাকাব্যের একটি মডেল, যেটি স্টেডিস্টেটের পরিবর্তিত রূপ। দুটি বর্ধমান-সঙ্কোচনের জগৎ, দুটি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। দুটির যাত্রাবিন্দু আলাদা, কিন্তু শেষ বিন্দুটি এক। বিগ ব্যাঙ দিয়ে সৃষ্টির শুরু এখানেও। আর তারপর বর্ধমান বিশ্বলোকটি একদিন সঙ্কোচনের ধারায় ভেসে গিয়ে একটি সাধারণ বিন্দুতে শেষ হয়ে আবার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি করে নতুন মহাজগৎ। এই জগতে পুরনো জগতের স্মৃতি শ্রুতি সব লুপ্ত হয়। বৃদ্ধি শুরু হয় বিপরীত দিকে—যেদিকে দেশকাল সবই উলটোমুখী। সেই জগতেরও একদিন শেষ হবে। আবার দেখা দিবে পুরনো জগৎ আদিজগতের নকশায়! সৃষ্টি-লয়ের দোলায় মহাজগৎ দোলে।



এই জন্ম মৃত্যুর দোলনাটি কি সত্য? কি করে জানা যাবে সেই সংবাদ?

এলান সান্ডেজ আর তাঁর সহযোগীরা মাউন্ট পালামোরের হেল টেলিস্কোপ নিয়ে দ্রুত বর্ধমানতার ত্বরণগতি বা একসিলারেশন ফেক্টর q০, হাবলের ধ্রুবক,

আর আইনস্টাইনের ল্যামডাটিকে মাপার চেষ্টা করছেন। যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে স্টেডিস্টেট থিয়োরিটিকে মেনে নেয়া যায় না! আর বিশ্বজগতের মাসকে সঠিকভাবে নিঃসংশয়ে স্থির করা যাচ্ছে না; তাঁদের পাওয়া তথ্যে যেন আভাস পাওয়া যায় মহাবিশ্বের বেশীর ভাগ ভর যেন নানা ব্ল্যাক হোলে জমে আছে। আর এই ব্ল্যাক হোলদের সঠিক ঠিকানা যে জানা যায় না। এবং তাঁদের পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য জানায় ল্যামডার মান শূন্য। কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট-টিকে নাকচ করা যায়। অন্যদিকে তথ্যভিত্তিক রীতিতে আন্দোলিত মহাবিশ্বের মডেলটি যেন কিছুটা প্রশ্রয় কিছু বেশী সহানুভূতি অথবা অনুকম্পা পাচ্ছে।

সবকিছু চিন্তা ভাবনা গড়ে উঠেছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদের গাণিতিক বর্ণনাটি কেন্দ্র করে। এই তত্ত্বটিকে নিয়ে মানুষ অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে চায়, চায় ভবিষ্যৎকে জানতে। অথচ এখনো অনেক বাধা। এ যেন সেই অবস্থা, যা অসহনীয়, যাকে সহ্য করা যায়না; মেনে নেয়া যায়না। অথচ অবস্থাটি যে কিঞ্চিৎ মজার সেখানেও তো সন্দেহ নেই!

ক্ষুদ্রযবনিকার আড়ালে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চারটি শক্তিক্ষেত্রের কথা জানা গেল। এর তিনটি কাজ করে মাইক্রোওয়ার্ল্ডে, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রের জগতে ; আর দুটি মাত্র কাজ করে দূরের জগতে। অন্যদিকে বিশাল মহাবিশ্বে দূরের তারকা-নীহারিকা ইত্যাদির মধ্যে যে শক্তিটি কাজ করে সেটি গ্রেভিটেশন, মহাকর্ষ। এই চারটি শক্তির মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতম—সেটি! প্রবলতম শক্তি গুরু অন্তক্রিয়া বা নিউক্লিয়ার ফোর্সের কাজ কারবার চলে অতি নগণ্য দৈর্ঘের মধ্যে ; অথচ ক্ষুদ্রতম শক্তি মহাকর্ষ কাজ করে অতি দূরত্বে ; ক্ষুদ্রতম জগতে তার কাজের ক্ষমতা অতি তুচ্ছ।

নিজের জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিকালে আইনস্টাইন একটি মাত্র শক্তিক্ষেত্রের আভাস জানালেন,—সব শক্তি ঐ একটি ক্ষেত্রে নিহিত ; সব শক্তির রীতি নীতি ঐ একটি শক্তি ক্ষেত্রের গাণিতিক কাঠামো থেকে জানা যাবে। একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব আইনস্টাইনের মানসপুত্র ; জীবনের শেষ পাঁচিশবছর এই একটি তত্ত্বের গঠন চেষ্টায় নিজেকে নিবিষ্ট রাখলেন। তবু তাঁর জীবদ্দশায় যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, যে তত্ত্ব ঘোষিত হয়েছিল তাদের সব কটিকে তাঁর ঝুলিতে তিনি ভরে নেননি ; বাছবিচার করেছিলেন। ফলে খারাপ-বাজে তথ্য-তত্ত্বের জঞ্জালের সঙ্গে অনেক সৎ-পবিত্র তথ্য-তত্ত্বও তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টার গভীরতা যত, তত আকুলতা, নির্ভরতা দেখা যায় না তথ্য সংগ্রহে। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গঠন তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন না!

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আইনস্টাইনের জীবিতকালে এমন কি, আজকেও, যে তথ্য সংগৃহীত তারা তাঁর নিজস্ব চিন্তাভিত্তিক একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বটির কাঠামোটির উপকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। চারটি শক্তি—প্রতিটির সীমারেখা—পরিমিতি সুস্পষ্ট নয়। যেমন গুরু অন্তক্রিয়া বা নিউক্লিয়ার ফোর্স এই শক্তির সীমারেখা 10^{-13}cm এর মধ্যে! এর পর এটি কেন নির্জীব, কেন ক্রিয়াহীন? যে প্রচণ্ড নিউক্লিয়ার শক্তি বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তিকে জব্দ করে কেন্দ্রে প্রোটন-নিউট্রন দলকে বেঁধে রেখেছে তার কাজ অতি ছোট চৌহদ্দিতে, অতি ক্ষুদ্র সময়ে। যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেশকাল, বিশালবস্তু, তারকা-নিহারিকা সব কিছু আলোর গতিসূত্রে বাঁধা, সেখানে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিউক্লিয়ার জগতে আলোর গতি বোঝার আগেই সময় শেষ হয়ে যায়। 10^{-13}cm দূরত্ব পার হতে প্রতি সেকেন্ডে 3×10^{8} মিটার গতিতে আলোর সময় লাগে মাত্র 10^{-23}সেকেন্ডের চেয়ে কম সময়। গালিলিও-নিউটনের জগৎকে অনেক বিশুদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব, তাঁর মহাকর্ষবাদ ; কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জগতে সেই তত্ত্ব দিশেহারা।

গেলিভারের অভিযানে জানা গিয়েছিল লিলিপুট ও ব্রবডিংনাগদের রাজত্বে, বামন বা দৈত্যমানুষদের রাজ্যে রাজশক্তি, সামন্তশক্তি, বণিকশক্তি, শ্রমশক্তির কার্যকলাপ রীতিনীতি একরকম, একধরনের, একছকের। কণা আর মহাবিশ্বলোকের শক্তি চর্চায় জানা গেল শক্তির রকমফের যেমন আছে, তেমনি থাকে তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রভেদ-বিভেদ, পরিসীমা-পরিমিতির বাদ-বিসংবাদ। দুটি জগৎকে দুটি জানলা দিয়ে দেখা হচ্ছে ; কোয়ান্টা গণিতের জানলায় দেখা যায় মাইক্রোওয়াল্ড বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎ আর আপেক্ষিকতা বাদ দিয়ে দেখা হয় মেক্রোওয়াল্ড বা মহাবিশ্বলোককে। এই দুটি তত্ত্ব, দুটি গাণিতিক পদার্থবিদ্যার শাখা কি স্বয়ম সম্পূর্ণ ? এমন কোন নিয়ম বা রীতি অথবা বস্তু কি আছে যা ঐ দুটি জগৎকে দেখার জানলা দুটির তফাতটুকু, কিছুটা হলেও, ঘুচিয়ে দিতে পারবে ? এমন কোন অবস্থান বা বস্তু কি আছে যেখানে কোয়ান্টা গণিত ও আপেক্ষিকতাবাদ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক সম্পূরক হয়ে কাজ করতে প্রয়াসী হতে পারে ? বিজ্ঞান সেই অবস্থান বা বস্তুটিকে খোঁজে, আর আরেকবার শুরু হয় ব্ল্যা কহোল নিয়ে চিন্তাভাবনা।

1940-55 সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। যুদ্ধের দুঃসহ পটভূমিকায় শুদ্ধ-চিন্তা ও গণিতভিত্তিক গবেষণার দ্বার নিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া ছিল আরো দুটি কারণ। পদার্থবিদরা সেদিন পারমাণবিক ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎ নিয়ে সেদিন তাঁদের সবিশেষ চিন্তাভাবনা। এবং সেযুগের বিজ্ঞানীদের কাছে সাধারণতত্ত্ব ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা ;—যে তত্ত্বের প্রমাণ একমাত্র বিশ্বলোকে পাওয়া সম্ভব এবং যে বিশ্বলোক সেদিন ছিল মূক। তার কাছ থেকে কোন নতুন সংবাদ, নতুন তথ্য পাওয়া যায় নি। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেদিনের জ্যোতির্বিদের দল,—যেখানে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য সামান্য বলেই ছিল কল্পনা সূত্রে স্বপ্নের ফুলের মালা গাঁথা। 1950 সালে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন যেন দেখা যায়। আর 1963 সালে টেক্সাসে এস্ট্রোফিজিক্সের সিম্পোসিয়ামে হাজির হন বিশ্বের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর দল ;—কারণ কিছু আগে, ঐ বছরেই মহাকাশে খোঁজ পাওয়া যায় দূরলোকে একটি ঘনীভূত বস্তু, যা আলো ও রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে চলেছে ; পালসার নক্ষত্রের আবিষ্কার হলো। এই জাতীয় নক্ষত্রের প্রাগ্ঘোষণা সাধারণতত্ত্বের অনুসিদ্ধান্তে পাওয়া গিয়েছিল—চন্দ্রশেখর লান্ডু-ওপেনহাইমার 1930-1939 সালের মধ্যেই জানিয়েছিলেন। অতএব সাধারণতত্ত্বভিত্তিক ঘোষণার প্রমাণ পাওয়া গেল ; প্রমাণ আছে মহাকাশে। তত্ত্বটি, অতএব, নতুনকরে নতুনভাবে, দেখা শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন জাগে। প্রথম প্রশ্ন ঐ ঘনীভূত নক্ষত্রের সৃষ্টি কি ভাবে হতে পারে।

একটি ছোট ব্যাসার্ধে যদি অনেক মেটার জোট বাঁধে, তবে সেখানে সেই

বস্তুটির ঘনত্ব বেশী হয় বলে ভর প্রচণ্ড বেড়ে যায়, মহাকর্ষের টান বাড়ে, দেশকালের বক্রীপথের বক্রতার হার বৃদ্ধি পায় ;—এসব সুয়াৎসচিল্ডের সমীকরণটি থেকেই জানা যায়। সেই ছোট ব্যাসার্ধে যে মেটার জমা হয়ে থাকে, তাদের আকার প্রকার, আচার ব্যবহার নিয়ে চিন্তা শুরু হয়। আইনস্টাইনের মহাকর্ষবাদের একটি প্রধান নীতি হলো, মহাকর্ষ একটি চাপ সৃষ্টি করে, সেই চাপ বস্তুটির কেন্দ্রের অভিমুখী ; এই চাপের জন্য সব বস্তু ঐ কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়। তবু বস্তুটি তার আকার বজায় রাখে, কারণ আরো একটি শক্তি, যেটি ঐ প্রচণ্ড চাপের জন্য বস্তুটির অভ্যন্তরের উত্তপ্ত আবহাওয়ার জন্য সৃষ্টি হচ্ছে—সেও এক চাপ সৃষ্টি করে ; সে চাপ বাইরে ঠেলে দেবার শক্তি। একটি চাপ ঠেলা দেয় কেন্দ্রের দিকে—আর অন্যটি ঠেলে কেন্দ্রের বাইরে। এদের পারস্পরিক যোগফলে সমতা দেখা দেয়. বস্তুটি তার আকার বজায় রাখে।

সূর্য বা এজাতীয় তারকার অন্দরে, অভ্যন্তরে প্রধানত আছে হাইড্রোজেন গ্যাস। এই সব তারকার ব্যাস কমপক্ষে পনের লক্ষ মিটার। সূর্য কঠিন নয়,তরলও নয় ; সূর্য গ্যাসে ভরা। সূর্যের মহাকর্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, আকর্ষিত হাইড্রোজেন ছোট জায়গায় সংকুচিত হয় বলে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপের ফলে ফিউশন পদ্ধতি ঘটে ;—চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একীকরণের ফলে পাওয়া যায় হাইড্রোজেনের ঠিক পরবর্তী মৌল হিলিয়াম গ্যাস, এবং কিছুটা তাপবিকিরণ শক্তি—যেমন গামারে ; আর হয়তো কিছু আলোর ফোটন কণা এবং নিউট্রেনো। এই যে শক্তির উদ্ভব হচ্ছে এটি মোটামুটি দুটি কাজ করে ; এক : সূর্যের কেন্দ্রের তাপটি সমপরিমাণ রাখার জন্য তাপের জোগান দিয়ে যায়, যে তাপের ফলে অনবরত, অবিরত, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে পারে। এবং দ্বিতীয়তঃ এই শক্তির চাপে সূর্যের বহিসীমাটি অক্ষুন্ন থাকে ; সূর্য কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়ে ছোট হয়ে যায় না। এই রীতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, কেন্দ্রের তাপ শক্তি কমে যায়, হাইড্রোজেনের ফিউশন ক্রিয়া ঘটে না।

এই সময়ে হিলিয়াম গ্যাস জ্বালানি হয়ে দেখা দেয়, পুড়তে শুরু করে। তারকাটি একটি লাল দৈত্যের আকার যেন নেয়। দৈত্য—কারণ এসময়ে তারকাটির বহিসীমার আয়তন প্রায় 250 গুণ বেড়ে যেতে পারে,—যেখানে সূর্য তার নিজস্ব আয়তনের ব্যাসে পৃথিবীর পথ পর্যন্ত গিলে খেতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে, তারকাটি শক্তি ক্ষয় করে, বিকিরণ ত্যাগ করতে করতে সংকোচনের ধারায় আসে। মহাকর্ষ বাড়ে, অথচ মেটারের রূপান্তরের বিকর্ষণ চাপ সেই অনু-পাতে বাড়ে না। সূর্য বা এ জাতীয় তারকা তখন অতি উচ্চ ঘনত্বে, ডেনসিটিতে, জমাট বাঁধে ; ছোট হয়ে দাঁড়ায়। এই নতুন তারকার ব্যাস ছোট, অথচ ডেনসিটি অনেক বেশী। এই তারকার শেষ ঘটে ধীরে ধীরে শীতল মৃত্যুর পথে।

মহাকাশে এধরনের সাদা বামন তারা দেখা যায়। এরা নিজেদের আকারটি

কিন্তু বজায় রাখে ; কারণ কোয়াণ্টা-তত্ত্ব অনুযায়ী এখানে ইলেকট্রনের ডিজেনারেসি (Degeneracy) বা অপজাত চাপ কাজ করে। এই বামন তারার ডেনসিটি বেশী, ভর বেশী ; অতএব মহাকর্ষ বেশী। আবার ছোট জায়গায় অনেকটা ভর জমা থাকে বলে কোনো বস্তুই তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারে না ; প্রচণ্ড চাপে বস্তুরা ভেঙে যায় তার মৌল পরমাণুতে, মৌলকণায়,— যেখানে থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউট্রিনো বা মেসন হাইপারনের দল। এই অবস্থাকে বলে প্রাথমিক প্লাজমা অবস্থা। এই প্রাথমিক প্লাজমা অবস্থায় যখনই কোনো বস্তু ভেঙে যায়, তখনই ইলেকট্রনের অপজাত শক্তি মহাকর্ষের চাপকে বিপরীত মুখে ঠেলে দেয়, বামন তারার ব্যাসার্ধটি বজায় থাকে ; ঐ ব্যাসার্ধের সংকোচন আর ঘটে না। তবে সেই তারকার মূলভর যদি সূর্যের ভরের 1·44 থেকে দুই গুণ বেশী হয়, তবে কি ঘটতে পারে সেটি 1930 সালে ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ও রাশিয়ার বিজ্ঞানী লান্ডু জানান ;—এই কাজটি সাধারণতত্ত্বের অগ্রগতির একটি বিশেষ ধাপ। এই দুই বিজ্ঞানী জানালেন, সেই বেশীভর নিয়ে তারকাটি যখন ছোট হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে বেশী ভরের জন্য তার মহাকর্ষ শক্তি বেশী ; ইলেকট্রনের অপজাত শক্তি সেই মহাকর্ষশক্তিকে জব্দ করতে পারেনা, পারে না তারকাটির সংকোচনের ধারাটি থামাতে। এই প্রচণ্ড সংকোচন কালে কোনো পরমাণু তার নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখতে পারবে না— সে ভেঙে যাবে মৌলকণায়। প্লাজমার এই অবস্থাকে বলা হয় নিউট্রন অবস্থা। [ঐ 1·44 সূর্যের ভরের সীমাকে বলা হয় চন্দ্রশেখর লিমিট। এই অবস্থায় বামনতারার মত শীতল মৃত্যু ঘটে না।]

এই জাতীয় তারকার সংকোচনের ঘটনাটি 1939 সালে ওপেনহাইমার এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা করলেন। অনেক পরে পালসার নক্ষত্রের দেখা পাওয়া যায় যারা রেডিও এবং দৃশ্য বর্ণালী তরঙ্গ অতি দ্রুতলয়ে বিকিরণ করে চলে। পালসার নক্ষত্রই ওপেনহাইমার ঘোষিত নিউট্রন অবস্থার তারকা অথবা নিউট্রন তারা। জ্যোতির্বিদ্যায় এ জাতীয় প্রাগ্‌ঘোষণা একটি অসাধারণ অনন্য উদাহরণ।

নিউট্রন তারা কিন্তু বিনা প্রতিবাদে সৃষ্টি হচ্ছে না। বেসামাল স্থিতাবস্থার কালে তারকাটি সংকোচনের পথে যেতে যেতে সহসা বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে— এই ফেটে পড়াটিকে বলা হয় সুপার নোভা এক্সপ্লোসন বা সুপার নোভা বিস্ফোরণ। সেই সময়ে তারকাটি 10^{11} সংখ্যক নক্ষত্রের আলোয় ভরা গেলাক্সির মত সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর তারপর শেষমেশ যা পাওয়া যায়, সেটি হলো অনেকটা ধোঁয়া-গ্যাস-বিকিরণে ভরা নেবুলা আর বিস্ফোরণের ফলে একটুকরো সূর্যের প্রায় দেড়গুণ ভরের অথচ মাত্র 10 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটি তারা—নিউট্রনতারা। এ জাতীয় নিউট্রনতারার ডেনসিটি প্রচণ্ড। দশকিলোমিটার ব্যাসার্ধের ছোট আকারের তারা অথচ এখানে সঞ্চিত হয়ে আছে

যে ভর তা প্রায় সূর্যের দেড়গুণ-দ্বিগুণ। তবু এটি তার ছোট আকারটি বজায় রাখতে পারে।—বজায় থাকে নিউট্রনের অপজাত শক্তির চাপে। কিন্তু মূল-তারকাটির ভর যদি আরো বেশী হয়; ধরা যাক সূর্যের ভরের চল্লিশ পঞ্চাশ গুণ, তবে মহাকর্ষের টান এই নতুন তারার নিউট্রনের অপজাত শক্তির চেয়ে অনেক অনেক বেশী হতে পারে; তারকাটির সংকোচন থামবেনা। এরপরও যে আকারে তারকাটি স্থির অবস্থায় স্থিতি যেতে পারে, সেখানেও খাটে আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব, তাঁর মহাকর্ষবাদ। জটিল ফিল্ড ইকুয়েশনগুলি সরিয়ে রেখে সুয়াৎ-সচিল্ডের স্ফেরিকেল মডেলের সাহায্যে গড়ে ওঠা সামান্য গণিতের সাহায্যে বলা যায়, সেই মূল তারকাটি, স্ফেরিকেল-গোলাকার বস্তুটি, তার নিজস্ব মহাকর্ষের টানে প্রচণ্ড ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়ে কেন্দ্রের দিকে ছোট থেকে ছোটতর হতে চলে, এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে তারকাটির আকার সুয়াৎসচিল্ডের ব্যাসার্ধের সীমার কাছে পেঁছে যায়;—যেখানে আলো গতিহীন বলে সময় স্তব্ধ; অথবা সময় এত ধীর যে, কোনো ঘটনা সেখানে ঘটে কিনা তা বলার জন্য কেউ থাকে না; থাকার সম্ভাবনা নেই; থাকতে পারে না। কোন কিছু এই ব্ল্যাক হোল থেকে বেরুতে পারে না, কাছেও আসতে পারেনা; কারণ বিশ্বজগতে যার গতি সর্বোচ্চ সেই আলো এইখানে গতিহারা। ব্ল্যাক হোলের চারপাশে মহাদেবের নন্দীর মত কেউ যেন তর্জনীর ইঙ্গিতে সবকিছুকে তিষ্ঠ বলে জানিয়েছে। এইখানে এই তারকার উজ্জ্বলতার মৃত্যু, যে তারকা মেটারেই সৃষ্টি। সব মেটার এইখানে কেন্দ্রের টানে আকর্ষণে সঙ্কুচিত হয়ে যেন জমাট বেঁধে আছে।···ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হোরাইজন বা ঘটমান দিগন্ত অঞ্চলে আলোর তরঙ্গ লালের দিকে যেন অসীমে সরে যায়। এই কেন্দ্র থেকে কোনো ফোটন কণা বেরুতে পারেনা, কোনো ফোটন কণা পড়তেও যেন পারে না। বাইরের দর্শকের কাছে মনে হবে সময় যেন দ্রুত নির্বাণত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে;—ঐ দিগন্ত সীমায় সময় হারিয়ে যায়; সময়ের শেষ এইখানে। আর ঐ সীমারেখা, দিগন্ত বলয় পার হয়ে কোন দর্শক যদি ব্ল্যাক হোলের চৌহদ্দিতে পড়ে তবে সে কি সসীম সময়ের আভাস পেতে আবার পারবে?

এই ছোট আকারের ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষের টান প্রচণ্ড, যে টানে বিশ্বরেখা প্রচণ্ড ভাবে বেঁকে যায়। এর কাছাকাছি জায়গায়, এর ভিতরে বা বাইরে কি হতে পারে, কি ঘটে তা দেখার জানার বা বোঝার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ যে কোন বিকিরণের ধারা এখানে নিশ্চল। অন্যদিকে যে কোনো বস্তু কঠিন, তরল অথবা গ্যাস,—এর কেন্দ্রে তারা ভেঙে যাবে মৌলকণায়। আর যে প্রচণ্ড অপজাত চাপ মৌলকণার দল সৃষ্টি করবে তারাও যেন, এই অবস্থায় মহাকর্ষের আকর্ষণ সৃষ্টিতে অংশ নেয়। সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে সব বস্তু সব বাধা অতিক্রম করে কেন্দ্রে এসে পড়ে; সব কিছু ঘটে যায় এক সেকেন্ডের দশহাজার ভাগ সময়ে!

কি ঘটে যায়, কেন্দ্রে কি ঘটে—এই প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের, বিজ্ঞানের। সেই

প্রশ্নের উত্তর পাবার কোনো উপায় বর্তমানে বিজ্ঞানের জানা নেই। আর সেইখানে যা ঘটে, ঘটে চলেছে বা চলতে পারে তার প্রকাশ এই মহাবিশ্বলোকের ছাপাখানায় নেই। আইনস্টাইনের মহাকর্ষবাদ একটি তত্ত্ব ; যার সাপেক্ষে ব্ল্যাক হোলের থিয়োরি আইডিয়াটি গড়ে ওঠে। ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষের শক্তি চেনাজানা তারকার মহাকর্ষ শক্তি থেকে কোটি কোটি গুণ হয়তো বেশী। মহাকর্ষবাদ হয়তো তারকার আকর্ষণশক্তি জানাতে পারে ; সেই সম্ভাবনা আছে, যদিও তার তথ্যগত প্রমাণ খুব একটা হাতে নেই। তবু এই মহাকর্ষতত্ত্ব সেই প্রচণ্ড মহাকর্ষ জগতে প্রযুক্ত হবে কিনা বলা যায় না, বলতে পারা যায় না।

আপেক্ষিকতাবাদ জানায় ঐ প্রচণ্ড সঙ্কোচন ক্রিয়ার ফলে স্পেসের বক্রতা, টাইডেল বা জোয়ার ভাঁটার শক্তি দ্রুত বেড়ে চলে। যদি সঙ্কোচনের এই দ্রুত গতি কোথাও বাধা না পায়, কেউ থামাতে না পারে তবে সঙ্কোচন চলবেই। এই চলতে থাকা, না থামা মানে, এ যেন একটি পরম লক্ষ্যের দিকে চলে, যেখানে আপেক্ষিকতাবাদের সমাপ্তি। এই সঙ্কোচন চলতে থাকলে মূলতারকাটি রূপান্তরী জগতে ব্ল্যাক হোলের সীমা ছাড়িয়ে একটি জ্যামিতিক বিন্দুতে যেন এসে দাঁড়ায় ; যেখানে, ঐ অবস্থায়, বিশাল ভরের সঙ্কোচনের জন্য ডেনসিটি যেন অসীমে দাঁড়ায় ; আর স্পেসের বক্রতা যেন দাঁড়ায় অসীমে। গণিতে এই অসীম বক্রতা ঘেরা বিন্দুমাত্রিক অবস্থানকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এই অসম্ভব সিঙ্গুলারিটি কোনো বস্তু নয় ; এটা একটি অবস্থা যেখানে চেনাজানা ফিজিক্সের সমাপ্তি ঘটে।

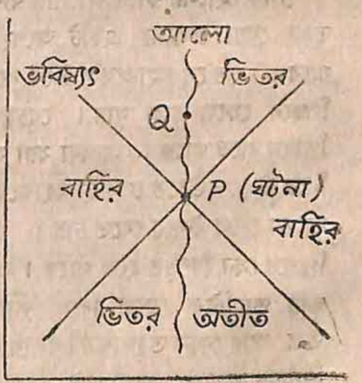
নিজস্ব মহাকর্ষের টানে নক্ষত্রটি সঙ্কুচিত হয়ে যে বিন্দুমাত্রিক সিঙ্গুলারিটি অবস্থায় হাজির হতে পারে সেই ঘোষণাটি 1939 সালে রবার্ট ওপেনহাইমার করলেন। এই অসহ পরিস্থিতিটিকে সে যুগের অনেক বিজ্ঞানী, এমনকি এডিংটন এবং স্বয়ং আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেন নি। সেই 1939 সালে প্রিন্সটনে আইনস্টাইন একটি গাণিতিক পেপার প্রকাশ করে প্রতিবাদ তুলে জানান যে এজাতীয় কোলাপ্স বা ধ্বংসীভূত বস্তুর উপস্থিতি বাস্তবে থাকতে পারে না। এটি ঘটা মানে মহাকর্ষের ধ্বংস। এখানে ফিজিক্স খাটে না।

মহাকর্ষের ধ্বংসের এটি শেষ কথা। তারকার আকৃতি যদি সুয়াৎসচিল্ডের মডেল অনুযায়ী স্ফেরিকেল-গোলাকার হয়, তবে ওপেনহাইমারের মতে আইনস্টাইনীয় মহাকর্ষবাদ অনুসারে সেই তারকাটির সমাপ্তি ঘটে ঐ সিঙ্গুলারিটি নামক বিন্দুতে। আর আধুনিক কালে, উত্তর আইনস্টাইন যুগে, দেশকালের টপোলজির উপর নির্ভর করে দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, গাণিতিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং ও রোজার পেনরোজ জানালেন যে, কোনো অঘটন না ঘটলে, সঙ্কোচনের কালে শক্তি ও চাপের যুগ্ম ক্রিয়ায় সিঙ্গুলারিটি নামক অবস্থাটিই স্বাভাবিক ; বস্তুর স্ফেরিকেল আকারের উপর এই অবস্থাটি ঘটা নির্ভর করছে না!

হকিং-পেনরোজের উপপত্তিটি কিন্তু ঐ সিঙ্গুলারিটির আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানায় না। অন্যদিকে তাঁদের এই থিয়োরিটি যেন সুব্রাহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর তত্ত্বে গড়া স্ফেরিকেল বস্তুর সঙ্কোচনের ছবির তুলনায় অনেক মোটা দাগে আঁকা—যেন সুক্ষ্মতা-কোমলতা-কমনীয়তা বর্জিত। যেটুকু এই তত্ত্বে জানা যায় তাহলো দেশকালের বন্ধনে গড়া এই জগতে যেকোনো বস্তুর পথের শেষ এইখানে, এই বিন্দুতে। বস্তুর গতিপথের অগ্রগতি দেশকালের এই অসীম বক্রতায় চিরকালের মত বাধা পেয়ে স্থির হয়ে যায়। আরো সহজভাবে বলা যায়, এই অবস্থায় দেশকালের সীমারেখা দেখা দেয়; কোনো গতিপথ বাইরে নেই, ভিতরে নেই; দুর্গম বাধা পথের সীমারেখার গন্ডীটেনে দিয়েছে। কেউ কেউ ভাবেন, কোনো বস্তু যদি এই সিঙ্গুলারিটিতে ধরা পড়ে, তবে সে সেখানে চিরকালের মত বাঁধা পড়ে থাকে। দেশকালের বিচিত্র জগতে তার আর ফিরে আসার কোথাও কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো পথ নেই। সে থাকে সসীম সময়ের সীমায় বাঁধা।

সিঙ্গুলারিটির এই আবির্ভাব এক মহা গোলমালের হাঁকডাক ফিজিক্সে তুলেছে। চেনাজানা ফিজিক্সের কোনো তত্ত্ব এখানে খাটে না। কারণ আলো বা বিকিরণ হলো তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার। এই জগতে আলোর প্রবেশ নিষেধ। দুদিকেই নো এনট্রি চিহ্ন ঝোলানো। কাজেই কি ঘটে জানার উপায় নেই কি ঘটতে পারে তার ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।

রোজার পেনরোজ ঠিক এই কারণে তাঁর পরবর্তী একটি পেপারে মহাবিশ্বলোকের নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপের কথা বললেন। তাঁর মতে ঘটমান জগৎ ছাড়া আর কোথাও সিঙ্গুলারিটির সৃষ্টি হবে না। ব্ল্যাক হোল-সিঙ্গুলারিটি তার অজানা কারচুপি নিয়ে ঘটমান জগতের বাইরের লোকে হাজির হতে পারবে না। গণিতের মাধ্যমে জানা যায় ঘটমান জগতে সিঙ্গুলারিটির আবির্ভাব হতে পারে। অন্যত্র তাদের সৃষ্টির বাধা থাকতে পারে—এই ধারণা ঠিক না বেঠিক সে তথ্য জানা নেই। তত্ত্বটিকেও প্রমাণ করা যাচ্ছে না।



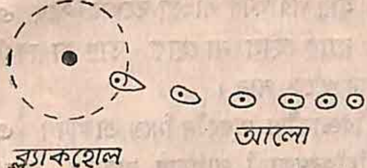
ঘটমান জগৎ কি?…আইনস্টাইনের দেশকালের ব্যাখ্যায় মিনকোওস্কি যে মডেলটি জানিয়েছিলেন, সেখানে যে কোনো দর্শকের সাপেক্ষে একটি ঘটনা স্পেস ও টাইম কো-অর্ডিনেটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালের ম্যাপে স্পেস রেখা ও কাল রেখার ছেদবিন্দুতে জানা যাবে। এই ছেদবিন্দু দিয়ে আলোর পথ চলে যাবে

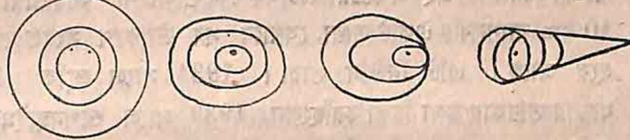
অতীত থেকে ভবিষ্যতে। আলোর পথ ও ছেদবিন্দু—যেটি ঘটনা, এদুটি দর্শক নিরপেক্ষ, যদিও স্পেস রেখা আর কাল রেখার ঢাল বিভিন্ন দর্শকের কাছে ভিন্ন হতে পারে। এই দুটি রেখার পরিসীমার বাইরে যে দেশকালের অংশ আছে এখানে স্থির সময় বলে কিছু নেই; কারণ এই অংশ ঘটমান জগতের বাইরে। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের প্রভাব এদের উপরে খাটে না; আর যে জগতে কোনো ঘটনা বর্তমানে ঘটছে সেখানে এরাও কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না। ঘটমান দেশকালের ম্যাপ দর্শক নিরপেক্ষ নয়; এখানে দর্শকের ভূমিকা থাকে।

ঘটমান জগতের বাইরের কোন ঘটনার সময়ের নির্দিষ্টতা নেই। কারণ আইনস্টাইনের সমীকরণের $-c^2t^2+x^2+y^2+z^2=s^2$ এর c^2t^2 অংশটি ঘটমান জগতের ভিতরের স্পেসের অংশের চেয়ে বড়। s^2 এখানে নেগেটিভ। অন্যদিকে ঘটমান জগতের বাইরে স্পেসের অংশ c^2t^2 অংশের চেয়ে বড়; s^2 এখানে পজিটিভ। আর আলোর রেখার উপর s^2 এর মান শূন্য। ঘটমান জগতের বাইরের জগতের কোন ইভেন্ট বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণা দর্শকের থাকতে পারে না, কারণ সেখানে আলোর রেখাপথ ভিন্ন। ঐ জগতে কি ঘটছে তা জানতে পারা যায়না বলেই রোজার পেনরোজ কসমিক সেন্সরশিপের কথা জানালেন। ঐ সেন্সরশিপ আছে কিনা তা হলফ করে বলা যায় না। তবু একটি ইঙ্গিত যেন ধরা পড়ে; ঐ ক্ষুদ্র সিঙ্গুলারিটির নিকটবর্তী অঞ্চলে, যেখানে দূরত্ব 10^{-32} cm, সেখানে কোয়ান্টামের গণিত মহাকর্ষ গণিতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোয়ান্টাম-মহাকর্ষের কি লীলা সেখানে যে খাটে, তা কিন্তু আজো জানা নেই। এবং জানা নেই সিঙ্গুলারিটির ছবিটি স্পষ্ট করে বিজ্ঞানীরা কবে জানবেন!

ব্ল্যাক হোলের কাছে আলোর ব্যবহার ভারি আশ্চর্যের। ধরা যাক স্ফেরিকেল তরঙ্গ ঘেরা স্পেসের একটি অংশ। স্পেসটিকে ঘিরে তরঙ্গাকারে আলো দিব্বি যাবে। যত সে মহাকর্ষের টানে পড়ে ততই তার বৃত্তাকৃতি তরঙ্গ যেন স্পেসকে পিছনে ফেলে চলে যায়। বেচারা স্পেস যেন আলোর ছায়া হয়ে অন্ধকারে পিছনে পড়ে থাকে।...অথবা ধরা যাক, আলো যেন স্পেস নামক ভারটি সামনে নিয়ে উঁচুতে উঠতে চলেছে, মহাকর্ষের বাধা সে পার হতে চায়। তাই সে ভারটি সামনে ঠেলে উপরে যেতে চায়! তার শরীরের ভঙ্গী এই ঠেলাঠেলির জন্য ক্রমশ পিছনে যেন বিস্তৃত হতে থাকে। আর তারপর দুস্তর বাধা পার না হতে পেরে তার ভারটিকে ফেলে দিয়ে, ক্লান্তিতে সটান টানটান হয়ে আলো শুয়ে পড়ে; তার আর কোন তরঙ্গাভঙ্গী বজায় থাকে না। তরঙ্গাভঙ্গী নেই, কাজেই কোনো উচ্চাবচ রূপ, মডুলেশন নেই; অতএব আলো আর ডাকহরকরার কাজ করতে পারছে না। কোন খবর, কোন সংবাদ আলো মারফত আর জানা যায় না। এমন মৃতের মত আলো শুয়ে থাকে যে, সে যে আছে তাও যেন ভাবা যায় না, বোঝা যায় না; সেখানেও থাকে সন্দেহ।

ব্ল্যাক হোলের ভিতর থেকে যত জোরে রকেট চালিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা হোক না কেন—কালীপুজোর রাতে হাউই এর মত তাকে আবার ব্ল্যাক হোলেই ফিরে আসতে হবে ; এত প্রচণ্ড আকর্ষণ এখানে। আর কোনো





আলোর টান টান হয়ে শুয়ে পড়া

রকেট যদি বাইরে থেকে ব্ল্যাক হোলের দিকে যাত্রা করে, তবে তার আর শক্তির অপচয় করতে হচ্ছে না। ব্ল্যাক হোল তার লম্বা হাতের আঁকশি দিয়ে রকেটটিকে টেনে নিয়ে সটান উদরস্থ করবে। মুহূর্তের জন্য রকেট চালকের মনে হবে শাশ্বত অনন্তকালকে সে যেন বাইরে রেখে এসেছে !

রোজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং জানালেন তারকাদের আকৃতি স্ফেরিকেল অথবা ননস্ফেরিকেল যাই হোক না কেন পোড়ো তারার ভগ্নাবশেষে পাওয়া যাবে সিঙ্গুলারিটি। আর এই সিঙ্গুলারিটি ঘটে একমাত্র মহাকাশের নির্দিষ্ট জায়গায়, যেখান থেকে কোনো আলো, কোন মেটার বেরিয়ে আসে না। এই অঞ্চলে প্রকৃতি যেন সংবাদ সংগ্রহের সেন্সরশিপ জারি করেছেন। কোন খবরদারী; খবর সংগ্রহ এখানে চলে না ; লৌহ যবনিকার মত এখানে থাকে কৃষ্ণ যবনিকা ; যার আড়ালে কি ঘটছে, কি ঘটতে পারে—জানার কোন সুযোগ বর্তমানে মানুষের নেই। বিজ্ঞানী জন হুইলার এই কৃষ্ণ যবনিকা ঘেরা অঞ্চলটির নামকরণ করেছিলেন—ব্ল্যাক হোল। 1967 সালে বিজ্ঞানী ইসরাইলের প্রকাশিত একটি উপপাত্তির ভিত্তিতে হুইলার ঘোষণা করলেন—a black hole has no hair ঃ ব্ল্যাক হোলের কোন কেশ নেই।…এই ঘোষণার অর্থ হলো ব্ল্যাক হোলের অঙ্গ আছে, প্রত্যঙ্গ নেই। এই হোল সঙ্কোচনের পথে অতি দ্রুত একটি স্থির স্থিতাবস্থার দিকে যাবে যার সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ মাত্র তিনটি পরিসীমায় ঘেরা —মাস, এঙ্গুলার মোমেন্টাম ও ইলেকট্রিক চার্জ অথবা ভর, কৌণিক ভরবেগ এবং বিদ্যুৎ-চার্জ। তাছাড়া যে বস্তু বা তারকা থেকে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি তার অন্য কোনো অনুপুঙ্খ ডিটেলসের ইশারা বা নিদর্শন ব্ল্যাক হোলের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এ যেন ত্বক-মেরুমজ্জা-মেদমাংসহীন একটি কঙ্কাল, যার সংবাদ

জানাবে শুধু হাড়। ব্ল্যাক হোলের এই স্থিতাবস্থার ক্ষেত্রে গণিতের ছকে সমাধান পাওয়া যায় Kerr-Newman (কার-নিউম্যান) সমাধান। এই রীতিটি জানার পর ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অঞ্চলে মহাকর্ষের স্ট্রাকচারটি বোঝার একটি ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায় ; মডেল তৈরি সহজ হয় আর পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের সঙ্গে এই মডেলের তুলনা করাও সম্ভব হলো। ব্ল্যাক হোল না হোক, তার কাছাকাছি অঞ্চলে বিজ্ঞানী যেন পা রাখার একটি স্থান খুঁজে পান।

ব্ল্যাক হোলের অন্বেষণে মহাকাশে বিজ্ঞানীরা দূরবীন নিয়ে তাকান। এই প্রচেষ্টায় 1968 সালে রেডিও রশ্মি বিকিরণকারী পালসার নক্ষত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এই নক্ষত্রেরা এটমিক কেন্দ্রে আঁটসাঁট করে রাখা উপকরণের মত 10 km ব্যাসার্ধের একটি তারা, যেখানে সব উপকরণ সংহত-সংবদ্ধ হয়ে আঁট হয়ে আছে। এটি নিউট্রন তারা। 1934 সালে জ্বীক (Zwicky) এই ধরনের তারকার কথা চিন্তা করছিলেন, 1939 সালে ওপেনহাইমার এই তারকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন, আর হুইলার ও তাঁর সহযোগীরা এই তারকা সৃষ্টির উপপত্তি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তবু নিউট্রন তারা নয় ; এখানে গ্রেভিটেশনের পোটেনশিয়াল শক্তির মান সর্বোচ্চ নয়, একটি ভগ্নাংশমাত্র। সর্বোচ্চ বা পূর্ণমানটি পাওয়া যায় ব্ল্যাক হোলে। আর এর অন্বেষণেই বর্তমানে বিজ্ঞানীদের যাত্রা!

সুয়ার্ৎসচিল্ডের ব্ল্যাক হোল মডেল ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানে আরেক ধরনের ব্ল্যাক হোল মডেলের সম্ভাবনার কথা ভাবা হয় ; এটি ইলেকট্রিক চার্জ ও ঘূর্ণ্যমান বস্তু দিয়ে ঘেরা, এবং গড়া!



এখানেও সঙ্কোচন ঘটে, দিগন্ত সীমা যেন দেখা দেয়, সিঙ্গুলারিটির আবির্ভাব হতে পারে। এখানে কেন্দ্রের বাইরে নিজস্ব দিগন্ত সীমার ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী স্থানে কেন্দ্রের দিকে টান যে শুধু থাকে তা নয়, এই অঞ্চলে সবকিছু ঘূর্ণ্যমান। এই ঘূর্ণ্যমান গতির ফলে আলোর রেখা কেন্দ্রের দিকে শুধু যে আকর্ষিত হচ্ছে তা নয়, দেশকালের এই সীমারেখার পথে আলো যেন ঘুরপাক খায়। আরো কিছু দূরে থাকে স্থির অবস্থা। 1969 সালে রোজার পেনরোজ একটি অপূর্ব ক্লাসিকেল গেডাঙ্কেন পরীক্ষার মাধ্যমে এই জাতীয় ব্ল্যাক হোলে কি ঘটে, কি ঘটতে পারে তার সংবাদের খসরাটি দিলেন।…এই ব্ল্যাক হোলের স্পেসে যেন ঘূর্ণি জাগে, সব কিছু ঐ ঘূর্ণিতে পড়ে হারিয়ে যায়। স্থির অঞ্চল বা Static Limit এবং দিগন্ত অঞ্চল বা ঘটমান অঞ্চল বা Event Horizon এর মাঝখানে যে জায়গা পেনরোজ তার নাম দিয়েছেন এর্গোস্ফিয়ার (Ergosphere)—যার মানে কাজের অঞ্চল।

গ্রীক Ergos শব্দের অর্থ কাজ। এই অঞ্চলে কোনো বস্তুর যদি অনুপ্রবেশ ঘটে তবে সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ; তার বেশীর ভাগই পড়ে ব্ল্যাক হোলে ; তবু সামান্য কিছু টুকরো, একটি ভগ্নাংশ বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে ; – এই টুকরোটি যখন বাইরে আসে তখন সে আসে যতটুকু-শক্তি-নিয়ে-মূলবস্তুটি-ভিতরে-ঢুকেছিল তার সমান অথবা বেশী শক্তি সঙ্গে নিয়ে। এই যে শক্তি, এ যেন সেই টুকরোটির সমস্ত স্থির ভরের রূপান্তরিত শক্তি। এখানেই, একমাত্র শতকরা একশভাগে ভরের রূপান্তরে শক্তি পাওয়া যায়। পাওয়া সম্ভব। এই তত্ত্ব মেনে নিয়ে কোনো কোনো সায়েন্স ফিকশনের লেখক ভাবেন, এ ধরনের ব্ল্যাক হোলের কাছে স্থির অঞ্চলে যদি কোনো সভ্য জগতের বাসিন্দা থাকতে পারে, তবে তাদের শক্তি প্রাপ্তির কোনো সমস্যা কোনদিন থাকবে না ; তাদের জঞ্জাল আবর্জনা তারা এর্গোস্ফিয়ারে ঢেলে দিবে, পরিবর্তে পাবে ঐ সব আজেবাজে জিনিসের সামান্য কিছু অংশের ভরের বিনিময়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরী শক্তি। জঞ্জাল দূরীকরণ আর শক্তি উৎপাদন—দুটো নিয়েই তাদের ভাবনা থাকবে না। কোনরকম পাওয়ার স্টেশন ছাড়াই এ শক্তি তারা বিনি পয়সায় পেয়ে যাবে। বিশ্বজগতে শক্তি পাবার সহজ উপায় এখানেই, এছাড়া আর অন্য কিছু পদ্ধতি আছে বলে জানা নেই!

ব্ল্যাক হোল কালো। থার্মোডাইনামিকসের নিয়মে জানা যায়, সব কালো জিনিস ঠাণ্ডা ; প্রচণ্ডতম ঠাণ্ডা জিনিসই কালো। অথচ ব্ল্যাক হোল প্রচণ্ড উত্তপ্ত। এই বৈপরীত্য থেকে বিজ্ঞানী জেলডোভিচ (V. B. Zeld'ovich) একটি আইডিয়ার ঘোষণা করেন। ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাক হোলে Superradiation অথবা অতি বিকিরণ পাওয়া সম্ভব ; এই সম্ভাবনা পেনরোজের নিজস্ব তত্ত্বেই নিহিত আছে। যেমন এর্গোস্ফিয়ার থেকে খানিকটা বস্তু তার সমস্ত ভরের রূপান্তর শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে, আলোর বা বিকিরণের তরঙ্গের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটতে পারে। এই যে আলোর নিজে থেকে শক্তি বৃদ্ধি, এই অতি বিকিরণ, এ যেন লেসার রশ্মির মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনোরকম উদ্দীপনা, উত্তেজনা ছাড়াই ঘটে যাচ্ছে। এইখানে, এই আইডিয়ার রূপায়ণে জেলডোভিচ কোয়ান্টাম গণিতের প্রয়োগের সুযোগ মহাবিশ্বলোকে দেখলেন—আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে এখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বও প্রযুক্ত হতে পারে। কেনেডিয়ান গণিতবিদ উইলিয়াম উমরাহ (W. Umrah) একদিন ব্ল্যাক হোল তত্ত্বে কোয়াণ্টা গণিত প্রয়োগ করে দেখালেন ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাক হোল যেন স্তিমিত ভাবে প্রদীপ্ত। এখানে স্তিমিত কথাটি ব্যবহার করা হলো এই কারণে যে সূর্যের ভরের সমান ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অঞ্চলে যে দীপ্ত দেখা দিবে, সে এতই কম যে জাগতিক কোন যন্ত্রে তার প্রকাশ ধরা এখন পর্যন্ত অসম্ভব – এবং এই অসম্ভাব্য ঘটনাটি হয়তো বা চিরকাল মানুষের প্রমাণের নাগালের বাইরে থাকবে। তবু গণিতের ভাষায় এর উপস্থিতির ঘোষণা পাওয়া যায়,—যে দীপ্তির সম্ভাবনাটি উমরাহ

জানালেন, তার নিঃশব্দ আগমনটি জানা গেল গণিতের ফলাফলে, সমাধানে। দেশকালের বক্রীতলে কোয়ান্টার রীতিনীতির যে প্রয়োগ উমরাহ্ করলেন, সেটি এখনো চিন্তা ও প্রযুক্তির ভ্রূণস্তরে আছে। তাঁর মতে এই দীপ্তির কারণ হলো ঘূর্ণ্যমান শক্তি তড়িৎচুম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এইখানে, ঘূর্ণ্যমান বস্তুর চারদিকে স্পেসে একটা ভরটেক্স বা ঘূর্ণি জাগতে পারে। ঘূর্ণবাত্যার ফলে যেমন বাতাসে প্রবল তরঙ্গ জেগে ওঠে, স্পেসের এই ঘূর্ণির ফলে চারদিকের বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রটি ঘূর্ণির দিকে যেন আকর্ষিত হয়, তরঙ্গক্ষেত্রে আলোড়ন জাগে, তৈরি হয় একটি শক্তি তরঙ্গ—যেটি বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ। এছাড়া, এই অঞ্চলে বাইরে যেন ছিটকে আসে নিউট্রিনো কণা আর অন্য একটি তরঙ্গ—যার নাম মহাকর্ষ তরঙ্গ বা গ্রেভিটেশন ওয়েভ।

1918 সালে তার ক্ষেত্র গণিতের সমাধানের একটি আসন্ন (approximated) রূপে আইনস্টাইন একটি উত্তর পেলেন, যেটি জানায় আলোর গতিতে ছুটে চলা মহাকর্ষের একটি তরঙ্গভঙ্গী। এই তরঙ্গ নিয়ে বহুদিন ধরে চিন্তাভাবনা হয়েছে।—এটির উপস্থিতি কি সম্ভব? উৎসের মুখ থেকে, সেই সিস্টেমের কাছ থেকে শক্তি ধার নিয়ে এই তরঙ্গ কি ছুটে চলে? অর্থাৎ এই তরঙ্গটি উৎস থেকে শক্তি নিয়ে কি বেরিয়ে আসে? 1962 সাল নাগাদ বন্ডি, সাক্স, নিউম্যান ও পেনরোজ (Bondi, Sachs, Newman, Penrose) একটি আইডিয়ার দ্বারে ভাষাগণিতের সহায়তায় হাজির হলেন। অসীমের সাপেক্ষে একটি সিস্টেমের যে মাস পাওয়া যাবে, ঐ সিস্টেম যদি কোনোভাবে মহাকর্ষতরঙ্গ বিকিরণ করে, তবে সেই মাস কমে যায়। মাস কমে যাবে, শক্তি নিয়ে মহাকর্ষতরঙ্গ বেরিয়ে আসবে—আইনস্টাইনীয় শক্তিভরের রূপান্তরী সম্ভাবনার প্রাসাদে আরো একটি মহলের যোগ হয়। তবু এই তরঙ্গ এত দুর্বল যে এটিকে ধরা প্রায় অসম্ভব। তেমনি অসম্ভব ধরা পরীক্ষায় নিরীক্ষায় ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অঞ্চলের দীপ্তির আবির্ভাবটিকে! এই যে দীপ্তি, অথবা বিকিরণ এটি কোনো বস্তু থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি কোনো বস্তু থাকতে পারে না—থাকে একটি গতি; সে গতি হোলো যে কোনো বস্তুর—অতি দ্রুত ছুটে গিয়ে ব্ল্যাক হোলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। গণিতের সমাধানে উমরাহ্ যে দীপ্তিটির সূচনা দেখলেন, তার আবির্ভাব ঘটে ব্ল্যাক হোলের চারপাশের বক্রী শূন্য স্পেস থেকে। ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাক হোলের চারদিকের স্পেসে যে ঘূর্ণি জাগে সেই অঞ্চল অদৃশ্য নয়, এখানে দেখা দিতে পারে স্তিমিত কোয়ান্টায়িত আলো! আইনস্টাইনের ঘোষিত বক্রী দেশকালের ঘূর্ণিতে জাগে বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ! এটি একটি নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচন করে যেন দিচ্ছে। এটিকে যদি মহাকাশের মহালোকে প্রমাণ করা যায়!

সুয়ার্ৎসচিল্ডের ব্ল্যাক হোলে এই আলোর সম্ভাবনা নেই, কারণ এই ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো ভরটেক্স নেই, ঘূর্ণি নেই। অন্যদিকে জাল-

ডোভিচের জানানো বিকিরণের সঙ্গে যেন তাপ বা টেম্পারেচারের কোনো সম্পর্ক নেই—কারণ এর বর্ণালীর সঙ্গে পরিচয় বা মিল নেই তাপঘটিত সাম্য অবস্থাতে থাকা কোনো বস্তুর বর্ণালীর! উমরাহ্-জালডোভিচের বিকিরণের ধারায় তাপগতি বিজ্ঞানের রীতিনীতির কোনো প্রকাশ নেই। এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন স্টিফেন হকিং; তিনি গণিতের একটি নতুন প্রকাশভঙ্গীর কথা চিন্তা করেন। অসম্ভব-অবিশ্বাস্য সুন্দর সেই গণিতের জটিলতা! ব্ল্যাক হোলের ভিতরে ও বাইরে কি ঘটছে বা ঘটতে পারে, যা সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বন্দী, তাদের তিনি তাঁর গণিতের ছকে নিলেন না। তিনি ধরলেন সেই সঙ্কোচনের অঞ্চল, যেখানে মহাকর্ষতত্ত্ব লোপ পেতে চলেছে—যেখানে সঙ্কোচনের ফলে ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য কোয়ান্টা গণিতের আবির্ভাবের সূচনা হতে পারে। তিনি কোয়ান্টা গণিতের প্রয়োগ করলেন। তারকা,—দ্রুত সঙ্কোচনের পথে, ব্ল্যাক হোলে যায় -এই তত্ত্ব আপেক্ষিকতাবাদ থেকে প্রাপ্তি। এই সঙ্কোচনের কালে বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা জাগে, ভেঙে পড়া, কোলাপ্সের পথে ছুটে চলা তারকা থেকে আলোর ঢেউ পাওয়া যায়। এই আলোর তরঙ্গ, এই বিকিরণ শক্তি তারকার মেটার থেকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বক্রী দেশকালের 'ইচ্ছা' থেকে। হকিং-এর তত্ত্বের বিশেষত্ব হলো, সঙ্কোচনের পথে তারকাটি যখন ব্ল্যাক হোলের দিকে ছুটে চলে, স্থিতু হয়, তখন এই বিকিরণের নির্গলনও যেন শক্তির প্রবাহে স্থায়িত্ব পায়। অথচ শক্তির এই স্থায়িত্ব সঙ্কোচনের ফলে মহাকর্ষের ভেঙে যাওয়ার রীতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে না। এটি যেন একটি স্বাধীন অবস্থা, যা বিকিরণের শক্তিপ্রবাহে সুস্থিরতা এনে দেয়।

হকিং তাঁর নিজস্ব গণিতের সমাধানে এক অতি সরল অথচ বিস্ময়ের ফলাফল পেলেন। সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্ল্যাক হোলের যে অবস্থায় মহাকর্ষতত্ত্ব লোপ পেতে চলেছে, তার সন্নিহিতস্থানে, কাছাকাছি অঞ্চলে একটা দীপ্তি জাগে; তার বর্ণালী যে কোনো বস্তুর তাপঘটিত সমতার কালে নির্গত বর্ণালীর সঙ্গে মিল টানে। দুটি বর্ণালীশ্রেণীতে অনুরূপতা দেখা দেয়; কাজেই, হকিং-এর বর্ণালীর টেম্পারেচারও একমাত্র বস্তুটির মাসের উপর নির্ভর করবে; থার্মোডাইনামিক্স-এর গোলমাল হকিং-এর উপপত্তিতে হাজির নয়। আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়ান্টাম গণিতের এই নতুন মেলবন্ধনে তাপগতিবিজ্ঞানের নিজস্ব নিয়মটিকে যেন বজায় রাখছে।

হকিং-এর উপপত্তিতে একটি নিয়মের সূত্র জানা গেল; ব্ল্যাক হোলের জগতের আশেপাশে, কখনো কখনো, কোনো কোনো অবস্থায়, তাপগতিবিজ্ঞানের নিয়ম খাটে। ঘটমান পটভূমির দিগন্ত অঞ্চল—সে যেন ব্ল্যাক হোলের এনট্রোপি, যার হ্রাস ঘটতে পারে এবং এই হ্রাস দেখা দিবে যদি তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে ব্ল্যাক হোলের চারপাশের এনট্রোপির বৃদ্ধি হয়। অতএব, হকিং-এর উপপত্তি অনুযায়ী ব্ল্যাক হোল ছোট হতে পারে; প্রাথমিক অবস্থায় ছোট হলেও

এর আরো ছোট হতে কোনো বাধা নেই। কেননা সুয়াৎর্সচিল্ডের ব্ল্যাক হোল যত শক্তি বিকিরণ করবে, ততই উত্তপ্ত হবে। হকিং-র তত্ত্বে বস্তুর ভরের বিপরীত অনুপাতে টেম্পারেচার বাড়ে ; যত মাস কমে তত টেম্পারেচার বাড়ে। যত শক্তি বেরিয়ে আসে মাস কমে, তাপ বাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় শক্তির বিকিরণ।...সমস্ত পদ্ধতিটা যেন একটা বিস্ফোরক অবস্থার মত। এর মানে একদিন, ব্ল্যাক হোল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বিকিরণ করে ভরের অবলুপ্তি এনে হারিয়ে যায়। যে তারকাটি থেকে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বে তার আর কোনো স্মৃতি থাকে না।

অন্যদিকে সূর্যের ভরের সমান ব্ল্যাক হোলের টেম্পারেচার মাত্র 10^{-7} ডিগ্রী কেলভিন। এরা উবে যাবার চেয়ে বরং বেড়ে যাবার পথে যাবে ; কারণ আশেপাশের গরম অঞ্চল থেকে বিকিরণের ধারা এই আপাত শীতল অঞ্চলে ছুটে আসে। এই ছুটে আসা বিকিরণের হার হকিং-এর নিয়ম অনুযায়ী শক্তিক্ষয়ের হারের চেয়ে অনেক বেশী। অন্যদিকে ব্ল্যাক হোলের আকার যদি খুব ছোট হয়, ধরা যাক এটি আণুবীক্ষণিক,—তবে এদের অদৃশ্য হওয়া উবে যাওয়াকে রোখা যায় না। এই ধরনের ছোটখাট ব্ল্যাক হোল হয়তো মহাবিশ্বে উবে যাবার জন্য দিন গুণছে।

হকিং এবং অন্যান্য আধুনিক গণিতবিদ্‌দের হাতে গড়া ব্ল্যাক হোল উপপত্তিতে তাপগতিবিজ্ঞানের যে উপস্থিতি দেখা গেছে—সেটি যেন মহাকর্ষবাদ আর কোয়ান্টাম থিয়োরির একটি যোগসেতু ;—অথবা এখানেই যেন দেখার দুটি জানলার তফাত খানিকটা কমে আসে। এই সেতু অতি সঙ্কীর্ণ ; তবু কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে যে ফলাফল পাওয়া যায়, তা বেশ আশাপ্রদ, উৎসাহব্যঞ্জক। হয়তো একদিন সেই সেতুটি নানা কারিগরের হাতে পড়ে নকশায় স্থাপত্যে বিস্তৃত হতে পারবে !

ব্ল্যাক হোলের বিকিরণের তত্ত্বের নকশায় দুটি বর্ণ ব্যবহার করা হলো। স্পেসটাইমের জ্যামিতিক বা মেট্রিক রীতিটি গড়ে ওঠে আইনস্টাইনের সূত্রে, আর মেটারফিল্ডকে ঐ স্পেসটাইমের পশ্চাৎপটে কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানের সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়। মাক্স প্লাঙ্ক একটি ভর বা মাসের কথা জানিয়েছিলেন ; এটি জানানো হয় নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুবক G-এর সাপেক্ষে ; যেখানে $\hbar = c = 1$। এই মাসের মান হলো $G^{\frac{1}{2}} = 1.2 \times 10^{19}$ GeV.। গণিতের ছকে ব্ল্যাক হোলের যে সংবাদ পাওয়া যায় সেটি যদি প্লাঙ্ক মাসের চেয়ে বড় মাসের ব্ল্যাক হোল হয় (ধরা যাক 10^{-5}G) তবে এখানে এই নতুন গণিতের বর্ণনাটি বেশ খাটে। অন্যদিকে এই আকার যদি ছোট হয়, তবে এই গণিত প্রয়োগে ইতস্ততা দেখা দেয়, প্রযুক্তিটি সঠিক হয় না। এখন পর্যন্ত কোনো সঠিক তাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তিতে ব্ল্যাক হোলের নিঃশেষ সময়টির ব্যাখ্যা দেয়া যাচ্ছে না। তবে এখানে তিনটি সম্ভাবনা আছে।

(১) ব্ল্যাক হোল সম্পূর্ণভাবে উবে যেতে পারে, পরে থাকবে শুধু শেষ নিঃশ্বাস ফেলার কালে তাপঘটিত বিকিরণ ধারা।

(২) ব্ল্যাক হোলের ধ্বংসের শেষে পাওয়া যাবে এক বিকিরণহীন কঙ্কাল যার ভর প্লাঙ্কের ভরের সমান।

(৩) শক্তির বিকিরণ বয়ে চলবে অনন্তকাল এবং সৃষ্টি হবে একটি নেগেটিভ মাসের নগ্ন সিঙ্গুলারিটি।

শেষ সম্ভাবনাটি অবশ্যই অসম্ভব। কারণ এখানে পাওয়া যাবে যে সমাধান সেটি এমন এক দ্রুত অপসৃয়মান পলায়নী রীতি ঘোষণা করছে যা গণিতের ধারণায় অবাস্তব, অসম্ভব ; কল্পনাতেই যার উপস্থিতি। ঊনশেষ সম্ভাবনাটি নিয়েও সংশয় থাকে। এর অর্থ হলো মহাকাশে অনেক মৃত ব্ল্যাক হোলের কঙ্কাল আছে, যাদের সম্মিলিত ভরে তিল কুড়িয়ে তাল পাওয়া যাবে। মহাবিশ্বের যে ভর বা মাসের ঘনত্ব পরীক্ষায় নিরীক্ষায় জানা গেছে, এদের কুড়িয়ে নিলে সেই ঘনত্ব অনেক বেড়ে যেতে পারে ; মহাবিশ্বের ঘনত্বের কোনো সীমা টানা যাবেনা। প্রথম সম্ভাবনাটি সেদিক দিয়ে অনেক স্বাভাবিক। আবার এটি যদি সঠিক হয়, তবে যুক্তি বিচারে যা পাওয়া যাবে তা হলো মহাবিশ্বে বেরিয়ন সংখ্যার নিত্যতার লোপ। ধরা যাক, একটি ব্ল্যাক হোল, যা বেরিয়ন কণা দিয়ে তৈরি, সেটি ভেঙে পড়ছে—ব্ল্যাক হোলে। প্রাথমিক অবস্থায় এর টেম্পারেচার হবে খুবই কম। কাজেই এখান থেকে বেরিয়ে আসবে জিরো মাসের কণার দল ; যেমন, নিউট্রিনো, গ্রেভিটন অথবা ফোটন। শক্তি বা ভর ক্ষয়ে যেতে যেতে যখন এই ব্ল্যাক হোলের মাস দাঁড়াবে 10^{15}তে তখন টেম্পারেচার এত বাড়ে যে বেরিয়ন ও তার সহযোগী এন্টি বেরিয়ন কণার নির্গমন শুরু হবে। যদি ধরে নেওয়া হয়, কোন এক অজানা কারণে এন্টি কণার চেয়ে বেরিয়ন কণা বেশী বেরিয়ে আসবে (অবশ্য এই তত্ত্বের কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি নেই) তবে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তা মূল নক্ষত্রটির যে নিজস্ব বেরিয়ন কণা ছিল, তা বিকিরণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ ব্ল্যাক হোল যদি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বেরিয়ন সংখ্যার নিত্যতার যে নিয়ম আছে (Conservation of Baryon number) তার ব্যত্যয় দেখা দেয়।

ব্ল্যাক হোলের তাপ বিকিরণ ধারা ধরা-ছোঁয়া হয়তো যায়. যদি ধরে নেয়া হয়, আদিম মহাবিশ্ব সৃষ্টিকালে মহাকাশে $10^{17}g$ মাসের চেয়ে ছোট একাধিক ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি তখন যদি হয়ে থাকে! কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির জন্মক্ষণে কি ঘটেছে তা' কি এতদিন পরে জানার সম্ভাবনা আছে? কসমিক গামারে পটভূমিটি মেপে এই সংবাদ জানার চেষ্টা চলেছে। তবে এখানে আছে পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা! স্পেসে যদি অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী গামারে ডিটেকটর পাঠানো যেত তবে ঐসব ব্ল্যাক হোলের শেষ নিঃশ্বাসকালে ফেলে রাখা বিকিরণের ধারাটিকে ধরতে

পারা যেত। জানা যেত কোন তত্ত্বটি সঠিক অথবা নতুন তত্ত্বের সম্ভাবনা। নইলে কৃষ্ণযবনিকার আড়ালে ব্ল্যাক হোল থেকে যাবে!

ব্ল্যাক হোল কি মানুষের কাছে 'দেখা' দিবে? এর উত্তর, এই মুহূর্তে দেয়া যাচ্ছেনা। মহাকাশে যমক তারা বা Double star দেখা যায়। তাদের এক জোড়ার একটি যে ব্ল্যাক হোল হতে পারে এই সম্ভাবনাটিকে শাকুরা ও সুনিয়ভ (Shakura—Sunyaev) এবং প্রিঙ্গল ও রীস (Pringle—Rees) জানিয়েছিলেন। তাদের মডেলে জানা যায় উজ্জ্বল সাধারণ নক্ষত্র থেকে সাথী তারাটি মেটার ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঘটনার পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিনিয়ে নেয়া মেটার যখন অন্য তারাটির দিকে ছুটে চলে তখন একটি ঘূর্ণি জাগে, তাপ বাড়ে, এক্সরে পাওয়া যায়। এই মডেলটির বিশেষত্ব হলো এখানে সাথী তারকাটির মহাকর্ষের টান অনেক বেশী, তারকাটিকে হতে হবে হয় সাদা বামন তারা, নিউট্রন তারা অথবা ব্ল্যাক হোল।

1971 সালে এক্সরে উপগ্রহ Uhuru (উহুরু)-কে মহাকাশে পাঠানো হলো। এক বছর পর 1972 সালে একটি নতুন তথ্যের আবিষ্কার হলো। সিগনাস (Cygnus) নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারকা থেকে অতি উচ্চশক্তির এক্সরে পাওয়া গেল। এই সিগনাস×I নক্ষত্রলোকে পরিবর্তনশীল এক্সরের উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা গেল এখানে আছে একটি যমক তারা, যার একটি হলো পথের সৌরভরের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আর এর সাথীটি একটি অদৃশ্য নক্ষত্র যার মাস ন্যূনপক্ষে চার সৌরভরের; সম্ভবতঃ এটির ভর ছয় সৌরভরের সমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শাকুরা ইত্যাদির জানানো মডেলের একটি বাস্তব উপস্থিতির খোঁজ যেন পেলেন। ভরের মাপে সিগনাস I যমক নক্ষত্রের অদৃশ্য তারকাটি যেন নিজেকে ব্ল্যাক হোল বলে জানাচ্ছে। বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়েছে, তবু ব্ল্যাক হোলের সম্ভাবনাটি একেবারে নাকচ করা যাচ্ছেনা। ব্ল্যাক হোলের অভিনয়ে এটি একটি কেন্ডিডেট। দেখা যাক বিজ্ঞানীদের ইন্টারভ্যু-পরীক্ষাতে এটি উৎরাতে পারে কিনা!

ছায়াপথে যদি একটা বড়সড় ব্ল্যাক হোল থাকে, তবে এটি ধীরে ধীরে সব তারাকে টেনে এনে রাক্ষসের মত গপ করে গিলে হজম করে নিবে। ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে যে তাপগতি বিজ্ঞান খাটছে সেখানে দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে ব্ল্যাক হোল তখনই আকারে বাড়ে, যখন মেটার-এর মধ্যে পড়তে থাকে! আকর্ষণের দিগন্তরেখা বেড়ে যায়। ক্ষয়ের হারের চেয়ে বৃদ্ধির হার বেশী। আবার গণিতের সূত্রে, হকিং-এর উপপত্তি অনুসারে জানা যায়। ঐ পতনশীল মেটারের একটি সামান্য অংশমাত্র মহাকর্ষ তরঙ্গরূপে বেরিয়ে আসতে পারে।

মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গের সৃষ্টি। বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা থেকে পাওয়া যায় বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ। আর মহাকর্ষ তরঙ্গের সৃষ্টি ভরযুক্ত বস্তু থেকে, যাকে বলা হয় মহাকর্ষের চার্জ। এই মহাকর্ষ তরঙ্গ খুঁজে পাওয়া গেলে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব প্রমাণ হতে পারে। এটি খোঁজার, ধরার চেষ্টা হয়।

এমেরিকান পদার্থবিদ ওয়েবার 1961 সালে গ্রেভিটেশন ওয়েভ অথবা মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করলেন ; বিজ্ঞান জগতে উত্তেজনার উত্তাল ঢেউ জাগে—গ্রেভিটেশন তরঙ্গ যে কোয়ান্টাতত্ত্ব আর আপেক্ষিকতাবাদকে একটি সূত্রে বাঁধার প্রমাণ দিতে পারে !···অন্যত্র ওয়েবারের পদ্ধতি অনুসরণ করে এই তরঙ্গ পাওয়া যায়না। গ্রেভিটেশন তরঙ্গ প্রমাণিত হলোনা। 1971, '72, '73 সালে ওয়েবার ও তাঁর সহকারীরা ছোট মাপের নানা তরঙ্গ ঢেউ পান ; 1972 থেকে '75 সাল অবধি বহু পরীক্ষক বিজ্ঞানী, যেমন, ব্রাঙ্গিনস্কি, ড্রেবার, লেভিন, গারউইন, টাইসন, ডগলাস, এলেন ইত্যাদি, মহাকর্ষ তরঙ্গ খুঁজে চলেন। তবু যা Pulse বা তরঙ্গ তাঁরা পেলেন, তাদের সঠিকভাবে মহাকর্ষ তরঙ্গ বলা যাচ্ছেনা। অন্যদিকে ব্ল্যাক হোল কালো বলে তাকে দেখা যায় না। তবু এখানে আছে প্রবল মহাকর্ষের টান, আর একদিন হয়তো সেই টানের জন্য তরঙ্গের পথে এদের ধরা যাবে। যমক (Binery) তারার জগতে কোথাও না কোথাও ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে। ঘূর্ণ্যমান গতির জন্য এখানে প্রচণ্ড উত্তাপে যে বিকিরণ পাওয়া যায় তা সাধারণ দৃশ্য আলোর বর্ণালী নয় ; এটি অদৃশ্য এক্সরে ! এটির সাহায্যে কি জানা যাবে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব ?

আজকের স্পেস রিসার্চ যুগে উর্ধ্বাকাশে এক্সরে ধরা মাপার যন্ত্র পাঠিয়ে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় বাইনারি পালসার নক্ষত্রের কথা— যেখানে যমকতারা এক্সরে বিকিরণ করে যায়। এখানে কি ব্ল্যাক হোল আছে ? এটি এখনো প্রশ্ন।

1908 সালের 30শে জুন তারিখে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা অঞ্চলে একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। 1927 সালে কোনোরকমে বিজ্ঞানীরা ঐ অঞ্চলে যখন পেঁছোন, সেখানে তাঁরা কোন গভীর খাদ অথবা গর্ত, কোন উল্কাপিণ্ড কিছুই দেখতে পেলেন না। অথচ যে বিস্ফোরণ ঘটে তা একটি 20 মেগাটন TNT'র সমান। 1973 সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যাকসন ও রিয়ান (Jackson—Rayn) জানালেন, তুঙ্গুস্কা উল্কাটি একটি ছোট ব্ল্যাক হোল, এবং এটি সৌর পদার্থের নয়। কারণ সৌর পদার্থের হলে গোটাপৃথিবী-ধ্বংস হয়ে যেত। এই দুই বিজ্ঞানীর ধারণা এটি খুব একটি ছোট আকারের ব্ল্যাক হোল, ঘটমান পটভূমি সমেত এর আয়তন 10^{-10} মিটার, আর ভর হবে 10^{17}kg ॥ এই ধরনের ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের জন্ম মুহূর্তে ঘটেছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আর এরই একটি ত্রিশডিগ্রী কোণে নীচে নেমে এলে তুঙ্গুস্কার ধ্বংসটি ঘটিয়ে থাকতে পারে। এই ব্ল্যাক হোল পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে সোজা পৃথিবীকে এফোঁড় ওফোঁড় করে উত্তর আটলান্টিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এতজোরে, এত শক্তিতে বেরিয়ে গেছে যে চলার পথের কোনো গভীর চিহ্ন পৃথিবীর বুকে নেই। যা আছে তা সমস্ত অঞ্চলটিকে পুড়িয়ে জ্বলিয়ে পিছনে ফেলে যাওয়া। হিসেব কষে জ্যাকসন আর রিয়ান বললেন,

বেরিয়ে যাবার পথ হলো $40-50°N$ এবং $30-40° W$ অঞ্চল। এই দুই বিজ্ঞানী বর্তমানে 1908 সালের জুন মাসের সামুদ্রিক রেকর্ড ঘেঁটে দেখতে চান ঐ সময়ে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রে কোনো জলোচ্ছ্বাস জাতীয় কিছু ঘটেছিল কিনা। এখন পর্যন্ত এই সন্ধানের প্রশ্নে 'না' উত্তরটিই পাওয়া গেছে।

ব্ল্যাক হোলের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মহাবিশ্বের জন্মের একটি বিকল্প ধারণা গড়ে ওঠে—সিঙ্গুলারিটি নয়, অন্য কোয়ান্টা অবস্থা। সিঙ্গুলারিটির আবির্ভাব ঘটে প্রবল মহাকর্ষের টানে। মহাবিশ্বের সতত বর্ধমান গতিকে একমাত্র থামাতে পারে মহাবিশ্বের দুর্বলতম শক্তি মহাকর্ষ-গ্রেভিটি। সর্বদিকে, সর্বত্র মহাকর্ষ-শক্তি কাজ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যদি মহাবিশ্বে যথেষ্ট মেটার থাকে তবে পুনর্সংকোচনের শক্তি প্রবল হয়ে ওঠার ফলে কোলাপ্সের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। এই কোলাপ্সের জন্য যে মেটারের ডেনসিটির প্রয়োজন তা হলো প্রতি কিউবিক মিটারে তিনটি এটম। হয়েল নার্লিকরের সৃষ্টিতত্ত্বে স্পেসে যে এটম সৃষ্টি করে, তার থেকে এর চাহিদা বেশি। প্রতি 10^{31} আলোকবর্ষ দূরে স্পেসে একটানা একটা গেলাক্সি মোটামুটি সমান ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের সব ভর মাপা হলেও যে ঘনত্ব পাওয়া যায়—সেটি ঐ ক্রিটিকেল ডেনসিটির $\frac{1}{50}$ অংশমাত্র।—একমাত্র এদের ধরলে কোলাপ্স ঘটে না।

অতএব বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে এমন অদৃশ্য মেটারের কথা ভাবেন। একদলের মতে মহাবিশ্বের শতকরা 90 ভাগ মেটারই অদৃশ্য—এরা আছে বিরাট বিরাট মৃতপ্রায় তারকাদলে, ব্ল্যাক হোলে এবং মহাবিশ্বের নিঃসীম অন্ধকার অঞ্চলে। মনে করা হয়, বিগ ব্যাঙ এর পরে যে কণা তৈরি হয়েছিল তার অধিকাংশই ফোটন আর নিউট্রিনো কণা। এই নিউট্রিনো কণার মাস প্রায় শূন্য—ধরা হয় এর মান হলো 10^{-32}gm. অন্ধকার সাম্রাজ্যে এই অদৃশ্য, আপাত নিষ্ক্রিয় কণারা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া গত কয়েক বছরে নিউক্লিয়ার ফোর্স নিয়ে আলোচনার কালে বিজ্ঞানীরা দেখেন কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স শাখায় কয়েকটি সমস্যার সমাধান করে ফেলা যায় যদি ধরা হয় 10^{-10}gm মাসের একটি নতুন ধরনের কণা, নাম এক্সিয়ন (axion), যার উপস্থিতি নতুন জেগে ওঠা তারকার জগতে নিউট্রিনো ফোটনের সঙ্গে থাকে। ইতিমধ্যে আশেন (Aachen) ইনস্টিটুটের হেলমুট ফাইসনার (Faissner) এই কণা ধরতে পেরেছেন বলে ঘোষণাও করেছেন। যদি এক্সিয়ন কণা পাওয়া যায়, যদি দেখা যায় নতুন জেগে ওঠা গেলাক্সিতে এদের নিয়মমত রীতি মাফিক হাজিরা আছে, তবে অদৃশ্য ডেনসিটির সমাধান পাওয়া যায়। তাছাড়া থাকে আইনস্টাইনের জানানো গ্রেভিটোন কণা এবং অতিমহাকর্ষ তত্ত্বে জানানো নিউট্রিনো কণার মত গ্রেভিটি ক্ষেত্রের গ্রেভিটিনো (Gravitino) কণা। অর্থাৎ নানা অদৃশ্য কণার উপস্থিতি জালডোভিচ-হকিং এর গাণিতিক ছক থেকে পাবার সম্ভাবনা। এরা থাকলে আবার

সঙ্কোচন ধারায় মহাবিশ্বের কোলাপ্স ঘটতে পারে। তবে এ যদি ঘটে, তবে তা ঘটবে খুব আগে হলে 8×10^{10} বছর পর!

মহাবিশ্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রয়োগে আশ্চর্য আশ্চর্য অলঙ্কৃত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কোয়ান্টামতত্ত্বে নিমিত্ততার বোধ নেই—একে বলা হয় Indeterministic—যেখানে সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তা থাকে। এই তত্ত্বে পাওয়া উত্তরগুলির ব্যাখ্যা মুখের ভাষায় সব সময়ে দেয়া যায় না এখানে, কোয়ান্টা গ্রেভিটি তত্ত্বে একটি সম্ভাবনার কথা বলা হলো। কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনে জালডোভিচ কণার সৃষ্টি পেয়েছিলেন। এরই পথ ধরে বলা যায় সমস্ত ফিজিকেল জগৎ, মায় স্পেসটাইম, এই আন্দোলন বা ফ্লাকচুয়েশনের ফলেই জেগে উঠতে পারে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে কণার সহসা অকারণ আবির্ভাব দেখা যায়; অতএব স্পেসটাইমও দেখা দিতে পারে। এই বলিষ্ঠ সাহসী ঘোষণার তাৎপর্য হলো নিমিত্তবাদের ব্যাতিরেকে মহাবিশ্বের স্বয়ম্ আবির্ভাবের সম্ভাবনা!

গণিতের ছকে দেখা যায়, এই কোয়ান্টা-মহাবিশ্ব আকারে ও আবস্থানিক সময়ে—কিছু না—নামমাত্র। এই যে বিশ্বের সীড বা বীজটি (Seed) পাওয়া যায় এটি মহাবিশ্বের বিরাট আকারে দাঁড়ায় কি করে? এখানে তো বিগ ব্যাঙ জাতীয় বিস্ফোরণের সম্ভাবনা নেই—নেই অনন্ত মেটারের সংকোচনের ধারায় একটি বিন্দুতে আটকে থাকা! কোয়ান্টা গ্রেভিটি তত্ত্বে জানানো হলো ঐ প্রাথমিক ক্ষুদ্রকণার বিশ্বলোকের আকর্ষণের বাঁধনকে ভেঙে দেয় অন্য একটি শক্তি—যাকে বলা হবে এন্টিগ্রেভিটি—বিপরীত মহাকর্ষ। এই এন্টিগ্রেভিটির কল্পনা মহাবিশ্বের সৃষ্টি কালেই শুধু ভাবা হচ্ছে না—এই শক্তির কথা চিন্তা করা হয় আজকের দিনের একীভূত শক্তির প্রতিষ্ঠার কল্পনায়। এই এন্টি-গ্রেভিটির প্রচণ্ড বিকর্ষণের ফলে ঐ বিশ্বকণা যেন বিস্ফারিত হয়ে বর্তমানের আকার পেয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া গিয়েছিল তার ফলেই সৃষ্টি বিশ্বলোকের, মেটার-বিকিরণ, ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং স্পেসটাইমের।

এই তত্ত্বটির বিশেষত্ব হলো—সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে ফিজিক্সের নিয়ম দিশেহারা—সেই অঞ্চল আমাদের অচেনা, অজানা। আর এই নতুন বিশ্বকণার জগতে জানা যায়, সব ফিজিক্সের উপকরণ, কণা-বিকিরণ এমনকি স্পেসটাইম—এরা সব কিছু ফিজিক্সের নিয়মের ফলে সোজাসুজি এসে পড়ে। বর্তমানে যে বিশ্ব-লোক দেখা যায় সেটি প্রাথমিক বিশ্বকণার তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক। কণাজগতে ভার্চুয়াল ও আর্বিটারি সৎ ও অবাধ কণার উপস্থিতি জানা যায়; পজিট্রন-ইলেকট্রনের মিলনে কিছু পরে পাওয়া যায় ফোটনকণা গামারে। মাসের 'কিছু পরে' অংশটিতে কি ঘটে তার সম্ভাবনা জানা যায়,—তার প্রমাণ নেই। এই সব ইনফর্মেশন ফিজিক্সের জগতে হাজির হবার আগেই হারিয়ে যায়। প্রাথমিক বিশ্বকণার বিস্ফোরণের সংবাদও হারিয়ে গেছে—যা আছে তা আমাদের চেনাজানা

বিশ্বলোক! অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় সৃষ্টি কি করে হলো বা হবে তা নেই। আছে বিস্ফোরণ—যেখানে ফিজিক্সের নিয়ম খাটে। এই নিয়মকে মেনে নিয়ে ইউনিভার্স বা বিশ্বজগৎ দিব্বি চলতে পারে।

কোয়ান্টা গ্রেভিটি অসম্ভব অবাস্তব সংবাদ জানাচ্ছে—যেমন অতিমহাকর্ষ অথবা Super Gravity, বিপরীত মহাকর্ষ অথবা Anti Gravity—যারা গণিতের ধারায় আসে। এবং আসে একমাত্র মহাবিশ্বের কোয়ান্টায়িত অবস্থায়, বীজ বা seed এর আকারে। যত দেখা যায়, বিশ্বজগতের অণু-পরমাণুতে গ্রহনক্ষত্রে যে স্ট্রাকচার ধরা পড়ে, তাদের মধ্যে কাজ করে গণিতের ছকের সুষমা বা সিমেট্রি। এই সুষমার পথে দেখা দেয় শৃঙ্খলা ও সাযুজ্যবোধ। ফিজিক্সের নিয়মকানুন এখন সহজ স্পষ্টতায় শৃঙ্খলিত হয়ে দাঁড়ায় যে বিশ্বজগতের নকশাটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ব্ল্যাক হোলের সাহায্যে গড়া কোয়ান্টা গ্রেভিটির গণিতে সেই অনুপম অভাবনীয় রহস্যের উন্মোচনের ইশারা। আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্ব এখানে অসাধারণতত্ত্ব পেতে চলেছে যেন!

ভেড়া চেনার প্রচেষ্টায়

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের পাদপ্রদীপের পটভূমিতে যে দুটি মূল অভিনেতার ভূমিকায় নামে, তারা ভেলসিটি এবং মাস। গতির কারণ যে কাইনেটিক এনার্জি, যার কথা নিউটন বললেন, সেখানেও থাকে মাস আর ভেলসিটি; কাইনেটিক এনার্জি হলো $\frac{1}{2}mv^2$ ॥ নিউটনের গতিসূত্রে বলা হলো, কোন গতিশীল বস্তুতে যদি বাইরে থেকে ফোর্স জোগানো হয় তবে বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটে; পার্থিব জগতেও সমগতি অথবা ভেলসিটি বজায় রাখতে ফোর্সের জোগান দেওয়া দরকার। নিউটন আরো বললেন ফোর্স $F = ma$ ॥ যেখানে a জানায় একসিলারেসন বা গতির পরিবর্তন। নিউটনের ভেলসিটির ব্যাখ্যায় সাদামাটা সংজ্ঞা—এটি হলো সময়ের সঙ্গে স্পেসের পরিবর্তন; অথবা যাকে বলা যাবে দূরত্বের হার। কোনো বস্তু ধীর বা দ্রুত ভেলসিটিতে যাচ্ছে বললে যে ধারণা জাগে, তাতে অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু এই অস্পষ্টতা জাগে মাসের সংজ্ঞায়।

নিউটনের মাসের ব্যাখ্যায় জানা যায় কোনো বস্তুকে ত্বরণে নামাতে যার সাহায্য লাগে সেটি মাস। গতিতে বাধা তোলে মাস। যার মাস বেশি তাকে ত্বরণে নিয়ে যেতে বেশি ফোর্স লাগে। ফুটবলে কিক মারলে যতদূর বল পাঠানো যায় হকিবলে কিক মারলে তত যাবে না, কারণ হকিবলের মাস বেশি। অন্যভাবে বলা যায়, হকি বলের ওজন বেশি। নিউটনের মাসের ব্যাখ্যায়, অতএব, মহাকর্ষের টানের কথা আসে। তাঁর কথার রেশ ধরে বলা যায়, পার্থিব জগতে যে বস্তুর মাস বেশি, তার ওজন বেশি—বস্তু ভারি; মাস কম হলে বস্তু হালকা ঠিক এই কারণে মাস সংক্রান্ত ঘোষণায় সহজেই ওজন কথাটি আপনা থেকে জেগে ওঠে। অন্যদিকে সদৃশ্য তত্ত্বে আইনস্টাইন রেস্টমাস এবং এনার্জিকে রূপান্তরিত অবস্থা জানালেন; বললেন, $E = mc^2$ ॥

গতির জগতে কাইনেটিক এনার্জি বাড়িয়ে গেলে যা ধরা পড়ে, তা হলো স্বাভাবিক ভাবে গতির পরিবর্ধন—এখানে গতিবৃদ্ধি। অথচ কাইনেটিক এনার্জির ছকে থাকে মাস ও ভেলসিটি। শুধু একটির পরিবর্তন হচ্ছে, অন্যটি—মাসের, হ্রাসবৃদ্ধি নেই,—এটিতে যেন ধ্রুবকত্বের ছাপ দেখা দেয়। সাধারণ গতির জগতে, যে গতি আমরা বস্তুতে সঞ্চার করতে পারি, সেখানে কাইনেটিক এনার্জির প্রয়োগে একমাত্র ভেলসিটির পরিবর্তন ধরা পড়ে, পরিবর্তনের ক্রিয়ায় মাস অংশ নেয়না—এই পরীক্ষালব্ধ তথ্যটিতে কোথাও যেন অসঙ্গতি আছে—কারণ বস্তুতে বস্তুতে মাসের পরিবর্তন আছে। 1890 সাল নাগাদ লরেন্স-

পোআঁকারের গণিতের ছকে সঙ্কোচন তত্ত্ব যখন ধরা দেয়, তখন গতির সঙ্গে মাসের পরিবর্তনের ধারণাটি অস্পষ্ট আকারে জাগিয়ে তোলে। মনে হয় কাইনেটিক এনার্জির প্রয়োগে মাস ও ভেলসিটি—দুটিরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই ধারণাটি তত্ত্বাকারে প্রকাশ পেল 1905 সালে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে। এখানে তিনি জানালেন $m = m_0 r$ যেখানে r জানাবে $\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$ ॥ তাঁর মতে গতির সঙ্গে ভরের পরিবর্তন সহজ সরল ধারায় ঘটে যায়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ধারায় মাসকে ধরা হতো গতির পথে অপরিবর্তনীয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে সেই ধারণায় চিড় ধরে, আর বিশ শতকের প্রথম দশকেই আইনস্টাইন জানালেন গতির ক্রিয়ায় দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন যেমন সত্য, তেমনি সত্য কোন বস্তুর ভর গতির পরিবর্তনে বেড়ে যাবে। তাছাড়া আরো দুটি সিদ্ধান্ত এই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে পাওয়া যায় ;—তারা হলো গতিবেগের যোগফল আলোর গতির পরিপ্রেক্ষিতে হবে এবং আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি। কোন বস্তুর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি হতে পারে না। -এই সিদ্ধান্তগুলি গতি বিজ্ঞানের পরিসীমায় পরীক্ষা করা দরকার।

আলোর গতি ধরা হয়েছে সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার—যার সঠিক মাপ হলো 299792 5 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। এই বিরাট গতির এক দশমাংশ অংশ নিয়ে কোনো বস্তু যদি ছুটে যায়, তবে সেখানে যে মাসের পরিবর্তন ঘটে তা মাত্র $\frac{1}{2}\%$। এই গতিতেও মাসের পরিবর্তনে আহামরি কিছু ঘটে না। এই গতি পেতে হলে বাইরে থেকে যে এনার্জির প্রয়োগ হবে, তার ফলে v এর বৃদ্ধিই শুধু আপাতত ধরা পড়ে ; মাসের বৃদ্ধিটুকু এড়িয়ে যাওয়া যায়। অথচ বস্তু যখন আলোর গতির কাছাকাছি পেঁছোয়, তখন দেখা যায়, যে হারে ভেলসিটি বাড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি হারে মাসের বৃদ্ধি ঘটছে। বস্তু যখন আলোর গতি পায়, তখন y' র মান হয় $\frac{1}{0}$; অতএব $m' = m_0 y$ সূত্রে সেই অবস্থায় জানাবে মাস m' এর মান ইনফিনিটি। এই অবস্থায় বাইরে থেকে যতই এনার্জির জোগান দেওয়া হোক, সেই ইনফিনিটি মাস বস্তুর গতি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। কোনো জবরদস্ত ঠেলাঠেলিতেও সেই বস্তুর গতি আর বাড়েনা। অন্যদিকে দেখা যায়, সঙ্কোচন তত্ত্ব অনুযায়ী গতির সঙ্গে বস্তুর আয়তন কমে। কোনো বস্তু যদি আলোর গতির শতকরা 99 ভাগ অংশ পায়, তবে বস্তুর আয়তন কমে দাঁড়ায় শতকরা 14 ভাগে। বস্তু যদি আলোর গতি পায়। তাহলে বস্তুর দৈর্ঘ্য শূন্যে গিয়ে ঠেকে, বস্তুই আর থাকেনা !

আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তটি সঠিক—এটি প্রমাণিত তত্ত্ব। আলোর গতির কাছাকাছি গতি নিয়ে ছুটে চলা মৌলকণার জগতে এই পরীক্ষা হয়েছে—দেখা

গেছে দৈর্ঘ্য ও ভরের পরিবর্তন ঘটে – বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারেই তা ঘটে থাকে। যে জগতে আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রমাণ খোঁজা হয়, সেই কণাদের গতিবেগ আলোর চেয়ে কম। এই আলোর চেয়ে কম গতিবেগের বস্তুদের নামকরণ হলো টার্ডিয়ন (Tardyon); নাম দিলেন বিলানিউক (BILANIUK)॥ এছাড়া আছে অন্য জাতীয় কণা, যাদের গতিবেগ আলোর গতির সমান ; এরা হলো ফোটন, গ্রাভিটন, এবং নিউট্রিনো। এদের রেস্টমাস জিরো। অন্যদিকে এইসব কণারা কোথাও স্থির নয়। অতএব, এদের রেস্টমাস বা স্থির ভর সোজাসুজি মাপা যায় না। এই কারণে বিলানিউক রেস্টমাসের পরিবর্তে প্রপারমাস ব্যবহারের কথা বললেন। বলা যায়, যে সব বস্তুর প্রপারমাস জিরো, তারা আলোর গতি নিয়ে চলবে। বিলানিউক এজাতীয় কণার নাম দিলেন লাক্সন (Luxons)—নামকরণ হলো লাতিন Lux শব্দ ধরে যার অর্থ আলো। এই জড় জগতে লাক্সনদের গতিই সর্বোচ্চ - এবং তা আলোর গতি।

এই সর্বোচ্চ গতিমান আলোর সাহায্যে দূর বা নিকটবর্তী তারাদের খবরাখবর সংগ্রহ করা হবে। মহাবিশ্বের আকারের তুলনায় এই গতি কিছু না। আমাদের গোলাক্সির সীমানা আছে 75000 আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি নিয়ে যাতায়াত করলে সেই সীমানার খবর পাওয়া যাবে 15,000 পার্থিব বছর পর ! এতটা সময় লাগে খবর জানতে ! এই দূরত্বটা কি দ্রুতবেগে, অল্পসময়ে পার হওয়া যায় না ? আলোর চেয়ে গতিবেগ সম্পন্ন বস্তু কি পাওয়া যেতে পারে না ?

সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা এই সমস্য নিয়ে প্রথম মাথা ঘামান। তাঁদের কাছ থেকে যে সমাধান পাওয়া গেল তাহলো কোনো বস্তুর ইনারশিয়া বা জাড্যকে যদি কমাতে কমাতে শূন্যে নামানো যায়, তবে ইনারশিয়া বা বাধা নেই বলে বাইরে থেকে ফোর্স দিলে যে কোনো গতি পাওয়া যায়। এই সমাধানেও কিন্তু আশ্বাস পাওয়া গেল না। ইনারশিয়াকে জিরো করা মানে নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী মাসকে জিরো করা ; কারণ গতিবেগে বাধা তোলে মাসের সমার্থক ইনারশিয়া। অন্যদিকে মাস জিরো মানে লাক্সন কণা – যার গতি আলোর গতির সমান। ইনারশিয়া বা জাড্যকে শূন্য করেও আইনস্টাইনের তত্ত্বের বেড়া টপকানো যায় না !

আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা যায় যে কোনো বস্তু আলোর গতির চেয়ে বেশি গতি নিয়ে চললে তার মাসকে আমাদের জড়জগতে বোঝা যায় না। যদি ধরি বস্তুর গতি আলোর গতির দ্বিগুণ বা 2c, তা হলে সংকোচন তত্ত্ব অনুযায়ী $L^1 = \frac{L_0}{\gamma}$ ধরে $L^1 = L_0 \sqrt{-3}$ পাওয়া যায়। একই ভাবে মাসেও পাওয়া যাবে ইমাজিনারি রাশি। গণিতের ছকে $\sqrt{-1}$ যা ইমাজিনারি রাশি, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকলেও এই জড় জগতে এটি অবাস্তব বলেই ইমাজিনারি বা কাল্পনিক !

1962 সালে বিলানিউক এই অবাস্তব কাল্পনিক মাসের বস্তুদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা এলিসের আয়নার পেছনের জগতের কথা ভাবেন ; ভাবেন বিপরীত বিশ্বের কথা। এই জগতে সাধারণ মাসের বস্তু বাইরের ফোর্সে দ্রুতবেগে যায়, আবার বাধার ফলে গতি হ্রাস পায়। বিপরীত বিশ্বে, ইমাজিনারি মাসের জগতে বাইরের ঠেলায় সেই বস্তুর গতি হ্রাস হবে, অথচ বাধার ফলে ঘটে গতিবৃদ্ধি ! এই জগতে যে বস্তু যত জোরে ছোটে তার এনার্জি তত বেশি। অন্যদিকে বিলানিউকের চিন্তায় ইমাজিনারি মাসের বস্তু দ্রুত গেলে তার এনার্জির খরচ কম।...এলিসের জগতে, আয়নার প্রতিবিম্বে ডান হাত হয়ে যায় বাঁহাত—এটি দৈহিক বা স্পেসের পরিবর্তন। বিলানিউক বললেন, শুধু দৈহিক নয়, পরিবর্তন গুণগত হবে অর্থাৎ পরিবর্তন হবে চার্জের ! এ যদি ঘটে থাকে, তবে ইমাজিনারি মাসের বস্তুকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যাবে ; তত্ত্বে গোলমাল ঘটবে না। শুধু যাকে পজিটিভ ভাবা হতো অন্য জগতে সে হবে নেগেটিভ। অতএব ঐ জগতে আলোর চেয়ে ধীরগতি কণার পরিবর্তে পাওয়া যাবে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণা। বিখ্যাত পদার্থবিদ জেরাল্ড ফাইনবার্গ (Gerald Feinberg) এই কণার নাম দিলেন টাকিয়ন (Tachyons)—যে শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ গ্রহণ করে গড়ে ওঠে,—যার অর্থ হলো স্পীড ! ফাইনবার্গের টাকিয়ন কণার যত গতি বাড়ে, তত এনার্জি কমে ; যত সে ধীরে যায়, তত এনার্জি বেড়ে ওঠে ; আর আলোর গতির কাছে কমতে কমতে যখন সে আসে, তখন তার গতি কমানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী এই টাকিয়ন কণার গতিবেগ আলোর চেয়ে কম হতে পারেনা। লাক্সন কণার বেড়া হলো তার গতির বাধা !

বিলানিউক-ফাইনবার্গের তত্ত্ব অনুযায়ী তিন জাতের কণা পাওয়া যায়—যাদের শ্রেণীবিন্যাস গতিভিত্তিক। এরা হলো টার্ডিয়ন, যার গতি আলোর গতির কম ; লাক্সন—যার গতি আলোর গতির সমান ; এবং টাকিয়ন, যার গতি আলোর গতির বেশি। অর্থাৎ এ যেন পরিচিত কো-অর্ডিনেটের ছক—যার একপাশে থাকে প্লাস সংখ্যারা, অন্যপাশে মাইনাস সংখ্যা আর মধ্যখানে অরিজিন হয়ে জিরো। প্লাস থেকে মাইনাসে বা মাইনাস থেকে প্লাসে যেতে হলে জিরোকে পার হতে হবে ! সেই হলো বেড়া !—বেড়ার ওপাশের টাকিয়ন কণাকে এই জড় জগতে 'দেখা' যাবে ?

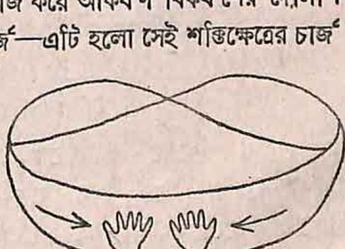
তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় মনে করা হয়। প্রকৃতির মৌলিক নীতি বা নিয়মবিরুদ্ধ কিছু না হলে সবকিছু ঘটতে পারে, থাকতে পারে। এই রীতির জন্য ডিরাকের বিপরীত কণার সিদ্ধান্তকে নাকচ করা যায়নি। কারণ বিপরীত কণার অস্তিত্বটি মৌলিক নিয়ম মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঠিক এই কারণে টাকিয়ন কণার অস্তিত্বকেও তুচ্ছ করা যায় না ; এদের থাকার সম্ভাবনা আছে। তবে এদের এখন পর্যন্ত ধরা-বোঝা যায় না,—এই যা ! যেকোনো কণাকে তার পেছনে ফেলে

রাখা চিহ্ন ধরে জানা যায়। পলাতক কণাকে গ্রেফতার করার এটি একটি অন্যতম ক্লু। টাকিয়নও যখন ভেকুয়াম চেম্বারে ছুটে যাবে তখন পেছনে সে ফেলে যাবে আলোর ঝলক—এটি তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত। এই ঝলককে ধরতে পারলে, পেছনে ফেলে যাওয়া ক্লুকে খুঁজে টাকিয়নের গুণচরিত্র বোঝা সম্ভব। অথচ এই কণা এত দ্রুত যায় যে তার পেছনে ফেলা স্মৃতিটুকুও কোনো যন্ত্রে ধরা যায় না ; এক সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে এর উপস্থিতি ! এই কণা অধরা। তবে তার অস্তিত্ব নেই—তা কিন্তু বলা যায় না !

আবার ইলেকট্রন-পজিট্রন এই দুটি টার্ডিয়ন কণার মিলনে পাওয়া যায় গামারে নামের ফোটন কণা যা. লাক্সন। লাক্সন গামারে থেকে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন-পজিট্রন এই যুগ্ম কণার জুটি। এই তথ্যের সূত্র ধরে টার্ডিয়নের রূপান্তরে টাকিয়ন কণাকে ধরা আবার টাকিয়ন থেকে টার্ডিয়নে ফিরে আসার সম্ভাবনাটিও ভাবা হয়। এই জটিল ভাবনাটি এখনো ভাবলোকেই আছে।

এলিসের জগতের ছাঁচে এই তিনকণার জগৎ নিয়ে চিন্তা। আমাদের জগতে টার্ডিয়নের হাজিরা বেশি, যার সীমায় আছে,—আয়নার মত—লাক্সনের বেড়া ; যার ওপাশে থাকে টাকিয়ন কণা এবং সেই জগতের সীমাতেও আছে লাক্সনের বেড়া। দুটি জগতে যে নিয়ম কাজ করে, তারা যে এক এবং বিপরীত সেটি 1971 সালে বিলানিউক দেখালেন। দুটি জগতে এক অবর্ণনীয় সুষমা আছে।

আমাদের মৌলকণার জগতে এই সুষমা দেখা দেয়। এখানে যে ধ্রুব সত্তাগুলি অপরিবর্তিত থাকে তারা হলো : a) শক্তিভর (b) ভরবেগ (c) আবর্তনের ভরবেগ (d) তড়িতের চার্জ (e) লেপটন সংখ্যা (f) বেরিয়ন সংখ্যা। বস্তুজগতের নিয়ম বা Physical laws-এর সুষমা দেশান্তরের (Translation in Space) এর সুষমা। এবং শক্তি ও ভরবেগের সংরক্ষণের সঙ্গে দেশান্তর শুধু নয়, কালান্তরের সুষমারও যোগ থাকে। এই যে সুষমা যা চার্জের জগতেও প্রযুক্ত—সেখানেও পজিটিভ ও নেগেটিভ রাশি সহজে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে আমাদের এই জড় জগতেও—কারণ এখানে কাজ করে আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলা। অন্যদিকে মাস যাকে বলা হয় মহাকর্ষের চার্জ—এটি হলো সেই শক্তিক্ষেত্রের চার্জ —যেখানে কাজ করে শুধু আকর্ষণ। ইমাজিনারি মাস বা নেগেটিভ মাসের বাস্তব উপস্থিতি এই জড়জগতে সম্ভব কিনা বলা অসম্ভব।

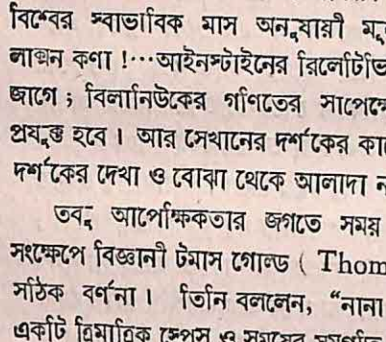


আয়নার ওপাশের জগতেও আইনস্টাইনের সূত্র খাটে। গোলমাল শুধু এক জায়গায়। জ্যামিতিতে মোবিয়াস স্ট্রিপের (Mobius Strip) খেলা আছে—সেখানে স্পেসের মোচড়ের জন্য কোনো বস্তু উলটো চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। এই যে টাকিয়নের জগৎ—সে যেন ঐ জাতীয় মোচড়ের ফলে গড়ে

তোলা জগৎ—যে জগতে টাকিয়ন কণা স্বাভাবিক, তার ইমাজিনারি মাসও স্বাভাবিক। দুটি জগতে একই সুষমা। মোচড়ের পথে এই কণা আমাদের জগতে হাজির হতে পারে কি ?

1971 সালে গণিতের সূত্রে বিলানিউক দুটি কণাজগতের একটি আশ্চর্য সুষমার কথা বললেন। টাকিয়নের জগতের দর্শকের কাছে, যে আছে নেগেটিভ বা বিপরীত জগতে, সেই নেগেটিভ ধারণার সাপেক্ষে মনে হবে এই কণার গতি আলোর গতির চেয়ে কম.—এটি টার্ডিয়ন। তার জগতের বেড়ায় আছে লাক্সন কণা এবং বেড়ার ওপাশে আছে টাকিয়ন কণা! অর্থাৎ যেকোনো বিশ্বে, সেই বিশ্বের স্বাভাবিক মাস অনুযায়ী মূলকণা হলো টার্ডিয়ন আর বেড়ায় থাকে লাক্সন কণা!…আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব থেকে বিপরীত বিশ্বের চিন্তা জাগে; বিলানিউকের গণিতের সাপেক্ষে জানা যায় সেই বিশ্বেও প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযুক্ত হবে। আর সেখানের দর্শকের কাছে যা ধরা পড়ে, তা আমাদের জগতের দর্শকের দেখা ও বোঝা থেকে আলাদা নয়!

তবু আপেক্ষিকতার জগতে সময় নিয়ে সংশয় জাগে। এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বিজ্ঞানী টমাস গোল্ড (Thomas Gold) যা বলেছেন, সম্ভবত সেটিই সঠিক বর্ণনা। তিনি বললেন, "নানা পরীক্ষার ভিত্তিতে আমাদের আবিষ্কারে একটি ত্রিমাত্রিক স্পেস ও সময়ের সমগতি অথবা সমপ্রবাহ ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। তবু এই জানা বাস্তবের সঠিক নির্দেশ কি না—সেখানে আমার সন্দেহ আছে। রিলেটিভিটি তত্ত্ব থেকে স্পেস ও টাইমের সম্পর্কের খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত



জানা গেল। জানা যায়, দর্শকের নিজস্ব আঙিনায় গতিশীল জগতে ভবিষ্যতের ঘটনা বর্তমানের সঙ্গে যুগপত্তার বোধ টানবে। সময়ের প্রবাহ এখানে পরম নয়; কিন্তু ঘটনার সম্পর্ক-সম্বন্ধে অপরিবর্তনীয়তা এখনো থাকে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে ত্রিমাত্রিক স্পেসের বর্ণনা বুঝি স্বাভাবিক। যা বুঝি, তা হলো একটি গণিতের এলজাব্রিক সিস্টেম; আর সেটি জিওমেট্রির একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গীর সঙ্গে মিল টেনে দাঁড়ায়। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎহারা ফিজিকেল জগতের বর্ণনায় সময়ের প্রবাহ বা Flow শব্দটি খাপ খায় না। এটি আছে। আবার স্পেসের যে ধারণা—সেও হয়তো সঠিক নয়! হয়তো এমন কোনো গাণিতিক এলাজাব্রিক সিস্টেম পাওয়া যাবে, যার নিয়মকানুন অনেক সহজ সরল; অনেক সহজে সেখানে ইভেন্টের সম্পর্কের ধারা বোঝা যাবে। হয়তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই রিলেটিভিটি তত্ত্বকে জটিল-কঠিন মনে না হয়ে, মনে হবে

স্বাভাবিক ; এটি অভাবনীয় নয়। ফিজিক্সের সব নিয়ম হয়তো সেই তত্ত্বে ঠাঁই পাবে ; তাদের আরোপ করা হবে না। আর স্পেস টাইমের সংজ্ঞায় গড়া এই বিশ্বলোক অনেক বোধগম্য হবে।"

—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভাষা গণিত। হয়তো প্রথম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে এই ভাষা অনেক কঠিন, অনেক জটিল। তাছাড়া আইনস্টাইন তাঁর সাধারণতত্ত্বকে আরো সাধারণ করতে চেয়েছিলেন –যেখানে ফিজিক্সের সব শক্তি তার সব নিয়ম কানুন নিয়ে ঠাঁই পাবে—যেটি তার একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। সেটির সম্ভাবনা ঘটেনি। মৌলকণার জগতে বিপরীত চার্জ, মাস অথবা সময়ের সম্ভাবনা থাকে, এরা অভাবনীয় নয়। মহাকর্ষের আকর্ষণের জগতে ইমাজিনারি মাস দেখা দেয়না। গ্রেভিটন কণা লেপ্টন—তার চার্জ নেই ; মাস নেই। বিপরীত বিশ্ব কি এ জগতে স্পষ্ট হয়ে বোঝা যায় ?

টাকিয়নের চিন্তাধারায় রিলেটিভিটি তত্ত্বটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার চেষ্টা জাগে। তত্ত্বের বেড়াটি যে কোন্ নিয়মের এবং কেন—এটি এখন প্রশ্ন। বেড়াটি কি ভাঙা যাবে ?

যেখানে দাঁড়িয়ে

1919 সালে এডিংটন একটি যুগান্তকারী পরীক্ষায় সূর্যের কাছে আলোর গতিপথ বাঁকার তথ্যটি প্রমাণ করলেন ; একটি নতুন যুগের সূচনা হলো—নিউটন-উত্তর আপেক্ষিকতাবাদের যুগ ; পাওয়া গেল একটি মহাকর্ষ তত্ত্ব।—একটি অসাধারণ তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে মহাযুদ্ধের মাঝখানে ; তার ভবিষ্যদুক্তির তথ্যভিত্তিক প্রমাণটি তত্ত্বের ঘোষণার তিনবছর পরে ঘটলেও, তত্ত্বটির আরো শুদ্ধতর শুদ্ধতম প্রমাণের জন্য অন্বেষণের পথে যাত্রায় বিজ্ঞানীরা তৈরি হলেন। এই সুডোল, সুন্দর তত্ত্বটিকে আরো মনোহর করা যায় কিনা এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনার শুরু।···নিউটনের ছোট জগৎ হঠাৎ অনেক বিশাল বিরাট হয়ে দেখা দেয় ; এখানে কাজ করে, দূরে অথবা নিকটে, মহাকর্ষ ; কাজ করে বিরাট অপার্থিব মহাজাগতিক বস্তুদের মধ্যে ; তার শক্তি স্পেসে পরিব্যপ্ত ; তার গতি স্পেসে পরিকীর্ণ !··আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানীরা একথা জানলেন। সুতরাং, বিরাট মহাকাশে, ইউনিভার্সের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকর্ষ শক্তিকে সঠিকভাবে জানা যায় কিনা, আইনস্টাইনের তত্ত্বটি এখানে কতটা খাটে--এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন—আলোচনা তোলেন। তত্ত্বটির প্রমাণে আইনস্টাইন তিনটি পরীক্ষার কথা বলেছিলেন :—সূর্যের কাছে আলোর পথ বাঁকে, মহাকর্ষের টানে আলোর বর্ণালী লালের দিকে সরে যায়, এবং মার্কারির অনুসুর গতির গোলমালের কারণ মহাকর্ষের আকর্ষণ। তিনটি পরীক্ষাই দ্রুত ঘটে যায়। পরীক্ষায় পাওয়া মান এবং তত্ত্বের ভবিষ্যদুক্তিতে জানানো মানে তফাত থাকে ;—তবু পরীক্ষাগুলি জানায় আইনস্টাইনের প্রাগুক্তিকটি সত্য। অতএব, পরীক্ষা ও তত্ত্বের গরমিল চুকিয়ে মহাকর্ষ তত্ত্বটিকে পরিশুদ্ধাকারে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানীর।

আশ্চর্য, নতুন তত্ত্বটি প্রকাশের পর তাকে বিচার করতে যিনি প্রথম হাজির হলেন, তিনি তত্ত্বটির প্রবক্তা এলবার্ট আইনস্টাইন। 1920 সালে লেইডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বর্ধনা সভায় আইনস্টাইন একটি ভাষণ দেন—ভাষণটির একটি জার্মান ভাষার অনুলিপি 1933 সালে প্রকাশ হয়েছিল। আর এই ভাষণের সংবাদ নতুন করে শতবার্ষিকী উৎসবকালে বিজ্ঞানীরা জানলেন কেমব্রিজ ও প্রিন্সটন পেপার্সের মাধ্যমে।

তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী অধ্যাপক এইচ এ. লরেন্স, যিনি লেইডনের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন—এই হলো আইনস্টাইনের মত। সেই লরেন্সের উপপাত্তি উদ্ধৃত করে আইনস্টাইন বললেন, ইথারের সমস্ত যান্ত্রিক গুণদের সরিয়ে দিয়ে তত্ত্ব জগতে সরলতা এনে লরেন্স এক আশ্চর্য বিস্ময়কে প্রকাশ

করেছেন। "লরেন্সের ধারণায়, মেটার নয়, ইথারের বিবৃতিতে বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের প্রকাশ। মৌলিক কণার দল গতি নিয়ে যেতে পারে ; তাদের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্রিয়াকলাপ একমাত্র ইলেকট্রিক চার্জ বয়ে নিয়ে যাবার উপর নির্ভর করছে।…কেউ কেউ ঠাট্টা উপহাস করে বলেন, Immobility বা অচলতা নামক যান্ত্রিক গুণছাড়া ইথারের আর সব যান্ত্রিক গুণ লরেন্স ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আইডিয়াতে যে ধারণা সেখানে ইথারের এই শেষ গুণটিরও বিদায় ঘটে—যেটি তার গতিহীনতা, তার অচলতার গুণ। ইথার নেই, তার অস্তিত্বও নেই। বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রে নেই মাধ্যমের অবস্থা বা চরিত্র নিয়ে ভাবনা।…এই ক্ষেত্র চিন্তা বাস্তব। একে আরো ভেঙে ভেঙে এটমের মত ছোট করা যাবে না। সহজভাবে যে ধারণা জাগে তাহলো চেনাজানা মেটারের মত ভরবেগ ও এনার্জি নিয়ে তাড়িৎ চুম্বক বিকিরণ যাবে। কারণ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী মেটার আর বিকিরণ শুধু শক্তি বন্টনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।…জলের বুকে ঢেউয়ের কথা ভাবা যাক। দুটি বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে একটির বিচারবর্ণনা করা যাবে। যেমন জল আর বায়ুর মাঝামাঝি জায়গায়, জলসীমার কাছে, সময়ের পরিবর্তনটিকে মেনে নিয়ে তরঙ্গাভঙ্গীর বর্ণনা দেয়া যেতে পারে ; অথবা ভাবা যায় একটি ছোট ফ্লোট (Float),—যার সাহায্যে জলের ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু বা কণার অবস্থানের পরিবর্তনটা বোঝা যাবে। যদি মৌলিক ফিজিক্সের সাপেক্ষে এইধরনের ফ্লুয়িডের পার্টিকলের গতি পথ বোঝার জন্য কোন ফ্লোট বা এ জাতীয় বস্তুর ব্যবহার সম্ভব না হয়, যদি জলের মধ্যে স্পেস ছাড়া অন্য কিছু দেখা-বোঝা না যায়, তবে জল যে নানা গতিমান পার্টিকলে গড়া, সেই ধারণার ভিত্তি কোথায় ? তবুও আমরা কিন্তু একে মাধ্যম বলেই বর্ণনা করব।"…আইনস্টাইনের বক্তব্যে অস্পষ্টতা নেই। গণিতের ব্যাখ্যা প্রপঞ্চের মডেলে দেওয়া নিশ্চয় কঠিন। তবু বোঝার সুবিধার জন্য মডেলের প্রয়োজন ঘটে! তাঁর তত্ত্বেও মাধ্যম থাকে—সেই মাধ্যম স্পেসটাইম।—"ইথারের অস্বীকৃতির মানে হলো শূন্য স্পেসের কোনো ফিজিকেল গুণ থাকতে পারে না।" - সাধারণ তত্ত্বে তিনি শূন্য স্পেসের ডাইনামিক প্রপার্টি বা গতিময় রূপটি প্রতিষ্ঠা করলেন। জানালেন এখানে আছে, থাকে - এনার্জি, মোমেন্টাম এবং এগুলার মোমেন্টাম। তাঁর তত্ত্বে স্পেস ও ইথার সমর্থক। মূলতঃ তাঁর তত্ত্বের সাপেক্ষে মহাকর্ষ বিকিরণকে প্রোপেলান্ট (Propellant) বা সামনে চালিয়ে নিয়ে যাবার যন্ত্র ভাবা যেতে পারে। স্পেসটাইমের বক্রীতলে মহাকর্ষ যেন ছোট ছোট ঢেউ তোলে। ইথারের মতে অবিশ্বাসীরা তাই ভাবেন এই প্রোপেলান্ট ব্যবহার করে স্পেসশিপ শূন্য থেকে কিছু যেন পেয়ে একটি কঠিন শূন্যতাকে বিশাল শূন্যতায় ত্যাগ করে এগিয়ে যাবে। — এই উদাহরণ শুনতে অবাস্তব অসম্ভব বলে মনে হলেও এটি হলো একটি গণিতের ছকের অনুবাদ। মুখের ভাষার মডেলে আইনস্টাইনের ইথার এবং স্পেসটাইমের

সমার্থ চিন্তার ব্যাখ্যা শুধু যে কঠিন তা নয়, এটি অনেক জায়গায় তত্ত্বটির বিকৃতি যেন প্রকাশ করে।

তাঁর তত্ত্ব গঠনের প্রথম অংশে আছে চিন্তাভাবনা - যাকে অন্যেরা বলেছেন তাঁর ইনট্যুশনে গড়া উপলব্ধি ;— আর আইনস্টাইন জানালেন, এটি প্রাকবিজ্ঞান চিন্তা। অতি সামান্য তথ্য হাতে নিয়ে শুধু চিন্তার পদ্ধতি দিয়ে তত্ত্বটির কাঠামোটি ধরতে পারতেন তিনি। তারপর গণিতের ও মুখের ভাষায় কাঠামোটির রূপরেখা টানতেন, প্রাণসঞ্চার করতেন। তত্ত্ব জানাতো ভবিষ্যদ্‌ক্তি —কী পাওয়া যাবে ;—আর যার প্রমাণ সম্ভব। প্রমাণের পথে তাঁর তত্ত্বের পরীক্ষাভিত্তিক অথবা এম্পেরিকেল সর্বজনীন রূপটি প্রতিভাত হতো। আশ্চর্য এই ইনট্যুশন। এই ইনট্যুশনকেও, তাঁর তত্ত্বের মত, বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেয়েছেন -- এটি কি ? হোল্টন ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা সত্তরের দশকে ভাবেন, আইনস্টাইন একটি ভিন্ন ভাষায় চিন্তা করতেন,—সেই ভাষাটি গণিত যার অনুবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভব নয়। কারণ সেই ভাবনার ভ্রূণরূপটি শুধু প্রাথমিক ভাবে গণিতের ভাষায় ধরা পড়ে, তার প্রাণচেতনার স্পর্শ তখন পাওয়া যায় না। সে তখন থাকে বোধি-চেতনার অন্ধকার সাম্রাজ্যে। আলোকের জগতে তার প্রকাশের জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতির, প্রয়োজন সময়ের। গণিতের চিন্তায়-ভাষায় তিনি তত্ত্বটির রূপরেখাটি ভাবতেন ; যেমন শিল্পী তাঁর শিল্পকলাটির রূপ ভাবেন ধ্যানে, চিত্রকল্পের আঙ্গিকে।...গণিতের ভাষায় অনুবাদ কঠিন বলেই একটি মহান শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভূতির অনুরণিত ব্যঞ্জনায় মানুষ বাকরহিত হয়ে থাকে, প্রকাশ হারায় ; গণিতের ভাষায় গড়া সুন্দর তত্ত্বটির প্রকাশে পঙ্গুত্ব দেখা দেয়। তবুও ভাষায় প্রকাশ করা সেই পঙ্গু অনুবাদ ভেনাস ডিমেলোর মত সুন্দর। অপূর্ণ—তবু মনোহর, তবু সুন্দর !

আইনস্টাইনের স্পেসটাইমের চারমাত্রিক চিহ্নদের মিনকোওস্কি সিউডো মেট্রিক বা লাইন অথবা ডাইগোনাল মেট্রিকের ছকে জানিয়েছিলেন। চারটি মাত্রার চিহ্ন হলো + + + - অথবা - - - + ; এই প্লাস মাইনাস চিহ্ন হলো স্পেসটাইমের সাক্ষর।- এরাই জানায় স্পেসটাইমের চারটি মাত্রা। মিনকোওস্কি স্পেসটাইমের রূপটি জ্যামিতির আঙ্গিকে বর্ণনা দিলেন। এই জ্যামিতিক বা জিওমেট্রিক বর্ণনার সংক্ষেপিত গাণিতিক এলাজাব্রিয় শব্দরূপটি হলো মেট্রিক। আইনস্টাইনের স্পেসটাইম মেট্রিক ; তার সাধারণতত্ত্ব একটি মেট্রিক তত্ত্ব। এই চারমাত্রার মেট্রিক চিন্তাটিকে বাস্তব জগতের মডেলের তুলনায় যখন ভাবা যায়, তখন অসঙ্গতি ধরা পড়ে। বাস্তবে আমরা ভাবি দুইমাত্রার জগতের ছায়া ধরা পড়ে একমাত্রায়, তিনমাত্রার বস্তুর ছায়া ধরা পড়ে দুইমাত্রায়। তেমনি চারমাত্রার জগতে ধরা পড়ে তিনমাত্রার স্পেস, আমাদের জগৎ। এই চিন্তার রেশ টেনে ধরা হয় আইনস্টাইনের চারমাত্রার স্পেসটাইম একটি পাঁচমাত্রিক জগতের ছায়া। এধরনের চিন্তার সাপেক্ষে এডিংটন একদা একটি পাঁচমাত্রিক জগতের সম্ভাবনার

কথা ভাবেন, তাকে খুঁজেও চলেন। এবং খোঁজেন ওস্কার ক্লাইন—যিনি ভাবেন স্পেসের একাই আছে চারটি মাত্রা। অথচ আইনস্টাইনের চারমাত্রিক ছক চারটি ভেরিয়েবলের কথা জানাচ্ছে ;—এদের বর্ণনা তিনি এবং মিনকোওস্কি জ্যামিতিক ছকে দিলেন—কারণ এখানে জ্যামিতিক রীতিরই প্রয়োগ সর্ব অর্থে পরিপূর্ণ ও সার্থক। এই বিশেষ রীতি বা ভঙ্গিমা তত্ত্বটিকে প্রকাশ করতে প্রযুক্ত হয়েছে। আপক্ষিকতাবাদে জ্যামিতির নিযুক্তি প্রকাশের বন্দীশটির সার্থক রূপারোপ আনে। এই ভঙ্গিমাটির বিস্তৃতি ঘটাতে চাইলে অসঙ্গতি দেখা দেয়। এডিংটনের পাঁচমাত্রার জগৎ পাওয়া যায় না এবং স্পিন ও বিপরীত কণার জন্য চারমাত্রিক স্পেসে ক্লাইনের দ্বারস্থ হওয়াটি অহেতুক হয়ে দাঁড়ায়। পল ডিরাক আইনস্টাইনের দেশকালের তত্ত্বের সাহায্যেই তার প্রমাণ দিতে পারেন।

লেইডনের ভাষণে আরো একটু বিস্তারিত ভাবে স্পেসটাইমের চিন্তাটি প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন। ইথারের বুনোটে শুধু যে স্পেসটাইমের কার্ভেচার বা বক্রতা আছে, তা নয়। বুনোটে আছে অনেক সূক্ষ্ম নকশা, টেকসচার বা বয়ন বিন্যাস। এই শিল্প কর্মের ব্যাখ্যা-বর্ণনা ও প্রযুক্তির ইতিবৃত্ত জানানো যায় একমাত্র ডিফারেনশাল জ্যামিতি ও ডিফারেনশাল টপোলজির সাহায্যে। নানা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনে ইঙ্গিত গুলি নকশাটির সামগ্রিক রূপের বিকাশটি স্পষ্ট করে তোলে। লেইডনে তিনি বললেন, "ভবিষ্যতের ফিজিক্সে ইথারের এই নবরূপটি কোন অভিনেয় চরিত্রের ভূমিকা নিবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। আমরা জানি, দেশকালের অনবচ্ছেদ সম্পর্কের জ্যামিতিক রীতিটি ইথারের এই নতুনরূপ বোঝাতে পারে ; তবু জানিনা, মৌলিককণার গঠনের চিন্তা ভাবনায় এটি কি অংশ নিতে পারবে।...যদি মহাকর্ষ ক্ষেত্র আর চুম্বক ক্ষেত্রকে এক করে একটি সমন্বয়ী রূপ দিতে পারা যায়, তবে সেইতো জানাবে সামগ্রিক অগ্রগতি।"

১৯২০ সাল থেকে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা। তাঁর সাধারণ তত্ত্বের বিস্তৃতিতে এই ক্ষেত্রতত্ত্ব ধরা দিবে—এই তাঁর স্বপ্ন। অন্যদিকে মাকের চিন্তাটিকে আপেক্ষিকতাবাদে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চাইলেন। দেখা যায় সাধারণতত্ত্বে মাক সর্বাংশে ঠাঁই পান না। মাকের চিন্তাকেও আপেক্ষিকতার সাধারণ সূত্রে প্রকাশ করার কল্পনাও তাঁর। তবে তাঁর প্রকাশিত সাধারণ তত্ত্বে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নেই, মাকও নেই। এটিই তার পরিসীমা—যেটি প্রথমে জানা গেল।

মাকের দি সায়েন্স অফ মেকানিক্স বইটিতে নিউটনের গতিবিদ্যার যে সমালোচনা ছিল, সাধারণতত্ত্বের পটভূমিকায় সেই চিন্তাক্রমটির দায়দায়িত্ব অনেকখানি। নিউটনের গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে ইনারশিয়াল মাস ও একসিলারেশনের গুনফলে পাওয়া যায় ফোর্স $F = ma$ ॥ এইখানে নির্দিষ্ট রেফারেন্স ফ্রেমের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে—যেখানে থাকে নিউটনের একটি সিদ্ধান্ত :—দূরের জগৎ নক্ষত্রলোক অথবা গেলাক্সি গড়পড়তায় স্থির ; সেখানে গতি

নেই অথবা গতিবোধ নেই। ব্যবহারিক দিয়ে এই চিন্তাটি শুধু যে সুন্দর তা নয়, এটি কাজের। এই সিদ্ধান্তটি মেনে নিলে এঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগের কো-অর্ডিনেটের জিরোবিন্দুটি নির্দেশিত করা যায়। কিন্তু যদি ভাবা যায়, দূরের গেলাক্সিদল ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘুরছে, তাদের আবর্তন একধরনের নয়, তবে সেই বিভিন্ন ঘূর্ণিবেগের জটলায় রেফারেন্স ফ্রেমটিকে সুস্থির করে গড়া যায় না, বোঝাও যায় না। এবং নিউটন স্কুল যাকে লোকাল ডাইনামিক্স বা স্থানিক গতিবিজ্ঞান বলে জানিয়েছিলেন সেটিও সোজাসুজি আর বোঝা যায় না—গোলমাল-জটিলতা দেখা দেয়!—এই যে গোলমাল—এটি আইনস্টাইনের জানা। তাঁর তত্ত্বে তার নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা তাই দেখা দেয়। একটি মাত্র অস্তিত্বের আবির্ভাব জানিয়ে তিনি স্পেসটাইম আর ডাইনামিকসের পরিমাপটি নির্দেশিত করতে পারলেন;—পারলেন একটি বিশিষ্ট রেফারেন্স ফ্রেমের সাহায্যে অথবা সাপেক্ষে। আইনস্টাইন মেট্রিক ফিল্ডের আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। এই মেট্রিক আবার ইউনিভার্সে—মহাবিশ্বে—মেটারের ডিস্ট্রিবিউশন বা পরিবেশনের উপর নির্ভর করছে। তাঁর তত্ত্বের ফলশ্রুতিতে পাওয়া গেল একটি অনুপম তুলনার ভাষ্যরূপ :—মেটার পরিপূর্ণ একটি শেল ঘুরলে তার অভ্যন্তরে যেমন একটি গতিময় পরিবর্তনের ধারা ধরা পড়ে, রেফারেন্স ফ্রেমের আবর্তনে সেই একই গতিময় পরিবর্তনশীল রূপের ছন্দ। মাকের ধ্যানের এই এফেক্টটি আইনস্টাইনের তত্ত্বে পাওয়া গেল—যাকে বিজ্ঞানীরা বললেন Lens Thirring effect ॥ অন্যদিকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাব যেন মাকের তত্ত্বটিকে হালকা ভাবে বিচার করে। এইখানে মাকের সমস্যাটির খুব একটা মানমর্যাদা নেই। বিশেষ তত্ত্বে জানানো হলো, কোনো বস্তু আলোর চেয়ে বেশি গতি পেতে পারেনা,—আলোর গতি সর্বোচ্চ এবং অনতিক্রম্য। এই c নামক বীজ অক্ষরটি স্পেসটাইমের যোগসূত্র। এই গতির সাপেক্ষে জানানো হলো, মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ যদি হয় R তবে সর্বোচ্চ ঘূর্ণ্যগতি হবে $\frac{c}{R}$ যেটি বেশ ছোট। একই ভাবে সর্বোচ্চ একসিলারেশন বা ত্বরণ পাওয়া যাবে $\frac{c}{T}$ যেখানে T হলো ইউনিভার্সের বয়স। দূরের মহাবিশ্বের বস্তুরা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্র মানে—একথা বলার অর্থ একটি ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমের সম্ভাবনার কথা ভাবা। সাধারণতত্ত্বে এই সম্ভাবনাটি এত সহজে এত সরলভঙ্গীতে আসেনা। এই তত্ত্বের জগতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে আলো তার সিধে পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যায়; স্থানিক দর্শকের চোখে দূরের কোনো স্থির বস্তুকেও মনে হয় যেন ঘোরে। আপেক্ষিকতার অধিগ্রহণে একটি a priori চিন্তার বিলুপ্তি ঘটে :—ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম (যেখানে কোনো সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স নেই) এবং দূর গেলাক্সির স্থিরত্ব বোধ—এদুটি যে যুক্তি বিচারে এক—এই সিদ্ধান্ত অমূলক। নতুন

তত্ত্বের কথামালায় স্থির গেলাক্সির বোধ নেই।—মহাবিশ্বের গতিময় রূপের সাপেক্ষে আইনস্টাইন তাঁর রেফারেন্স ফ্রেমটি জানালেন ;—এই ফ্রেমের গতিময় রূপ ; এটি স্থির নয়। এই অনন্য অথচ সরল সমাধানের ফ্রেমটিকে মেনে নিলেও মাকের সমস্যা সেই ফ্রেমের আড়ালে উঁকি মারে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্তে আছে একটি গাণিতিক ধারণা—প্রপার টাইম অথবা সঠিক সময়ের সংজ্ঞা। তাঁর জগতে দুটি ইভেন্ট, বিভিন্ন দূরত্বের জন্য দর্শকের কাছে এক সঙ্গে দেখা দিলেও সেখানে সময়ের পার্থক্য থাকে। কাজেই ইভেন্টের দূরত্বকে স্থির করতে গেলে প্রপার টাইমের চিন্তাকে এড়ানো যায়না। এই টাইমের সাপেক্ষে ফিজিকেল ধ্যানধারণা—যেমন অবাধ পতিত বস্তুর মহাজাগতিক পথরেখা, রীমানীয় কার্ভেচারের ক্রিয়ায় মহাকর্ষ ক্ষেত্রে মেটারের সৃষ্টি, স্পেসের ইন্টারভেলের বর্ণনা—যারা তাঁর তত্ত্বের বিশেষত্ব—এদের সকলেরই ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। এখানে থাকে সঠিক সময়ের চিন্তা। ঘড়ি নিয়ে সময়কে স্থির করার একটা অসঙ্গতি আছে—যার ইঙ্গিত দিলেন মাক তাঁর দি সায়েন্স অফ মেকানিক্স বইটিতে। তিনি বললেন, "সময় দিয়ে বস্তুর পরিবর্তনের হার মাপা অসম্ভব বলে মনে হয়। অন্যদিকে বস্তুর পরিবর্তনের ছক দিয়ে সময় নামের বিমূর্ত শব্দটির বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।...একটি গতির তুলনায় আরেকটি গতিকে ইউনিফর্ম বা সমান বলে বোঝানো যায়। কাজেই যে কেনো একটি গতিকে ইউনিফর্ম বা সমান বলার অর্থ নেই ;—এটি একটি অবান্তর সংজ্ঞা। একই যুক্তি টেনে একই পদ্ধতির সাপেক্ষে আমরা পরিবর্তনহীন সময় অথবা পরম সময়ের কথা বলতে পারি। এবসল্যুট টাইম বা পরম সময়ের ধারণা একমাত্র গতিহীনতার সাপেক্ষে গড়ে উঠতে পারে। এই ধারণাটি অবান্তর শুধু নয়, এটি অবৈজ্ঞানিক। এটি এককথায় অলস স্বপ্ন কল্পনা।"

সময়ের এই চক্রান্তটি কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে কাজ করে চলে। অবাধ পতনের গেডাঙ্কেন পরীক্ষায় তিনি ঘড়ির কথা জানালেন, জানালেন অন্যান্য গতিসূত্রের ব্যাখ্যায় অথবা ব্যঞ্জনায়। তাঁর মেকানিকেল ঘড়িকে অনেক নির্দোষ করা হয়েছে। সময় মাপতে ব্যবহার হয়েছে এটমিক ক্লক, হাইপারফাইন তত্ত্বের। তবু এই যে শুদ্ধকাল নির্দেশক ঘড়ি—একটি ছোট রাজ্যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর বিদ্যুৎ চুম্বক তত্ত্বের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। এই এটমিক ক্লক যখন মহাকর্ষ ক্ষেত্রের পরিমাপে আসবে, তখন ধরে নিতে হবে স্পেসের ঐ ছোট্ট অঞ্চলের গতিবিজ্ঞানের উপর মহাকর্ষের কোনো প্রভাব নেই। এই যে এসামসন বা ধারণা এটি আইনস্টাইনের সাদৃশ্য তত্ত্বে বলা হয়েছে। একে বলা হয় প্রবল সাদৃশ্যের নিয়ম অথবা Strong Equivalence principle বা সংক্ষেপে SEP॥ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই SEP টি যথেষ্ট শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এই SEP'র সাপেক্ষে প্রপার টাইমের সংজ্ঞা দেয়া যায়। তবু একটি সংশয় হালে দেখা দিয়েছে। যাকে শুদ্ধ ভাবা হচ্ছে—মহাকর্ষের বিশালতায় তার শুদ্ধরূপ

যে বজায় থাকবে এ কথা হলফ করে এখন বলা যাচ্ছে না। ভান ফ্লানডের্ন চাঁদের গতিপথ বিশ্লেষণ করে 1976 সালে জানালেন যে মহাবিশ্বের বয়সের অনুপাতে, এটমিক টাইমের সাপেক্ষে মহাকর্ষে ধ্রুবকের মান (G) কমে আসে। এই তথ্য যদি সত্য হয় তবে প্রপার টাইমের ধারণাতে সংশয় দেখা দেয়। এই সংশয়ের সমাধানে আবার মাকের উপপত্তির কথা ভাবা। মাক জানিয়েছিলেন, সব ঘড়িকে এক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে আর তাদের আপেক্ষিক চলনের হারের সাপেক্ষে নিয়মটি জানতে হবে।—এই নতুন সময়ের আবির্ভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্বের মৌলিক কাঠামোর রদবদল ঘটতে পারে।

সাধারণতত্ত্বের প্রমাণকটি নগণ্য। তিনটি ক্লাসিকেল পরীক্ষার কথা আইনস্টাইন জানিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য আরেকটি পরীক্ষার কথা ভাবা হয়। 1964 সালে শাপিরো (Shapiro) বিলম্বকাল অথবা টাইম ডিলের পরীক্ষার কথা জানালেন। মহাকর্ষের ফলে আলোর ফোটনকণা পথবিচ্যুত হয়—এটি সাধারণতত্ত্বের একটি অনুশাসন। এই বিকৃত পথে যাতায়াতের কালে সময়েরও বিচ্যুতি ঘটে। পথ বিচ্যুতি আর সময় হ্রাস—দুটিই ঘটে মহাকর্ষের প্রভাবে। শাপিরো যেন বিশেষতত্ত্বের সময় হ্রাসের বিষয়টি সাধারণতত্ত্বেও আনলেন। এ দুটি পরীক্ষা সূর্যকে ছেড়ে অন্য নক্ষত্রের সাপেক্ষেও করা হয়। তাছাড়া আলোর লালসরণ আর মার্কারির অনুসূর গতির পার্থক্য মাপাটির পরীক্ষাও চলে। টেকনোলজির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় এইসব পরীক্ষায় কী কী সমস্যা থাকতে পারে। সমস্যার যেমন শেষ নেই, সমস্যার মোকাবেলায় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় তেমনি নেই কোনো ঘাটতি। প্রথম করা পরীক্ষার মান থেকে অনেক শুদ্ধমানে পৌঁছুনো গেছে। কাছের জগৎ থেকে দূরের জগতে পরীক্ষাপত্র নিয়ে হাজিরা চলেছে, কারণ মহাকর্ষ শক্তি আর মহাকর্ষ ক্ষেত্র সুদূরেও বিস্তৃত। যত বিশাল পটভূমিতে এই শক্তি আর ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ বোঝা যাবে, তত স্পষ্ট হবে এরা। কোয়াসার, পালসার ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুর আবিষ্কারের পর প্রবল মহাকর্ষক্ষেত্রে ঐ চারটি পরীক্ষা-প্রশ্ন কি উত্তর জানাবে তাই নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা।

গতির ফ্রেম, প্রপার টাইম আর প্রশ্ন চতুষ্টয় নিয়ে চিন্তার ফলে আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্বের পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত নানা তত্ত্ব গড়ে ওঠে। 1960-70 সাল জুড়ে নানা বিকল্প তত্ত্বের ঘোষণা হতে থাকে। সেই তত্ত্বের জনারণ্যে মূল সাধারণ তত্ত্ব—যা আইনস্টাইনের সৃষ্টি—সেটি যেন কিছুকালের জন্য হারিয়ে থাকে। একই ব্যাপার ঘটেছিল 1920-30 সালে। যেদিন আইনস্টাইনের জানানো মহাজগতের মডেলটি দেখে গণিতের ছকে ইউনিভার্সের নানা মডেল বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন। ব্যাপার দেখে জে. জে. টমসন ক্ষুব্ধ হয়ে যেমন বলেছিলেন, 'অংক জানা থাকলে যে কেউই যেন মহাজগতের একটা মডেল জানাতে পারে'—তেমনি গণিতের ছকে, ভাষায় অথবা বর্ণনায় নানা

বিজ্ঞানী নানা মহাকর্ষতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানের দুয়ারে হাজির হন। এতসব আইডিয়ার ভিড়ে সঠিক তত্ত্বটিকে চিনে নিতে, থিয়োরিদের থিয়োরি অথবা রাজার রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ডিক ও কেনেথ নরড্ভেড্ট্ (Dicke & Nordtvedt Jr) সূক্ষ্মতম পরীক্ষার পথে তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করতে টেকনোলজির অগ্রগতির দ্বারে হাত বাড়ালেন, সাহায্য চাইলেন।

পরীক্ষায় অনেক থিয়োরি পার হয়না—আবার তাদের জায়গায় অন্য থিয়োরির আবির্ভাব হয়। তারাও পরীক্ষিত হয়—পাসফেল ছাঁটাই ঠিক হয়। দেখা যায় এত পরীক্ষার মধ্য থেকে একটি মাত্র থিয়োরি সব পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আরো কঠিনতর পরীক্ষার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—এটি আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্ব। প্রতিদ্বন্দ্বী বিকল্প তত্ত্বদের সামনে এখনো পূর্ণমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এই তত্ত্ব।

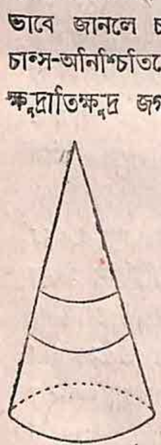
নানা তত্ত্বের ভিড়ে, নতুন করে মহাকর্ষ তত্ত্বটির মৌলিক সংজ্ঞাটি বোঝার চেষ্টা হয়। 1964 সালে 'Les Houches' লেকচার দিবার কালে ডিক দুটি মৌলিক অনুশাসনের কথা বললেন। এরা হলো, (i) স্পেসটাইম চার মাত্রায় মেনিফোল্ডে গড়া যার প্রতিটি বিন্দু নির্দেশ করবে ইভেন্ট বা ঘটনাকে। এই মেনিফোল্ডটিতে মেট্রিক বা এ জাতীয় সম্বন্ধ থাকতে হবে তার কোনো a priori বা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। এবং (ii) মহাকর্ষ গণিতের ছক জানাবে কো-ভেরিয়েন্ট রীতি।

ডিকের অনুশাসনে আইনস্টাইনের চিন্তার ছাপ ;—স্পেসটাইম চারমাত্রিক আর মহাকর্ষ সমীকরণ আর তার গাণিতিক ছকের প্রকাশে কো ভেরিয়েন্ট রীতি বজায় থাকবে। শুধু ডিক বললেন আইনস্টাইনের নিযুক্ত মেট্রিক পদ্ধতি আবশ্যিক নয়। এই ঘোষণার পিছনে কোয়ান্টা তত্ত্ব,—কোয়ান্টা নিয়ে চিন্তাভাবনা থাকে !

1870 সালে ক্লিফোর্ডের ধারণা আর 1916 সালে প্রকাশিত সাধারণ তত্ত্বের বিজ্ঞান দর্শন একটি কথা জানাচ্ছে—স্পেস জিওমেট্রি হলো কণা পার্টিকল অথবা অন্য কোনো মেটারের সৃষ্টির উপকরণ। এই চিন্তার রেশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা জ্যামিতির পথে এগিয়ে যান। বিরাট বিশাল স্পেসে সাধারণতত্ত্ব তার জ্যামিতিক রীতি নিয়ে আসতে পারে ; আর অন্যদিকে ক্ষুদ্রজগতে কোয়ান্টা গণিতের প্রতাপ। সেখানে জ্যামিতিক রীতি দিশেহারা। মহাবিশ্বের চারটি শক্তি ক্ষেত্রের তিনটিতে—নিউক্লিয়ার, দুর্বল ও তড়িৎচুম্বক শক্তি ক্ষেত্রে—কোয়ান্টা গণিত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ; অথচ মহাকর্ষ তার জানার বাইরে। এটি একটি বাধা। এই বাধাটি দুঃসহ বলে সত্তরের দশকের বিজ্ঞানীদের কাছে মনে হয়। পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের পাওয়া তথ্য আর মেট্রিক রীতিতে জানানো তত্ত্বের মানে এখনো সামান্য তফাত খুঁজে পাওয়া যায়। এই তফাত আছে বলে বিজ্ঞানীদের একদল মেট্রিক রীতিতে সংশয় তোলেন। আন্দ্রেই শাখারভ বললেন,

"সৃষ্টির প্রথম দিনে জিওমেট্রির আবির্ভাব আর দ্বিতীয় দিনে তাকে কোয়ান্টায়িত করা হলো—এ বক্তব্যে সন্দেহ আছে। বরং বলা যায় কোয়ান্টার আবির্ভাবই প্রথম। কোয়ান্টা তত্ত্ব থেকে হলো জ্যামিতি ও অন্যান্য কণার আবির্ভাব। এরা এলো দ্বিতীয় দিনে।"—শাখারভের বক্তব্যে যেন বিশ্বজগতের প্রথম সৃষ্টির ইতিবৃত্তের ছোঁয়া। খুব ছোট থেকে ধীরে ধীরে মহাবিশ্বের বেড়ে যাওয়া। প্রাথমিক ক্ষুদ্রতার জগতে জ্যামিতি খাটেনা—সেখানে কোয়ান্টা গণিতের ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো সৃষ্টির আদিতে থাকবে কোয়ান্টা, পরে হয়তো ধরা দিবে জ্যামিতি। এবং আইনস্টাইন। আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্বের সর্বজণীনতাকে শাখারভ মানতে পারছেন না—তার কারণ সিঙ্গুলারিটি!

সাধারণতত্ত্ব একটি বিরল তত্ত্ব—এখানে যে ক্ষেত্রের সাম্রাজ্য—সেটি মহাকর্ষ। তবু 1920-30 সালে অন্য শক্তিক্ষেত্রের হাজিরা দেখা দেয়—সেখানে নিযুক্ত হয় কোয়ান্টা গণিত। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃত আইনস্টাইন। অথচ শেষ পর্যায়ে এই তত্ত্বের চান্স ও অনিশ্চিতিকে তিনি মেনে নিতে পারলেন না। 'ঈশ্বর পাশা খেলছেন না'—এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি কোয়ান্টাতত্ত্বের পঙ্গুত্বের ধারণা প্রকাশ করলেন। চান্স ও অনিশ্চিতিকে মেনে নিলে সঠিক সত্যের কাছে আসা যায় না। তাঁর ধারণা কোনো লুকনো নিয়মের বহির্প্রকাশে এই দুটি সংশয়ী রীতি কোয়ান্টাতত্ত্বে ধরা পড়ে ; সব নিয়ম সঠিক ভাবে জানলে চান্স-অনিশ্চিতির "মেনে নেয়া" জগৎটি "বুঝে ওঠা" যাবে। চান্স-অনিশ্চিতিকে মেনে নিতে আইনস্টাইনের এলার্জি। অথচ মেট্রিক তত্ত্ব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে প্রযুক্ত হচ্ছে না—সেখানে ঐ চান্স অনিশ্চিতির ভুজবন্ধনে বাঁধা কোয়ান্টা গণিতের আবির্ভাব। তিনি মহাকর্ষ জগতে সিঙ্গুলারিটির আবির্ভাবটিও মানতে পারেন নি। তবু তাঁর তত্ত্বভিত্তিক সিঙ্গুলারিটির উপস্থিতিকে এড়ানো যায়না। অন্যদিকে কোয়ান্টা গণিতের ধারণায় অন্য তিনটি শক্তিকে বাঁধার সম্ভাবনা থাকে ;—মহান একীকরণ বা Grand unification একটি প্রায়বাস্তব সম্ভাবনা। সেখানে মহাকর্ষ কেন দূরে থাকবে এই আরেক চিন্তা বিজ্ঞানের। সাধারণতত্ত্বে কোয়ান্টা আইডিয়ার প্রয়োগ কি সম্ভব? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন আইনস্টাইনের চিন্তাটি ক্লাসিকেল—নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে গড়া। এই জগতে কোয়ান্টার মাপ অধরা। এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম একমাত্র বিন্দুমাত্রিক সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে ঘটতে পারে। এই সিঙ্গুলারিটির কাছে মহাকর্ষের টান প্রবল ; প্রবল টানে সঙ্কুচিত স্পেসটাইমে মেটারের সৃষ্টি হতে পারে। 1969 সালে জালডোভিচ জানালেন আদিম জগৎ তার প্রাথমিক সৃষ্টির সময় ছিল



সিঙ্গুলারিটি

নন-আইসোট্রোপিক, নন-হোমোজিনাস সম্ভাবনা নিয়ে! বক্রীদেশ থেকে মেটারের সৃষ্টির ফলে হোমোজিনাস আইসোট্রোপিক মহাবিশ্বের আবির্ভাব—মহাজগৎ মেটারকে নিয়ে সর্বত্র সবদিকে বুনোটে এক হয়ে নিশ্চিত রূপে দেখা দেয়। অর্থাৎ জ্যামিতিক ক্ষেত্রে, মেট্রিক ফিল্ডের সংকোচনে মেটারের সৃষ্টি—এই ক্লিফোর্ড-আইনস্টাইনীয় তত্ত্বটি প্রবল মহাকর্ষটানে কোয়ান্টা রীতিতে জালডোভিচ পেলেন। কোয়ান্টা গ্রেভিটেশনের প্রাথমিকতায় সিঙ্গুলারিটি থেকে কিছু দূরে বক্রী স্পেসটাইমে মেট্রিক ফিল্ডকে মানা হচ্ছে—জ্যামিতি এখানে পরিত্যাজ্য নয়। তবু সিঙ্গুলারিটির কাছে মহাকর্ষতত্ত্ব, সাধারণতত্ত্ব দিশেহারা; তার জ্যামিতি, ভাষা, বর্ণনা, ভঙ্গিমা সেই জগতে, সেই অবস্থানে খাটে না। সেখানে কোয়ান্টা রীতির প্রয়োগ হতে পারে। সৃষ্টির প্রাথমিকতায় সিঙ্গুলারিটিতে জ্যামিতি নেই—এই সংবাদ সাধারণতত্ত্বে সীমারেখা টেনে দেয়।

সাধারণতত্ত্বের স্পেসটাইম চারমাত্রিক। একে জানানো হয় মেট্রিক $g_{\mu\nu}$ রাশিটির সাপেক্ষে। মিনকোওস্কি স্পেসটাইম বোঝাতে এই $g_{\mu\nu}$ কে লাইন মেট্রিক্সের চিহ্নে সাজিয়েছিলেন। স্থানিকরীতিতে, স্পেসটাইমের গঠনে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে এই চারমাত্রিক ছক থাকে; এরই সাপেক্ষে জানা যায় গতির সঙ্গে ভরের বৃদ্ধি, দৈর্ঘ্যের সংকোচন আর সময়ের হ্রাস। এগুলি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে পাওয়া গেল। এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাক্তির সম্ভাবনা যেন মনে রেখে আইনস্টাইন জানালেন বিশ্বরেখার মেট্রিক ইন্টারভেলের সাপেক্ষে সময়কে জানা যাবে; এই বিশ্বরেখাটি আলোর গতিপথে নেই।…তবু স্পেসের বিশাল ভূমিতে মিনকোওস্কির মেট্রিকের গোলমাল ঘটতে পারে—গোলমালের কারণ হলো স্পেসটাইমে মেটার ও এনার্জির উপর মহাকর্ষের প্রভাব। মেটারের পরিবেশনের বা ডিস্ট্রিবিউশনের সঙ্গে মেট্রিকের সম্পর্ক টেনে ফিল্ড ইকুয়েশনের সাপেক্ষে গোলমালটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়। গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়ম জানায় যে কোনো বস্তুর ভর আর মহাকর্ষের চার্জে মিল আছে। এরই সাপেক্ষে আইনস্টাইন জানলেন একটি বস্তুর এনার্জির সঙ্গে মহাকর্ষ জোট বাঁধতে পারে এবং এর পথ ধরে পেলেন ক্ষেত্র সমীকরণে এনার্জি মোমেন্টামের টেনসারের ছকেই শুধু মেটারের উপস্থিতি। স্পেসটাইমের মেট্রিক ছাড়া অন্য কোনো কাঠামো যদি না ভাবা যায় আর সমীকরণে সেকেণ্ড ডেরিভেটিভ ছাড়া অন্যকিছু না ধরা হয় তবে আইনস্টাইনের জানানো সমীকরণ ছাড়া আর অন্যকিছু ঐ চিন্তার সাপেক্ষে পাওয়া যাবে না। 1915 সালে তত্ত্বটির প্রকাশ বছরে হিলবার্ট-এই ঘোষণা করলেন। আইনস্টাইনের চিন্তার পথে মেট্রিক গণিতের ছাপটিই একমাত্র দেখা দেয়।

আইনস্টাইনের ক্ষেত্রগণিতের সমীকরণে জানানো হলো : $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = KT_{\mu\nu}$ এখানে $R_{\mu\nu}$ হলো রিক্কি টেনসার যেটি মেট্রিক $g_{\mu\nu}$ এর

রূপান্তর, R হলো রিক্কি স্কেলার, K জানায় $\frac{8\pi G}{c^4}$ যেখানে G হলো মহাকর্ষের ধ্রুবক। $T_{\mu\nu}$ জানায় এনার্জি-মোমেন্টাম টেনসার আর $\Lambda g_{\mu\nu}$ অংশটির Λ জানায় কসমোলজিকেল কনস্ট্যান্ট। এই অংশটি পরে পরিত্যক্ত হলো। এই সমীকরণের বিশেষত্ব হলো বাঁদিকের সব রাশি একটিমাত্র মেট্রিক রীতির উপর নির্ভর করছে যেটি $g_{\mu\nu}$ —যেটি মিনকোওস্কির নকশা। এই রাশিটির অপেক্ষা নিয়ে বাঁদিকের টার্মটি গড়ে উঠেছে আর ছোট জগতে $g_{\mu\nu}$ এর ভূমিকাটিই প্রধান —যেটি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষত্ব। এই $g_{\mu\nu}$ এর উপর স্পেস টাইমের চরিত্র নির্ভর করছে। সমীকরণের ডানদিকে থাকে মহাকর্ষের ধ্রুবক আর এনার্জি-মোমেন্টাম টেনসার—কারণ সাদৃশ্য নিয়ম জানায় মহাকর্ষ শুধু বস্তুর এনার্জির সহযোগী হয়; বস্তুর রূপান্তরে অথবা মাসের রূপান্তরে এনার্জি পাওয়া যায় বলে মহাকর্ষ দেখা দেয়। মহাকর্ষের দেখা পাওয়া মানে স্পেসটাইমে জ্যামিতিক আকারের সূচনা-যার ব্যাখ্যা আছে টেনসার। ছোট মহাকর্ষ জগতেও এই রূপ থাকবে, থাকবে অমহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে—কারণ এখানেও থাকে $g_{\mu\nu}$—চারমাত্রিক মিনকোওস্কির স্পেসটাইম। এই জগতে আইনস্টাইনের নিজস্ব সাদৃশ্য নিয়ম-যা জানায় অবাধ পতনের ক্ষুদ্রজগতে মহাকর্ষ আর ত্বরণের বোধ এক সেটি থাকবে। এই সাদৃশ্য নিয়মকে বলা হলো Einstein Equivalence Principle বা সংক্ষেপে EEP।

মেট্রিক ছাড়া ননমেট্রিক মহাকর্ষ তত্ত্ব গঠনের চেষ্টাও হয়ে থাকে—স্পেস টাইমকে ভাবা হয় ফ্ল্যাট বা সমতল। এই ভাবনার পিছনেও যুক্তি থাকে।

স্পেস যে একটি বস্তু—সেই চিন্তা প্রাচীন; তবে নিউটনের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা হবার পর স্পেসের বস্তুধর্ম ফিজিক্সে ঠাঁই পায়। তবে নিউটনের কালেই লাইবনিৎস এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন। তাঁর মতে বস্তু আর সময়ের সম্পর্ক ধরে একমাত্র পরীক্ষাভিত্তিক ব্যাখ্যা জানাতে পারে যে, পরম স্পেস যে পরম এ ধারণা গোলমেলে—এটি যেন ঈশ্বরের পরমত্বের প্রতিযোগী। তবে নিউটন পরম স্পেসকে রাখেন কারণ এর সাপেক্ষে গতিবিজ্ঞানের নিয়ম-রীতি-প্রকৃতি গঠন করা যায়। এই চিন্তার বিকল্পটি সেদিন জানা ছিল না। তবু এই দর্শনের সমালোচনা হয়েছে, সমালোচনা তুলেছেন আর্নস্টমাক, যাঁর মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে আপেক্ষিকতাবাদের আঙিনায় হাজির হতে গিয়ে আইনস্টাইন সে যুগের দুটি ধারণা, দুটি সিদ্ধান্ত নাকচ করলেন; পরম স্পেসের ভাবনা অর্থহীন আর মেটারের ইনারশিয়া বা জড়ত্ব মানে অন্য মেটারের সাপেক্ষে এটি গতিহীন, পরম স্পেসের সাপেক্ষে একে গড়ে তোলা হবে না। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ইনারশিয়াল ফ্রেমের সংজ্ঞায় লরেন্সের অপরিবর্তনীয়তার

ফিজিক্স থাকে। এ যেন গালিলিও'র ফ্রেমকে সরিয়ে লরেন্সের ফ্রেমকে ডেকে আনা। এখানে পরমস্পেস আর ইনারশিয়াল ফ্রেমের চিন্তা ভাবনা কি থাকে না? কারো কারো মতে এ জগতেও পরমস্পেসের ভাবনা চুপি সারে উঁকিঝুঁকি মারে।

সাধারণ তত্ত্বের গঠনে আইনস্টাইন চাইলেন অবশিষ্ট সব বস্তুর প্রক্রিয়াতে একটিমাত্র বস্তুর ইনারশিয়াল গুণরাজি প্রকাশ পাবে; আপেক্ষিকতার স্পেসের সান্নিধ্যে পরমস্পেস লোপ পাবে; কোনো রেফারেন্স ফ্রেম বিশেষ হবে না; এক দর্শকের দেখা অন্য দর্শকের দেখার থেকে ভিন্ন হতে পারবে না। একমাত্র তুলনামূলক বা আপেক্ষিক বিচারেই ফিজিক্সকে চেনা যাবে। —সাধারণ তত্ত্বে ইনারশিয়াল মহাকর্ষের ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হলো রীমানের জ্যামিতি নিয়ে গড়ে ওঠা বক্রী দেশকালে। আইনস্টাইন বক্রতলের জ্যামিতি আনলেন। দেখা গেল এই জ্যামিতিক বক্রীস্পেসের সাহায্যে ইনারশিয়াল ও মহাকর্ষ গুণের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। বক্রীদেশে মেটারের সৃষ্টি আর এর 'সরলরৈখিক' পথে বস্তুর আনাগোনা। এই তত্ত্বটি নিউটনের ঘরাণার। এটি কাজের। এখানেও তত্ত্বের ভবিষ্যদ্‌উক্তির প্রমাণ পরীক্ষাতে পাওয়া যায়। শুধু এই তত্ত্বের জাজিমের বুনটে থাকে কার্ভ-স্পেস; আর নিউটনের তত্ত্বে ছিল পরমস্পেস। এই বক্রী স্পেসে এই জগৎ আছে, আমরা আছি। এই বক্রতা কতখানি তার পরিমাপ কি সম্ভব? স্পেসের বক্রতা কিভাবে মাপা যাবে?

বক্রতার যে মাপই আমরা যন্ত্র দিয়ে করতে চাই। সেখানে যন্ত্র থাকে আর থাকে দেখা। আলো দিয়ে দেখা। পরীক্ষায় যে প্রমাণই পাওয়া যাক, যে তথ্যই মিলুক, সেটি আলোর ব্যবহারকে প্রতিষ্ঠা করবে, স্পেসের নয়। এ যেন একটি পরীক্ষা যেখানে কাজে অংশী নিচ্ছে স্পেসে রাখা অথবা থাকা কোনো একটি বস্তুর বস্তুটি স্পেস নয়; স্পেস কাজে অংশ নেয় কিনা বোঝা যায় না। বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি; জানতে পারিনা স্পেস নামের কার্যস্থলটির আচার ব্যবহার। রিলেটিভিটির দর্শনে আমরা যে কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গতি মাপতে পারি। স্পেস অথবা স্পেস টাইম যেন সেই আপেক্ষিক মাপগুলি মাপার জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়। এককথায়, কাজের সুবিধার জন্য স্পেসটাইম নামের দালালটিকে আনা হয়েছে; স্পেসটাইমের প্রয়োজন সমস্যাটির সঠিক বর্ণনায়, ব্যঞ্জনায়। যেমন নিউটনের পরমস্পেস।

আইনস্টাইন বলেছিলেন মহাকর্ষের ফলে আলোর পথ বাঁকে। পরে তিনি বললেন, আলো সোজাই যাবে, তবে মহাকর্ষের ফলে স্পেসের বক্রীভাবের জন্য সেই পথকে বাঁকা মনে হবে। অর্থাৎ একটি গণিতের সমাধানে তিনি দুটি ব্যাখ্যা দিলেন। এরই জের টেনে গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বলেন, আলোর পরীক্ষায় স্পেসের বক্রীভাব প্রমাণ হবে না—স্পেস যদি ইউক্লিডের জ্যামিতির মত ফ্ল্যাট থাকে তবে আলোর পথ বাঁকে। গণিতের যে রীতিতে স্পেসকে কার্ভেচার ধরে স্পেসটাইমের ব্যাখ্যা দেয়া যায়, গণিতের অন্য রীতিতে ফ্ল্যাট স্পেসের সাপেক্ষে সেই একই

সমাধান পাওয়া সম্ভব। অন্তত 1975 সালে রোক্সবার্গ (Roxburgh) ও টাভাকোল (Tavakol) এই দুজনে সুয়ার্ৎসচিল্ডের সমীকরণের একটি রূপান্তরী অনুবাদ ফ্ল্যাট স্পেসের সাপেক্ষে করলেন - যার ফলে সুয়ার্ৎসচিল্ডের প্রাগুক্তিগুলিও এখানে পাওয়া যায়। দেখা যায় বক্রীস্পেসে মেটারই কার্ভেচার সৃষ্টি করে, কার্ভেচার বোঝাতে আনা হয় ক্ষেত্র গণিত সমীকরণদের। ফ্ল্যাটস্পেসে মেটার তৈরি করে ফিল্ড আর এই ফিল্ড বোঝাতে লাগবে অন্য একদল ক্ষেত্র সমীকরণ।

কি জানা যায়? সাধারণতত্ত্ব গণিতের ভাষায় গড়ে তোলা এক নতুন ফিজিক্সের ধারা—যাকে তথ্যাভিত্তিক বা এমপেরিকেল ফিজিক্সের ছক দিয়ে বর্ণনা করা যায় না; ভাষা দিয়ে সঠিকভাবে বোঝানো যায় না। অঁরি পোআঁকার গাণিতিক ও এম্পোরিকেল ফিজিক্সের মিল-গরমিল নিয়ে এই শতকের প্রথম দশকে আলোচনা করলেন। Science and hypotheses নামের বইটিতে তিনি বললেন,"কোনো জ্যামিতি অন্যটির চেয়ে শুদ্ধতর নয়। বলা যায় একটি আরেকটির চেয়ে বেশি কাজের।" পোআঁকারের মতে গণিতের কাঠামো অথবা জ্যামিতির ফ্রেমওয়ার্ক - এরা ভাষার মত। জগতের যে কোনো পরীক্ষা বা তথ্যাভিত্তিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয় গণিতে—যার ব্যাখ্যা মুখের ভাষায় দেয়া সম্ভব নয়। পোআঁকার বললেন, "আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বকে জার্মান ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন বলে ফিজিক্সের জগৎ বেশি জার্মান হয়ে দাঁড়ায় না;—এটি বক্রী স্পেসটাইমে গড়া হয়েছে বলেই কার্ভড্ হবে না।" গণিতের ভাষা আর তথ্য অথবা তত্ত্বের বর্ণনায় মুখের ভাষার ব্যবহারে তফাত থাকে। পরীক্ষায় যা দেখা যায় তা' তার শেষ চিহ্নটি তার ফলাফল। যেমন সামান্য হাড় থেকে মানুষ ডাইনোসোরের মূর্তি ভাবেন. পথের শেষ চিহ্ন ধরে গণিতের ভাষার সাহায্যে মানুষ পথের ধারাটি বুঝতে চায়। এই বোঝা ও জানা—এটি দর্শকের চোখে দেখা, চেতনায় বোধিতে বোঝা। এ ধারণাও আপেক্ষিক। 1948 সালে তাঁর Kinematic Relativity বইটিতে মিলনে (Milne) দেখার জগতে এই সংশয়ের কথা তুললেন। মহাবিশ্বের নানা মডেলের বেসব রূপাকৃতি পাওয়া যায় তাদের বোঝা যায় কোন নকশায় কিভাবে মাপটি করা হচ্ছে—সেটি ধরে। গণিতের যে রীতিতে স্পেসকে কার্ভেচার ধরে স্পেসটাইমের ব্যাখ্যা দেয়া যায়, অন্য রীতিতে স্পেসকে ফ্ল্যাট ধরেও করা যায়। স্পেস ফ্ল্যাট বা বক্র—এর উত্তর যেন দর্শক নির্ভর! এখানে কোনো তথ্যাভিত্তিক প্রমাণ নেই। অতএব ফিজিকেল গবেষণায় এর স্থান নেই।—পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য নিয়ে সাধারণতত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। এটি সম্পূর্ণ আইডিয়া ভিত্তিক, গণিতের ছকে গড়া। এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া প্রাগুক্তিগুলিই পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়! এরাই তত্ত্বের প্রমাণ।

অতএব,গণিতের ছকে অনেক মহাকর্ষ তত্ত্ব পাওয়া যায়। এক সময়ে বিজ্ঞানীরা ঠাট্টা করে বললেন, মহাকর্ষ তত্ত্বের চিড়িয়াখানা। এদের অনেকের খাঁচা খালি;

অনেক তত্ত্ব হারিয়ে গেছে, ভুল প্রমাণিত হয়েছে ; আবার নতুন খাঁচায় নতুন তত্ত্ব হাজিরও হয়। সব তত্ত্বের ভিত্তিতে কিন্তু একটি প্রাথমিক চিন্তা থাকে। যে কোনো মহাকর্ষ তত্ত্বে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান থাকবে—কারণ এটি প্রমাণিত পরীক্ষিত সত্য এবং থাকবে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ—এটিও প্রমাণিত তত্ত্ব—যার প্রমাণ কণা জগতের বিটারের ভরের মাপে, জিমান এফেক্টে, স্পিনের আবির্ভাবে। এই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের $g_{\mu\nu}$ এর ছকে মেটার আর অমহাকর্ষ ক্ষেত্র বাঁধা। মহাকর্ষ তত্ত্বে এটি ভিন্ন অন্য কোনো ফিল্ড থাকলেও এই ফিল্ডের ভূমিকা হলো মেট্রিকের সহযোগী হয়ে স্পেসটাইমের সৃষ্টিতে সাহায্য করা—এইমাত্র। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেট্রিক থিয়োরিদের নিয়ে বিচার করলে যে প্রভেদ পাওয়া যাবে তা শুধু পদ্ধতির—কোন পথে মেটার সৃষ্টি করবে মেট্রিক। হরেদরে $g_{\mu\nu}$ একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, একটি মৌলিক অস্তিত্ব।

নানা মহাকর্ষতত্ত্বদের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে দেখা যায় এদের মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একভাগে থাকে গতিমান মহাকর্ষ ক্ষেত্র আর দ্বিতীয় ভাগে পরমক্ষেত্র—গতিহীন ক্ষেত্র। প্রথম ভাগটির নাম দেয়া হলো গতিবিজ্ঞান ভিত্তিকতত্ত্ব আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় জ্যামিতি-পূর্ব থিয়োরি। প্রথম বিভাগের থিয়োরির দল আইনস্টাইনের ঘরানার। এদের মধ্যে আছে (a) প্রথমেই আইনস্টাইনের নিজস্ব তত্ত্ব। এখানে একমাত্র g গতিময় ফিল্ডের ধারণাটি জাগিয়ে তোলে ;—অন্যকোনো আর্বিটারি ফাংশন বা পরিসীমা নেই। অবশ্য Λ অংশটি বাদ দেয়া হবে। (b) স্কেলার টেনসার তত্ত্ব—এখানেও থাকে মেট্রিক g, একটি স্কেলের ফিল্ড ϕ এবং একটি আর্বিটারি কাপালিং ফাংশন ω। এই গ্রুপের নানা তত্ত্বের মধ্যে ব্রানস-ডিক-এর (Brans-Dicke) থিয়োরিটি একসময়ে এবং এখনো বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই তত্ত্বের কাপলিং ফাংশন ω যখন ∞ হয় তখন আইনস্টাইনের জানানো মান থেকে কোনো তফাত পাওয়া যায় না। এছাড়া এই বিভাগে আছে আরো দুটি প্রসিদ্ধ থিয়োরি—BWN (Bergmann-Wagoner-Nordtvedt) এবং বেকেনস্টাইন (Bekenstein)। দুটি থিয়োরিতে কিন্তু Λ নামের কনস্ট্যান্টটি উপস্থিত থাকে।

(c) ভেক্টর—টেনসর তত্ত্ব—এখানেও থাকে g ফিল্ড এবং তার সহযোগী ভেক্টর ফিল্ড k ॥

দ্বিতীয় বিভাগে আইনস্টাইনের তত্ত্বের স্পেস ও টাইমের গোলমালটি মেটাবার চেষ্টা হয়। এই বিভাগের তত্ত্বে হাজির হয় ফ্ল্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড মেট্রিক অথবা কসমিক টাইম ফিল্ড। এই বিভাগে আছে—

(a) বাইমেট্রিক তত্ত্ব—যেখানে ডাইনামিকেল টেমসর স্কেলার অথবা ভেক্টর ফিল্ডের সঙ্গে থাকে একটি ননডাইনামিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড মেট্রিক।

(b) স্ট্রেটিফায়েড বা স্তরবিন্যাসী তত্ত্ব—এটি মহাজগতের একটি বিশেষ স্পেসের স্লাইসকে (যাকে স্তর বা স্ট্রেটা বলা হচ্ছে) আলাদা করে ভাবার একটি পদ্ধতি—যার মেকানিজমে থাকে কসমিক টাইম t ॥

প্রতিটি বিভাগে অনেক তত্ত্বের হাজিরা। এদের বিচার বিবেচনার জন্য একটি সর্বজনীন মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা দরকার। সেই স্ট্যাণ্ডার্ডটি দিলেন ডিক।—ডিক ছয়টি বিচার্য বিষয়ের কথা তুললেন—যাদের দুটি তাত্ত্বিক আর বাকি চারটি পরীক্ষাভিত্তিক। এরা হলো :—(i) তত্ত্বটি এমন হবে যে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারবে। তাছাড়া মহাকর্ষ ক্ষেত্রে উপস্থিত যে কোনো বস্তুর উপর ইলেকট্রিকেল বা কোয়ান্টাম মেকানিকেল নিয়ম গুলি কি প্রভাব আনবে তাও এই তত্ত্ব থেকে জানা যাবে। তবে কোয়ান্টাম গ্রেভিটি, নিউক্লিয়ার ও দুর্বলফোর্স, সিঙ্গুলারিটি ইত্যাদি এই তত্ত্বের বিচার্য বিষয় হবে না। এককথায় ডিক মহাকর্ষ তত্ত্বের যে পরিসীমাটি জানালেন—সেটি হচ্ছে সেই সীমা যে অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন গতি কাজ করতে পারে। তাছাড়া বিদ্যুৎ চুম্বক ও কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের প্রভাবের কথাও মনে রাখা হলো। যে কোনো মহাকর্ষ তত্ত্বে এই পরিসীমাটি বজায় থাকবে।

(ii) তত্ত্বটির বিশেষত্ব এমন হবে যে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য বা ফলাফল আর তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বক্তির মিল অনন্যতার দাবী করতে পারে। দুটো পদ্ধতি থেকে আলাদা ভাবে পাওয়া একটি ভবিষ্যদ্বক্তির একটি মাত্র তথ্যভিত্তিক উত্তর পাওয়া যাবে।

(iii) তত্ত্বটি হবে আপেক্ষিক। অর্থাৎ অমহাকর্ষীয় সীমায় বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে পাওয়া যাবে।

(iv) নিউটনের জগৎ তার আইনকানুন পরিসীমা ইত্যাদি দুর্বলমহাকর্ষ অঞ্চলে, দুর্বলগতি বিভাগে দেখা দিবে।

(v) দুর্বলসাদৃশ্য নিয়ম বা Weak equivalence principle (সংক্ষেপে WEP) এই তত্ত্বের ভিত্তিতে থাকবে। আইনস্টাইনের অবাধ পতনের চিন্তায় গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়মটি ছিল। এই WEP হলো সেই সাদৃশ্য নিয়ম যেখানে জাড্যজনিত ভর আর মহাকর্ষ চার্জ একটি অন্যটির অন্য-রূপ। অন্যভাবে বলা যায় কোনো বস্তুর গতিপথ যা স্পেসটাইমে দেখা যায় তা বস্তুটির আকার উপকরণের উপর নির্ভর করেনা। এই নিয়মটিকে কখনো কখনো অবাধপতনের সর্বজনীনতা বা Universality of Free Fall বা UFF বলা হয়।

(vi) তত্ত্বটিতে লাল আলোর সরনটি প্রকাশ পাবে। 1974 সালে বিজ্ঞানী উইল (Will) এই নিয়মের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন : স্পেসটাইমের দুটি ইভেন্টে দুটি একধরণের ঘড়ি যদি রাখা যায় তবে ঘড়ি দুটোর মধ্যে মহাকর্ষের জন্য যে লাল সরণ দেখা দিবে তা ঘড়ি দুটির আকার উপকরণ ইত্যাদির উপর

নির্ভর করবে না। একে বলা হয় সর্বজনীন মহাকর্ষজনিত লাল সরণ বা Universality of Gravitational Redshift অথবা UGR.

ডিক যে বিচারের ফ্রেমটি দিলেন—তার প্রথম দুটি তত্ত্বের গঠন আর পরিসীমা জানালো। তৃতীয়-চতুর্থ বিষয় হলো সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূলভাবনা। আর শেষ দুটি জানায় যে WEP ও UGR এর ভবিষ্যদ্বাক্তি থাকবে—এ দুটি তত্ত্বের প্রমান।—এই বিচার পত্রটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা বিজ্ঞানীরা কাজে নামেন। উদ্দেশ্য কোন তত্ত্বটি সবকটি বিচার্য বিষয়কে সম্পূর্ণ করে, সঠিকভাবে জানাতে পারবে। যে তত্ত্ব পরীক্ষায় পাওয়া মান গুলিকে ত্রুটিহীনভাবে জানতে পারবে সে তত্ত্ব সঠিক ; তবে তত্ত্বটিকে অন্য চারটি বিচার্য বিষয়কেও পরিপূর্ণ করে জানাতে হবে। ডিকের ফ্রেমে যে স্ট্যাণ্ডার্ডটি জানানো হলো, সেটি কিন্তু আইনস্টাইনের নিজস্ব ধারার মূল স্রোতটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে না ;—সেই স্রোতের জলেই ডিকের অনুশাসনটি অভিষিক্ত। যে কোনো মহাকর্ষতত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে আইনস্টাইনের নিজস্ব চিন্তাধারণা থাকছে—এটি একটি বিস্ময়ের ঘোষণা।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব সিঙ্গুলারিটি বোঝাতে দিশাহারা। ডিকের বিচার্য বিষয়ে এটি থাকবে না। সাধারণ তত্ত্বের দপ্তরটিকে, আইনস্টাইনের ধারণা মোতাবেক, ডিক নির্দিষ্ট করলেন। আবার সাধারণ তত্ত্ব যে একটি সর্বজনীন রূপ পেতে পারে এই আইনস্টাইনীয় অসাধারণ চিন্তাটিও ডিকের অনুশাসনে নিহিত আছে। কোয়ান্টাতত্ত্ব ও মহাকর্ষতত্ত্বের একটা গাঁটছড়া বাঁধায় সম্ভাবনা এখানে উঁকি ঝুঁকি মারে। মহাকর্ষ যে শুধু জ্যামিতি ভিত্তিক হবে —এটির নিত্যতা ডিক আগেই নাকচ করলেন। ডিকের বিচার্য বিষয়েও এমন কোনো নির্দেশ নেই। তিনি, বর্তমানে, তত্ত্বটির যে পরিসীমা টানলেন, সেখানে আসন্নরূপ পাওয়া যাবে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আর নিউটনের জগৎ ; আরো জানালেন মহাকর্ষতত্ত্বে প্রমাণ হবে WEP ও UGR॥—এ দুটি পরীক্ষার কথা ভেবে বিজ্ঞানী শিফ (Schiff) একটি অনুমিত বা Conjecture এর প্রসঙ্গ তুললেন। WEP ও UGR এর মত আরো একটি সাদৃশ্য তত্ত্ব আপেক্ষিকতা বাদে আছে—যেটি আইনস্টাইনের নিজস্ব সাদৃশ্য নিয়ম অথবা EEP॥ এই নিয়মটির একটি বিস্তৃতি পাওয়া গেল শিফের হাতে। তাঁর অনুমিতিতে তিনি বললেন, (i) WEP ও UGR-এই দুটি সাদৃশ্য নীতি অখন্ডনীয়। এবং (ii) একটি স্থানিক অবাধ পতনের ফ্রেমে কোনো অমহাকর্ষীয় পরীক্ষা যদি করা হয় তবে যে ফলাফল পাওয়া যাবে সেটি সেই ফ্রেমের গতি অথবা মহাবিশ্বের কোথায় কখন করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে না। এটি হলো শিফের হাত থেকে পাওয়া EEP র নতুন সংজ্ঞা—যেটি আবার আইনস্টাইনের মেট্রিক ইঙ্গিতটি কেই জানাচ্ছে!—মহাকর্ষতত্ত্বে আইনস্টাইনকে এড়ানো যাচ্ছে না।

আইনস্টাইনের তত্ত্বে জানানো হয়েছে $g_{\mu\nu}$ এর উপর স্পেসটাইম নির্ভর করবে শিফের অনুমিতি জানায় যদি EEP পরীক্ষিত প্রমাণিত হয় তবে অবাধপতনের ফ্রেমে অমহাকর্ষ-জগতে পাওয়া যাবে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ। শিফের অনুমিতির আরো একটি বিশেষত্ব হলো যে, যে তত্ত্ব ডিকের ছয়টি অনুশাসন মানবে সেখানে EEP প্রযুক্ত হবে। এককথায়, এই অনুমিতিটি যথার্থ হলে WEP আর UGR-এই দুটি পরীক্ষাও EEP তত্ত্বকে জানাবে।—অন্যদিকে আইনস্টাইনের নিজস্ব সাদৃশ্য নিয়মতো গালিলিওর সাদৃশ্য নিয়ম (WEP) এবং আলোর লালসরণ (UGR)— এ দুটি বিষয় মেনে নিয়েই গড়ে উঠেছিল!

শিফের অনুমিতির বিস্তৃতিতে তিনটি সিদ্ধান্ত ঃ—(i) স্পেসটাইমের চরিত্র আছে মেট্রিক $g_{\mu\nu}$ (ii) যে কোনো টেস্টবডির বিশ্বরেখা সেই মেট্রিকের জিওডেসিক রেখা এবং (iii) অবাধ পতনের ফ্রেমে অমহাকর্ষীয় নিয়ম জানাবে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এখানে EEP প্রমাণিত হবে।—তিনটি সিদ্ধান্ত যেন সাধারণ তত্ত্বের মেট্রিক আর নন মেট্রিক আকৃতির পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করে জানায়। এই অনুমিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা শিফের কাছ থেকে পাবার আগেই 1971 সালে জানুয়ারি মাসে শিফের মৃত্যু হয়।

শিফের অনুমিতি যদি ঠিক হয়, তবে WEP আর UGR এর প্রমাণ যেন EEP'র পরীক্ষা ; এবং এই আইডিয়ার বিস্তৃতি ঘটিয়ে বলা হবে মহাকর্ষ জানা যাবে মেট্রিক রীতিতে। আশ্চর্য, যে কটি মহাকর্ষতত্ত্ব শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে গতিবিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্ব দল (Purely dynamical theories) প্রত্যেকটিই $g_{\mu\nu}$ কে মেনে নিয়ে টেনসারের সাহায্যে গড়ে তোলা আর দ্বিতীয় দল জ্যামিতিপূর্ব তত্ত্বদলে (Prior Geometry Thories) $g_{\mu\nu}$ হয় সোজাসুজি থাকে, নয় তাকে ফিল্ডের সাপেক্ষে গড়ে তোলা হয়। এদেরও মেট্রিক ফিল্ড থাকে! $g_{\mu\nu}$ ফিল্ডকে বাদ দিয়ে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে তোলা যায় না। এককথায় শিফের অনুমিতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে বলা হবে মহাকর্ষ জানা যাবে মেট্রিক রীতিতে ; স্পেসটাইম জানাবে কার্ভেচার। অথচ মেট্রিক ছাড়া ননমেট্রিক মহাকর্ষ গঠনের চেষ্টা হয়! ডিক ও জানিয়েছেন মহাকর্ষতত্ত্বে জ্যামিতি অবিশ্যক নয়। একথায় পরিসীমার বাইরে মহাকর্ষতত্ত্বের শক্তি বোঝাতে কি জানানো হলো না যেখানে কোয়ান্টারীতি খাটে? এটিও বিজ্ঞানীদের আলোচনার খোরাক।

তার আগে স্থির করা হয় পরীক্ষার পরিসীমাটি। মহাকর্ষের থিয়োরিদের পারস্পরিক পার্থক্য খুঁজতে গেলে দেখা যায় দুর্বলক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রগতিতে নিউটন সীমায় এই তুলনা সহজ। এই নির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে বিভিন্ন থিয়োরিদের ব্যবহার-গত তফাত টানা যায় দশটি ডায়মনসন শূন্য পেরামিটার (Parameters)

এর সাপেক্ষে ; তত্ত্বটি থেকে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের মানের ঘোষণায়। এদের বলা হলো প্যারামেট্রাইজ্ড্ পোস্ট নিউটনিয়ান ফর্মে সাজানো (Parametrised Post Newtonian formalism)—সংক্ষেপে PPN-বিন্যাস। এরই সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন থিয়োরিদের শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব, বিচার বিশ্লেষণ সহজ। সৌরলোকে মহাকর্ষ দুর্বল ; এই অঞ্চলে PPN এর বিন্যাসে পরীক্ষানিরীক্ষায় পাওয়া তথ্য আর নানা থিয়োরিরদের সম্পর্কটি বোঝা সহজ! এই পথেই থিয়োরিদের পাসফেল মার্কা দেয়া সহজ। -দেখা যায় সৌরলোকের সবকটি পরীক্ষায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তেমনি অনেক থিয়োরিও ভাল ভাবে পাস মার্ক পায়। সবকটি তত্ত্বে একটি বিশেষত্ব আছে। দশটি PPN' এর মান বিভিন্ন তত্ত্বে আলাদা হলেও কোনো কোনো অবস্থায় দেখা যায় একটি আরবিটারিরাশি পেরামিটারের মান গুলিতে বসালে পাওয়া যায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব। কাজেই সৌর লোকের কাছের পরীক্ষাতে সঠিক মহাকর্ষ তত্ত্বটি খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এটি একটি দুঃসহ দুর্ভাবনা। আর এজন্য বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি দেন মহাকর্ষ-বিকিরণ, নক্ষত্র জগৎ এবং মহাজগতের অন্যান্য পরীক্ষার দিকে। -এবং সব কটি মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে আরো একবার বিচার-বিবেচনা হয়।

আইনশ্টাইণের সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তিতে আছে গালিলিও'র সাদৃশ্য নিয়ম (WEP) এবং তাঁর তত্ত্বের কাঠামো থেকে প্রাপ্ত মহাকর্ষীয় প্রভাবে আলোর বর্ণালীর লালের দিকে সরে যাওয়া (WGR)। আবার লোকেল বা স্থানীয় মহাকর্ষ বোঝাতে নিজস্ব সাদৃশ্য নিয়মের কথা জানালেন, যেটি EEP॥ এই তিনটি নিয়ম নিয়ে আইনস্টাইনের গণিতে মেট্রিকের ছাঁদ। এখানে এই ত্রয়ী স্বমহিমায় অধিষ্ঠান থাকে। এই ত্রয়ীর মিলনে পাওয়া যায় Strong Equivalence Principle বা প্রবল সাদৃশ্য নিয়ম অথবা SEP॥ এই SEP নিয়ে সবকটি তত্ত্বের পরীক্ষাভিত্তিক মানটি বিচার করা হয়।

এই SEP জানায় (i) WEP আর UGR দুটিই বৈধ এবং (ii) অবাধপতন ফ্রেমের সাপেক্ষে মহাকর্ষীয় বা অমহাকর্ষীয় পরীক্ষার ফলাফল ফ্রেমের গতি অথবা কোন সময়ে কোন অবস্থানে সেটি করা হয় তার উপর নির্ভর করবে না। আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্বে এই নির্ভরতা দেখা দেয়। অন্যত্র বিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ শিফের অনুমিতিটি অন্য তত্ত্বে এত সুস্পস্ট নয়। এই বিরোধটি বোঝার জন্য লোকেল মহাকর্ষীয় প্রভাব আর তার সমস্যা নিয়ে বিচারে বসা হয়, আর বিবেচনা করা হয়, সৌর লোকের কাছে স্পেসটাইমের মেট্রিকের গঠন, তার আচার ব্যবহার কি হতে পারে। কোনো কোনো মহাকর্ষ তত্ত্বে বক্রী স্পেস দূরে এসিমটোটিক পথে ফ্ল্যাট হয়ে দাঁড়ায়। তবু লোকেল মহাকর্ষ সিস্টেম যেন বক্রী স্পেসেই প্রোথিত হয়ে থাকে।—এই চিন্তার সাপেক্ষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা কনক্লুসন টানা হয়। (i) যে তত্ত্বে কেবলমাত্র মেট্রিক ফিল্ড

থাকে—সেখানে যে লোকেল মহাকর্ষীয় ফিজিক্স পাওয়া যায় সেটি লরেন্সের ফ্রেমের অনুরূপ। এটি ইউনিভার্সের গঠন-বিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। এখানে একমাত্র SEP মেট্রিক ফিল্ডে থাকে। এটি আইনস্টাইনের তত্ত্বের বক্তব্য।

(ii) যে তত্ত্বে মেট্রিক ছাড়া একটি স্কেলার ফিল্ড এর উপস্থিতি থাকে সেটি যে ফিজিক্স জানাবে সেখানে লরেন্সের ফ্রেম থাকলেও, এটি ইউনিভার্সের গঠন-বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। স্কেলার টেনসার তত্ত্বে SEP'র ভগ্নদশা দেখা দিতে পারে।

(iii) যে তত্ত্বে মেট্রিক ছাড়া ভেক্টর ফিল্ড k অথবা অন্য টেনসার ফিল্ড C কিংবা অন্য ননডাইনামিকেল ফিল্ড একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা ভাবে হাজির হয় সেখানে যে লোকেল মহাকর্ষীয় ফিজিক্স পাওয়া যাবে সেও অন্য ধরণের। এটি হয়তো মহাবিশ্বের একটি বিশেষ রেস্টফ্রেম বা ইনারশিয়াল ফ্রেম মেনে গড়ে ওঠে; অথবা মহাবিশ্বের গঠন-বিবর্তন এখানেও কাজ করে। লরেন্সের ফ্রেমটি এখানে মৌলিক নয়; একে গণিতের ক্রিয়ায় গৌণভাবে পাওয়া যাবে। একমাত্র মহাবিশ্বের গঠন-বিবর্তনের উপর এখানে হাজির হওয়া ফিল্ডগুলির মান অনেক নির্ভরশীল। এখানেও SEP যে ভাঙে সে সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এককথায় বলা যায়, বিকল্প থিয়োরিগুলিতে SEP'র ভবিষ্যদ্বক্তির সম্ভাবনাটি লঙ্ঘিত হচ্ছে। যেসব তত্ত্বে SEP'র লঙ্ঘন দেখা দিচ্ছে—তারা মহাবিশ্বের গঠনের উপর, বিবর্তনের উপর নির্ভর করছে। কাজেই এসব থিয়োরি সময় নির্ভর। এইখানে মহাকর্ষের ধ্রুবক G এর মান যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় সেই অনুমান করা হয়। G এর পরিবর্তনের সূত্রটি হাবলের বর্ধমানত্বের হারের উপর নির্ভর করে। 1976 সালে ভান ফ্লানডের্ন G এর মানের পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানালেন; তাঁর পরীক্ষায় তিনি দেখেন যে এটমিক সময় আর মহাকর্ষীয় সময়ে প্রভেদ আছে। দুটি আবর্তনকারী বস্তু, যাদের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি কাজ করে—যেমন চাঁদ-পৃথিবী—সেখানে আবর্তনের সময়ের মাপ জানায় মহাকর্ষ সময়। ভান ফ্লানডের্ন জানালেন এই সময়টি এটমিক সময় থেকে ভিন্ন। এটি সত্যি হলে প্রপার টাইমের সংজ্ঞায় গোলমাল দেখা দেয়। SEP'র চিন্তায় ধরে নেওয়া হয় স্পেসের ক্ষুদ্র অংশের গতিবিজ্ঞানের নিয়মের উপর মহাকর্ষ কোনো প্রভাব খাটায় না। এই SEP তত্ত্বটি বা নিয়মটির শুদ্ধ প্রমাণ সৌরলোক অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই সময় এটমিক সময়। যদি মহাকর্ষীয় সময় আর এটমিক সময়ে প্রভেদ থাকে, তবে SEP তত্ত্বে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মহাকর্ষকে যদি মেট্রিক ফিল্ড তত্ত্ব ধরা হয়, তবে SEP'র উপস্থিতিই তার মৌলিক প্রমাণ।

পরীক্ষায় WEP'র মান নির্ণয় করা হয়েছে—দেখা গেছে দুর্বল সাদৃশ্য নিয়ম অকাট্য। একই ভাবে UGR এর মানটিকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করা হয়েছে—তত্ত্বে জানানো মান আর পরীক্ষায় পাওয়া মানে তফাত প্রায় নেই

বললে চলে। এই পথেই SEP'র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়। তবু মহাকর্ষের ধ্রুবকের মান যদি কমে আসে তবে SEP সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সংশয় দেখা দেয়। এই সংশয়ের আগুনে ধুনো ছিটান ডিরাক। এই মানের ধ্রুবকত্ব নিয়ে তিনি ত্রিশের দশকে সংশয় তুলেছিলেন। 1977 সালে এক নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব জানালেন তিনি—পরিবর্তিত G এর উপর নির্ভরশীল সেই তত্ত্ব।

G এর মানটি নির্ণয় করার চেষ্টা হয়। শাপিরো জানালেন 1985 সালের মধ্যে $\frac{G''}{G}$ এর মান পাওয়া যাবে $10^{-11}yr^{-1}$ এর চেয়ে কিছু কম। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভাইকিং মহাকাশ যানের রাডারের সাহায্যে অথবা মার্কারি গ্রহের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহ Orbitor পাঠিয়ে এই মান জানা যাবে $10^{-12}yr^{-1}$ ॥ মানটি ছোট, তবু বিশাল মহাবিশ্বের সাপেক্ষে একে তুচ্ছ করা যায় না।

মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রমাণ এখন পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে। সৌরলোকের লেবরেটারি ছেড়ে দূর জগতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে। মহাজাগতিক বিকিরণ, মহাকর্ষ তরঙ্গ, যমক পালসার নক্ষত্র গবেষণার পথ ধরে মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে; মহাকর্ষের প্যাথোলজির আরো প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা হয় সুদূরলোকে, এখনো অনাবিস্কৃত মহাকাশের নানা অবস্থানে। হাবলের পরীক্ষায় মহাকাশের বর্ধমান রূপ একটি সুন্দর অববাহিকার খোঁজ এনে দিয়েছে।—জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক উন্নতির সমান্তরে ছুটে চলেছে পরীক্ষার পরিসীমার বৃদ্ধি আর টেকনোলজির প্রয়োগ। পরীক্ষার হাতিয়ারের পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন ঘটেছে; সুযোগ হয়েছে গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি দিবার। আর তখন শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর রূপে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের মান নিরূপিত হয়। যত গভীরে যাওয়া যায়, জানা যায়, মহাজগতে একমাত্র মৌলিক কর্মী মহাকর্ষ। তাকে নিশ্চিত করে জানলে এই বিশাল গতিময় কর্মচাঞ্চল্যে ভরা পটভূমিকে চেনা যায়; মহাজগৎ স্পষ্ট হয়। মহাকর্ষ তত্ত্বের পূর্ণ এবং শুদ্ধ রূপই সেই চেনার চাবিকাঠিটি জোগাড় করে দিতে পারে। টেকনোলজির উন্নতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিসীমাটি শুধু যে বাড়িয়ে তোলে তা তো নয়; নতুন নতুন বিভাগে মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রমাণের সুযোগ পাওয়া যায়। তথ্যের আলোকে তত্ত্বের বিচার চলে; নিখুঁত তত্ত্বটি খোঁজার এবং বোঝার চেষ্টা হয়। 1982 সাল পর্যন্ত যে সব পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য পাওয়া গেছে তারা যেন আইনস্টাইন তত্ত্বের সুসঙ্গতাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। তবু এই পরীক্ষার এখানেই শেষ নেই। সামান্য তথ্যের আলোকে, বোধি মননের একাঙ্গী পটভূমিতে গণিতের রঙে রেখায় নকশায় যে বিরাট সুন্দর ছবিটি আইনস্টাইন এঁকে গেছেন—সেটি কালজয়ী কিনা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। নতুন পরীক্ষাতেও এই তত্ত্বের বিচার হবে; এতদিনের

পরীক্ষায় সাফল্যটি অন্য নতুন পরীক্ষাতেও বজায় রাখতে হবে। ভিন্ন পটভূমিতে ভিন্ন এরিনায় ভবিষ্যতে অন্য পরীক্ষা হবে ; সেখানে, সেই পরীক্ষাতে, সাধারণ তত্ত্ব সফল হবে কিনা—সেটি প্রশ্ন। সাফল্য নিয়ে সংশয় অনেকের ; আশা অনেকের ; আর নিশ্চিতি যেন অনেক বেশি জনার।...থিয়োরিকে সত্য বলে মেনে নেয়া হবে একদিন—যেদিন থিয়োরিটি পরীক্ষাতে প্রমাণিত হবে, দুর্গম দুস্তর প্রশ্ন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ;—এটি বিজ্ঞানের রীতি। সেই প্রমাণের জগতে মহাকর্ষ—যা বিজ্ঞানের প্রথম জানা শক্তি—একটি এমপেরিকেল ভিত্তিতে দাঁড়াবে ; সেখানে সেই তত্ত্ব—সত্য। আইনস্টাইনের তত্ত্ব কি সেই সত্য জানাবে? এই প্রশ্ন নিয়ে সংশয় যতখানি, আনন্দও যে তত!

সাধারণ তত্ত্ব একটি স্বয়মসম্পূর্ণ তত্ত্ব—অন্তত ডিক যে পরিসীমা জানিয়েছেন সেই সীমায় সাধারণতত্ত্ব সাম্রাজ্য বিস্তার করে থাকতে পারে,—সেই সম্ভাবনা আছে। এখানে যেমন জানা যায় মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সমীকরণ, তেমনি জানা যায় এই ক্ষেত্রের সাপেক্ষে যে কোনো বস্তুর গতি বর্ণনা। তবু মনে হয় দুটি বিভাগে এটি যেন পূর্ণতার রূপে ধরা দেয় না ; দৃশ্যমান ঘটনাবলীর সঠিক বর্ণনা দিতে পারে না। মহাকর্ষ ক্ষেত্র ক্লাসিকেল রীতি মানে—এই ক্ষেত্র নিস্তর, অবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে অন্যসব শক্তি ক্ষেত্রে কোয়ান্টা রীতি কাজ করতে পারে—সেখানে শক্তিস্তর আছে, আছে বিচ্ছিন্নতার ধারণা। সাধারণতত্ত্ব স্বয়ং সিঙ্গুলারিটির উদ্ভব ঘোষণা করছে। যতই প্রতিবাদ করা যাক, এই সিঙ্গুলারিটির হাজিরাকে রোধ করা যায় না। মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তে বিগব্যাঙ ঘটার কালে সিঙ্গুলারিটির সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি নক্ষত্রের ধ্বংসের কালে, কোলাপ্সের মুহূর্তে সিঙ্গুলারিটি উঁকি মারে ; উঁকি মারে ব্ল্যাকহোল তত্ত্বে। সৃষ্টি অথবা ধ্বংস—দুটিরই পথে থাকে সিঙ্গুলারিটি—এটি হয়তো যাত্রাবিন্দু অথবা যাত্রাশেষ বিন্দু। এই সিঙ্গুলারিটির ঘোষণা ক্লাসিকেল সাধারণতত্ত্বে নিহিত থাকলেও, এটির ব্যাখ্যা দিতে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অপারগ। এই জগতে ক্লাসিকেল সাধারণতত্ত্বের মুখরতা বাক্যহারা হয়ে থাকে। কারণ এখানে, সিঙ্গুলারিটির জগতে, ক্ষেত্র সমীকরণগুলি একটি বিন্দুমাত্রিক অবস্থানের সীমান্থানে হাজির হয় ; স্পেসটাইমের জগতে সীমারেখা দেখা দেয় ; এই ক্ষুদ্র সীমায় বা গণ্ডীতে ক্লাসিকেল রীতির বনেদিয়ানা বজায় থাকে না।—এই দুটি ডিকের জানা। তাঁর অনুশাসনে মহাকর্ষ তত্ত্বের যে দপ্তরটি জানানো হলো সেখানে কোয়ান্টাভাবনা বা সিঙ্গুলারিটির আগমন নিষেধ। তবু মহাকর্ষ জগতে এদের আবির্ভাব হতে পারে—সেখানে সাধারণতত্ত্ব এদের আমন্ত্রণ জানাতে কেন এগিয়ে আসবে না?—সাধারণতত্ত্বের বিস্তারে, পরিবর্ধিত রূপের পটভূমিতে এদের ধরতে চেয়ে বিজ্ঞানীদের মনে কোয়ান্টা-গ্রেভিটির ইসারা ধরা পড়ে। ক্লাসিকেল সাধারণ তত্ত্ব থেকে কি করে যে এই নতুন তত্ত্বটি সৃষ্টি করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট প্রেসক্রিপসন মহাজগতের ডিসপেনসারিতে পেশ

করা যাচ্ছে না। আইনস্টাইনের চিন্তা জগতের মত এখানেও হয়তো বোধি ও মননের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা উপলব্ধি-ইনটুশন কাজ করবে—সাধারণ প্রত্যয়গুলি হাজির হবে। সেই প্রত্যয়ের সাহায্যে একটি পরিপূর্ণ মহাকর্ষতত্ত্ব গঠনের চিন্তা জাগে—যে তত্ত্ব হবে সর্বতোগামী, হবে বিচিত্রগামী। মেক্রোজগতে এটি যেমন প্রযুক্ত হবে, তেমনি মাইক্রোজগতে সিঙ্গুলারিটির অসীম বক্রতার পরিসীমায় এটির প্রয়োগ হবে।—এখন পর্যন্ত সব শর্ত মেনে নিয়ে কোনো তত্ত্বের হাজিরা দেখা দেয়নি। তবে এমন তত্ত্ব পাওয়া গেছে যা কোনো কোনো অংশকে পরিস্ফুট স্পষ্ট করে তুলতে পারে। হয়তো এটি প্রতিপদের চাঁদের মত একটি সূচনা; ভবিষ্যতে এটি যে ষোলকলায় পূর্ণ হবে না তা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। মনে হয় আজকের সেই শিশুতত্ত্ব যেন আগামী দিনের পূর্ণতাকে আহ্বান জানায়। আজকের তত্ত্ব, যা একটি সূচনা, সেটি ভবিষ্যতের বিরাট কেনভাসে আঁকা ছবিটির একটেরে থাকবে। থার্মোডাইনামিক্স ও ব্ল্যাকহোলের তত্ত্বের মিলনে সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত জাগে!

মহাকর্ষকে কোয়ান্টায়িত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ভাবা হয়েছে। ফেনমানের কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সের সুবিখ্যাত ডায়গ্রাম বা ছকটির কথা মনে রেখে এ ধরণের টেকনিক মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রয়োগেও চেষ্টা হয়। ভাবা হয়, মহাকর্ষক্ষেত্রের আন্দোলন থেকে গ্রেভিটন কণার সৃষ্টি—যে কণার গতিতে আকর্ষণের ধারা কাছ থেকে সুদূর দূরত্বে ছুটে যায়। এই ভাবনাটিও জটিল!

মহাকর্ষকে কোয়ান্টায়িত করার পদ্ধতি মোটামুটি তিন ধরণের। এদের পদ্ধতি না বলে বরং বলা যায় এপ্রোচ (Approach) বা আলাপের অভিলাষ —স্টিফেন হকিং এ শব্দটিই ব্যবহার করছেন। এটি একটি অভিগমন। এরা হলো :—

(i) অপারেটারের সাহায্যে ক্লাসিকেল তত্ত্বের আইস্টাইনীয় সমীকরণের মেট্রিক অংশটির স্থানচ্যুতি ঘটানো।—এই পদ্ধতিটি খুব একটা কাজের কাজী হয়ে দেখা দেয়নি। তাছাড়া ভাষাগণিতের সাপেক্ষে এই রীতিটি মহাকর্ষ ক্ষেত্রে যেন বেমানান।

(ii) Canonical এপ্রোচ—এখানে ওয়েভ মেকানিক্সের হেমিলটনীয় কেননিকেল ছকের আবির্ভাব। প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে এই ছক মোটামুটি ভালভাবে খাটে। তবে এখানে দেশকালেয অনবচ্ছেদতা থাকে না; সমীকরণে আলাদা আলাদা ভাবে দেশ তার তিনটি মাত্রা ও সময় তার একটি মাত্রা নিয়ে হাজির হয়;—আপেক্ষিকতাবাদের এটি একটি মৌলিক বিরোধ। তাছাড়া স্পেসটাইম টপোলজি ক্ষেত্রেও অহেতুক সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

(iii) Path integral (অভঙ্গ পথে) এপ্রোচ : স্টিফেন হকিং এই এপ্রোচটিকে তিনটির মধ্যে প্রথম স্থান দিয়েছেন। ফেনমানের নকশার প্রয়োগ

এখানে প্রাথমিক ভাবে করা যায়। এটিও পূর্ণতা পায়নি। বহু সমস্য সঙ্কুল এই পথ ; তবু তিনটি এপ্রোচের মধ্যে এটি কিছু বেশি আশা জাগায়।

কোয়ান্টা গ্রেভিটি সম্পূর্ণভাবে গণিতাশ্রয়ী। জটিল গাণিতিক আবর্তে পাওয়া তথ্যগুলিকে মুখের ভাষায় যে ভঙ্গীতে অথবা আঙ্গিকে বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলি যেন আরো জটিল। নতুন বাক্যবিন্যাস দেখা দেয়, যেগুলি গণিতের রীতি বোঝায়—যেমন Unitarity, closed loops plus tree diagram, background plus fluctuation—ইত্যাদি। এই জটিল জগতে সমস্যা সমাধানে যেসব আইডিয়ার কথা ভাবা হয় তারা জটিলতর, অদ্ভুত এবং যেন অসম্ভব! ফেনমানের ছকের বন্ধপাশে ধরা পড়ে ভূতুড়েকণা বা Ghost particles অথবা চিন্তা হয় অতি মহাকর্ষের বা সুপার গ্রেভিটির! এ ধরণের জটিলতার কারণ হলো কোয়ান্টা গ্রেভিটি থিয়োরিতে যেমন থাকবে আইনস্টাইনের মেট্রিক, তেমনি থাকবে কোয়ান্টা গণিত। দুটি গণিতের ধারাকে একটি সূত্রে গাঁথতে গেলে যে কুশলতার দরকার, সেটি বর্তমানের বিজ্ঞানীদের আজো অজানা। দুটি তত্ত্বের পুষ্প দিয়ে মালা গাঁথার জন্য হাতড়ে বেড়ানো যেন ধরা পড়ে। জটিলতার মোকাবিলায় বিভিন্ন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি স্কুল গড়ে ওঠে। তবু পথের শেষ অনেক অনেক দূরে।

গণিতের কাঠামো নিয়েও চিন্তা হয়। আইনস্টাইন টেনসারকে, মেট্রিককে তাঁর তত্ত্বের ভাষায় এনেছিলেন। এই জ্যামিতিক রীতি কোয়ান্টা জগতে খাটেনা। চেষ্টা হয় এমন একটি গণিতের ছক সৃষ্টি করা যেটি দুটি তত্ত্বকে একই ভাষায় জানাতে পারবে। রোজার পেনারাজ তৈরি করেন টুইস্টোর (Twistor)—মাইক্রো ও মেক্রো দুটি জগতে এটির সীমাবদ্ধ ব্যবহার দেখা গেছে। তবু এই ভাষাটি এখনো ছন্নছাড়া, এলোমেলো। ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত যেন! অন্যদিকে সুব্রাহ্মানিয়ম চন্দ্রশেখর বিজ্ঞানী কার (Kerr) এর সৃষ্টি মেট্রিক—যাকে বলা হয় কার মেট্রিক তার ব্যবহার করলেন ব্ল্যাকহোল তত্ত্বে, মহাকর্ষ ক্ষেত্রের পার্টারবেশন (Perturbation) ক্রিয়ার জগতে। তাঁর ধারণায় এই একই গণিতের ধারায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্রসমীকরণের সমাধান সম্ভব হতে পারে। এইটি তাঁর প্রচেষ্টা!

তবু কোয়ান্টা-গ্রেভিটি বললে শব্দদুটির সংযোগ যে বহুব্রীহি অর্থটি পাওয়া যায় সেটি যেন সুস্পষ্ট নয়। এ জগতের মেটারের অন্দরমহলে আছে কোয়ান্টার সাম্রাজ্য ;—এখানের যে কোনো সিস্টেম—কোয়ান্টাসিস্টেম। এই কোয়ান্টা সিস্টেম থেকে ক্লাসিকেল সিস্টেমে একমাত্র বৃহৎ রাশির সাপেক্ষেই যাওয়া যায়। কোয়ান্টা গ্রেভিটির পথে যে সব সমীকরণ পাওয়া যায় তারা গণিতের ডাইভারজেনসটি প্রকাশ করে। এদের কাট ছাঁট করে সঠিক উত্তরটি আনতে হয়। এটিও একটি গোলমাল।

তা সত্ত্বেও মহাকর্ষকে কোয়াণ্টার জগতে বাঁধার প্রয়োজনটিকে এড়িয়ে রাখা যায় না। আধুনিক কোনোকোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, প্রকৃতি কোনকিছুকে কোয়ান্টায়িত করছো—সেখানে কোয়াণ্টা আছে। ক্লাসিকেল পদার্থবিদরাই কোয়ান্টায়িত করার কল্পনা করেন। গণিতের ভাষায় কোয়ান্টার যে ছক পাওয়া যায়—সেখানে ডাইভারজেনসকে ছাঁটাই করে স্বাভাবিক অর্থবহতাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়; যাকে বলা হয় রিনর্মালাইজেশন। অথচ প্রকৃতিতে রিনর্মালাইজেশন শব্দটি নেই, কারণ প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে ডাইভারজেনসকে এড়িয়ে চলে। প্রকৃতির সেই কার্যধারাটি বিজ্ঞানের খুঁজে পেতে হবে।...এই চিন্তা যে ভবিষ্যতে কি কাজে লাগবে বর্তমানে তার ধারণা নেই, তাছাড়া এখন, বর্তমানে, এই চিন্তা কোনো কাজে লাগছে না! রিনর্মালাইজেশন ও ডাইভারজেনসকে ছাঁটাই-এ দুটি কাজ খুঁজে পেতে বিজ্ঞানীরা করে চলেছেন।—ক্লাসিকেল থিয়োরির গণিত ছাড়া কোয়ান্টাম গ্রেভিটির আকৃতির কথা ভাবা যায় না! হেমিলটনীয় কেনানিকেল পদ্ধতি, টুইস্টোর অথবা কারমেট্রিক্স—এরা সহজধারায় আসে না। পথ যেন বন্ধুর, জটিল। তাছাড়া যে সব ধারণা গণিতের ছকে ধরা দেয়, তাদের মডেলে আনা যায় না, বাস্তবে চেনা যায় না, পরীক্ষায় প্রমাণ করাও যেন অসম্ভব। এটি যেন গণিতের ভাষায়, গণিতের ছকে একটি বর্ণনা যার অনুবাদ প্রপঞ্চের জগতে মুখের ভাষায় বর্তমানে করা যায় না।

মিনকোওস্কির স্পেসটাইমের ভিত্তিতে গড়ে তোলা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি আর কোয়ান্টাম জিওমেট্রোডাইনামিকসের মিল আর গরমিল নিয়ে আলোচনা করেন আবদস সালাম। তাঁর আশ্চর্য অন্বেষণের ধারায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া যায় এলিমেন্টারি পার্টিকল থিয়োরি বা মৌলকণাতত্ত্বে আটটি নতুন "ইনভেনশন"। এদের সাপেক্ষে জানা যায় কোয়ান্টাম গ্রেভিটি একটি ফিল্ড থিয়োরি—যে অনেক আর্বিটারি পার্টিকলের সম্মিলিত হালকাভার বয়ে নিয়ে চলেছে। এই ঘোষণাও গাণিতিক।

তবু কোয়ান্টা-গ্রেভিটির গাণিতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। হকিং ব্ল্যাকহোলের বিচ্ছুরণের যে আলোচনা করলেন, বিশ্লেষণ করলেন, তা যে শুধু-অপূর্ব তা নয়; এটি একটি দিগ্‌দর্শী ইতিহাস। এই পথেই সিগনাস ×—1 নক্ষত্রটিকে ব্ল্যাকহোল বলে সন্দেহ হয়। তবে যে কোনো বিজ্ঞানের শাখার মত, কোয়ান্টা-গ্রেভিটিতত্ত্বে জানার চেয়ে অজানার পরিধি অনেক বেশি। তত্ত্বটি যেন ফীল (Feel) টি বোঝাতে পারছে নিঃসীম অন্ধকার সাম্রাজ্যে এই ধারণাটুকু, অনুভূতি টুকুই একমাত্র ইশারা। হকিংএর ব্ল্যাকহোলের সীমানায় কোয়ান্টাতত্ত্বের প্রয়োগে জানা যায় এই কোয়ান্টা গ্রেভিটি থিয়োরি—রিলেটিভিটি তত্ত্ব, কোয়ান্টা তত্ত্ব আর স্টেটিসটিকেল মেকানিকসকে যা একটি সুসঙ্গ সমন্বয়ে বাঁধতে পেরেছে। এই বাঁধন হালকা—তবু পলকা নয়। এই সমন্বয়ের ধারায় আইনস্টাইনের চিন্তার উত্তরাধিকারের শাশ্বত স্রোতটি ধরা পড়ে। অথচ

আইনস্টাইনের এই পথে সমন্বয়ের চেষ্টাকে স্নেহের চোখে দেখতেন ; ভাবতেন এ শুধু শিশুদের বালি নিয়ে ঘর গড়ে তোলা !—তাঁর কাছে কোয়ান্টাম থিয়োরি বিশিষ্ট নয়, তিনি ভাবতেন আপেক্ষিকতাবাদের উপর এ থিয়োরিকে চাপানো যাবে না। বরং হয়তো ঐ আপেক্ষিকতাবাদের ছকে এক নতুন নিশ্চয়তা তত্ত্বে অনিশ্চয়তায় গড়ে তোলা কোয়ান্টাম তত্ত্ব হারিয়ে যাবে। হকিং-এর তত্ত্বের অবির্ভাবে আইনস্টাইনের কী প্রতিক্রিয়া হতো ? তাঁর পদার্থবিদ্যার গভীর জ্ঞান তাঁর কাছে কোনোদিন এধরণের ইঙ্গিত-ইশারা কি এনে দেয় নি ?

সমন্বয়ের গভীরতম প্রদেশে কোয়ান্টাম গ্রেভিটি ডুবুরি পাঠিয়েছে ;—আইনস্টাইন এটি দেখে যাননি ;—এটি দুঃখের, বেদনার ! তবু এই সমন্বয় ঘটে কোন অবস্থায় ? এটি ঘটে যখন মেটারের ডেনসিটি দাঁড়ায় 10^{80} ॥ এই চরম অবস্থায় মহাকর্ষ ধ্বংশের কালে, নক্ষত্রের কোলাপ্সে অথবা মহাবিশ্বের শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত কালে বিরাট বিশাল মেক্রোজগতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এগিয়ে আসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাইক্রোজগতের একচ্ছত্রাধিপতি কোয়ান্টাম থিয়োরি। বিশাল গলিয়াথকে কিশোর ডেভিড একমাত্র এই পরিস্থিতিতেই ধরাশায়ী করতে পারে। অথচ আইনস্টাইন সিঙ্গুলারিটি অবস্থা মানেন নি !

এই বিশ্ব কোনোদিন যদি কোয়ান্টাম বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল, আবার যদি কোয়ান্টা হয়ে পুনরাবৃত্ত হয়, তবে এই বিন্দুমাত্রিক দুটি অবস্থানের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বিরাট তরঙ্গের বাস্তব প্রকাশ কি হতে পারে ? 1957 সালে এভারেট (Everett) একটি কল্পদর্শনে এই প্রকাশের মূর্তি আঁকলেন। তাঁর কল্পনায় সাংখ্যায়নিক রীতিতে গড়ে তোলা কোয়ান্টাম মেকানিকসের সব নিয়মের পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ গুলি সত্য ;—তারা এজগতের অংশ। অন্যদিকে মহাবিশ্বে নিমিত্ততা-ডিটারমিনিজম থাকবে, থাকবে বিরাট তরঙ্গের গতি প্রকৃতি মেনে নিয়ে। এভারেট বললেন, মহাবিশ্বে আছে নিমিত্তবাদ,—এখানে যে সিদ্ধান্ত ঘটে তা শাশ্বত-নিত্য। আবার এখানে থাকে সম্ভাবনার পথে পাওয়া নিয়ম। দুটিরই অবস্থান পাশাপাশি থাকে। এরা কাজ করে একত্রে, একযোগে, একসময়ে।

সৃষ্টির মুহূর্তে বিভিন্ন একশন বা ক্রিয়ার ভিত্তিতে হার্টল (Hartle) মহাবিশ্বর গতিময় রূপটি প্রকাশ করতে চাইলেন ; জালডোভিচ সৃষ্টির সেই মুহূর্তে পার্টিকলের উদ্ভবের ফলে ধরতে চাইলেন মহাবিশ্বের আইসোট্রোপিক আকৃতিটি। গণিতের ছকে ক্লাসিকেল মেট্রিক রীতির নিত্যতার সঙ্গে কোয়ান্টা থিয়োরির সম্ভাবনা জোট বাঁধে। প্রকৃতির কার্যধারা হয়তো যেমন দেখতে চাওয়া যায়—তেমনি দেখা যায়। অথবা প্রকৃতি সব বিরোধাভাস বৈপরীত্য নিয়ে গড়ে ওঠে—যেমনটি এভারেট ভাবেন। সেই ভাবনার সূচনায় আছে কোয়ান্টা-গ্রেভিটি, যেখানে আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়ান্টা তত্ত্বের গাঁটছড়া বাঁধা। গিঁটটি হয়তো হালকা পলকা ; তবু গিঁট বাঁধা যায়। সমন্বয়ের ঐকতান গড়ে উঠতে পারে।

এখন পর্যন্ত সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনদীপ্ত ভঙ্গিমায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিজ্ঞানের চালচিত্রে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর তত্ত্বে এক নতুন মহল যোগ হয়—যেটি কোয়ান্টা গ্রেভিটি। পুরনো বাস্তুভিটাটি যেখানে শেষ হয়ে ছিল—সেদিক নয়; এটি প্রবেশ পথের পাশেগড়ে তোলা বাইরের মহল—যেখানের জানলা থেকে বাইরের জঁারন্য দেখা যায়। পিছনের পুরনো বাড়িতে এখনো একটি সর্বজনীন আকর্ষণ থাকে—সে মহাকর্ষ। বাইরের মহলের মহাকর্ষ থেকে—এ যেন আলাদা;—যে একটি সুস্থিত প্রত্যয়;—যে কঠিনতম পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে প্রস্তুত!

নানা মহাকর্ষের ভিড়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বটি এখনো স্ব-মহিমায় চিহ্নিত। প্রতিযোগী নানা তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান মেনে নিয়ে এখনো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে লড়াই করে চলেছে। কত আশ্চর্যের বিস্ময়ের এই সংবাদ! মানুষের চিন্তার মহত্তম প্রকাশ একমাত্র এই তত্ত্বটিতে দেখা যায়। কোয়ান্টা গ্রেভিটির হাত ধরে এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকে সব ক্ষুদ্রতাকে মহিমায় মর্যাদায় অভিষিক্ত করে মহাবিশ্বের প্রকাশিত অপ্রকাশিত সাম্রাজ্যে। হয়তো ভবিষ্যতে এই সাধারণ তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে একটি রেফারেন্স হয়ে থাকবে—যেমন আজকের দিনে ইলেকেট্রাডাইনামিকসের অবস্থা। সেদিন মহাকর্ষ নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয়তো কোয়াসার জাতীয় ব্ল্যাকহোল অথবা আদি মহাবিশ্বের ফেলে রাখা স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে! আর আজকের যে গ্রেভিটি ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে একত্র করে গড়ে উঠবে একটি মহান একীভূত তত্ত্ব (Grand unified theory)। আইনস্টাইনের স্বপ্ন সেদিক সার্থক হবে—তবে তাঁর স্বপ্ন আর বাস্তবে গড়া ভবিষ্যতের তত্ত্বে কত যে তফাত থাকে! তবুও এখানে কাজ করবে তাঁর চিন্তা, তাঁর ধ্যান ধারণা।

আইনস্টাইন মানুষের চিন্তার নতুন সংজ্ঞা দিলেন। মানুষের কল্পনায় মাত্রা টানলেন। বিজ্ঞানের রাজ্যে সত্যের উপলব্ধিতে মানুষকে অনন্য বলে জানালেন।

তাঁর তত্ত্বের পাদপিঠে দাঁড়ায়—মানুষ!